সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার গদ্য সাহিত্য পাঠ

আমার গদ্যসাহিত্য পাঠ

আমার গদ্যসাহিত্য পাঠ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরম্পরা

হর্ষ দত্ত-কে

আমার গদ্যসাহিত্য পাঠ

কবিতা আমার প্রথম প্রেম, কিন্তু গদ্যের পিছনে আমাকে সময় দিতে হয়েছে অনেক বেশি। গল্প-উপন্যাস লেখার পাশাপশি লিখেছি অজস্র গদ্য। তার মধ্যে বহু গদ্য আবার গল্প-উপন্যাস বিষয়েও। আমার পূর্বের, সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের বহু গদ্যগ্রন্থ নিয়ে নিজের ভাবনা প্রকাশ করেছি বিভিন্ন সময়। যেহেতু পড়তেই আমি খুবই ভালোবাসি, তাই দেশবিদেশের গদ্যগ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে ওইসব রচনায়। এইসব গদ্যগুলো এতদিন দু-মলাটের ভেতর গ্রথিত করা হয়নি। এই প্রথম আমার সারা জীবনের গদ্যরচনা পাঠের অভিজ্ঞতা, অনুভব ও বিশ্লেষণ গ্রন্থিত হল।

[signature]

সূচিপত্র

এক নাস্তিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান ১১
বঙ্কিমচন্দ্র ৩১
বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় উপন্যাসের জন্ম ৪৮
বিষবৃক্ষ নয়, এবার প্রত্যাশা করি অমৃতফলের ৫৫
'শরৎচন্দ্র নয়, এঁরাই আধুনিক
বাংলা উপন্যাসের পুরোধা' ৫৮
ছোটোগল্প প্রসঙ্গ ৬২
আমার মতে ৬৫
বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র ৬৮
বহু যুগের ওপারে ৭৫
দুটি উপন্যাস : দুই মেরু ৭৭
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ৮৬
সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংরেজি বই : গাঁজাখুরির চূড়ান্ত ৯২
নেতাজির সার্থক জীবনী-উপন্যাস ১০০
একটি সাহিত্যগ্রন্থ, একটি ইতিহাস ১০৫
জাদুবাস্তবতা ও মার্কেজের গল্প ১১২
প্রেমচন্দ : আধা আত্মজীবনী ১১৫
বিভূতিভূষণ ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ১২০

অপ্রকাশিত ঐশ্বর্য ১২৬
পূর্ণিয়া জেলার উইলিয়াম ফক্‌নার ১৩৩
বিস্মৃত লেখক ১৩৭
বৈঠকী মেজাজের এক উপেক্ষিত সাহিত্যিক ১৪০
দুর্বোধ্য, তবু রোমাঞ্চকর ১৫০
কমলকুমার মজুমদার ১৫৩
কমলদা, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র পঞ্চাশ বছর ১৫৭
গোলাপ সুন্দরী ১৬১
একটি চিঠি ১৬৭
বাংলা ছোটোগল্পের তিন দিকপাল ১৭০
স্বতন্ত্র একটি মানুষ : একালের একটি উপন্যাসে ১৯৯
নিঃসঙ্গ একটি জীবন : একালের একটি উপন্যাসে ২০১
সাদা বাঘ, পপির সমুদ্র এবং আফ্রিকা ২০৩
নাসরীন জাহান-এর সোনালি মুখোশ ২০৯
ভূমিকা : বাংলা গল্প সংকলন ৪ ২১৪
এই সেই জাতি, যারা আত্মদূষণে দুষ্ট ২২২

এক নাস্তিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

প্রথমে ঘনশ্যামকে দিয়েই শুরু করা যাক। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কয়েক পুরুষ ধরেই এঁরা সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন। এঁদের আদি বাড়ি মালদা জেলায়, তারপর কলকাতায় এসে ধনাঢ্য বসাকবাবুদের এক প্রকার আশ্রিত ছিলেন।

ঘনশ্যাম সংস্কৃত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ শিক্ষাদান ও পুজোআচ্চা করতেন, এছাড়াও তার নাকি একপ্রকার অলৌকিক শক্তি ছিল। তিনি ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে ভূত ভবিষ্যতের কিছু কিছু ছবি দেখতে পেতেন, যাকে বলে নখদর্পণ। যাঁদের এরকম নখদর্পণ হত তাঁরা অনেক হারানো জিনিসের সন্ধান, রোগের চিকিৎসা আর মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারতেন।

বসাক পরিবারের প্রধান পুরুষটির নাম রাধাকৃষ্ণ। তিনি ট্রেজারির দেওয়ান, বিখ্যাত ধনী এবং কলকাতায় তার বাগানওয়ালা মস্তবড় বাড়ি। এই রাধাকৃষ্ণের বিমাতার নাম ভাগ্যবতী দাসী। ঘনশ্যাম একদিন নখদর্পণের সাহায্যে ভাগ্যবতীকে জানালেন যে তাঁদের বাগানের মাটি ফুঁড়ে কোনো ঠাকুরের মূর্তি উঠবে। সত্যি সত্যি এক সকালে দেখা গেল বাগানে একটি সিংহবাহিনী দেবীর, অথাৎ দুর্গার মূর্তি পড়ে আছে। কারুর বাসস্থানে এরকম অলৌকিকভাবে কোনো দেব-দেবীর মূর্তির আগমন অত্যন্ত পুণ্যের ব্যাপার। বসাক বাড়িতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল।

আমরা এ যুগে নখদর্পণের ব্যাপারটাকে কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। আমাদের খুব ছেলেবেলাতেও, অর্থাৎ বছর ষাটেক আগে পর্যন্ত এরকম নখদর্পণের ঘটনা শুনেছি, কখনো চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়নি। তখন তেল-পড়া, বাটি চালানো ইত্যাদিও শুনতাম। এখন ওসবই জোচ্চুরি কিংবা ভড়কি কিংবা ঠকবাজি হিসেবে গণ্য হতে হতে গ্রামাঞ্চল থেকেও লুপ্ত হতে বসেছে। কারুর বাগানে অলৌকিক ভাবে কোনো ঠাকুরের আবির্ভাবও নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার, পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলেই একমাত্র

এটা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ কেউ রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি ওরকম কোনো মূর্তি ফেলে দিয়ে যায় কিংবা মাটিতে পুঁতে রাখে।

সুতরাং চতুর ব্রাহ্মণ ঘনশ্যামও যে ওইরকম কিছু জোচ্চুরি করেছিলেন, তা ধরে নেওয়া যায়।

ভাগ্যবতী দাসীর বাপের বাড়িও যথেষ্ট ধনী, তিনি অনেকখানি সম্পত্তির ভাগ পেয়েছিলেন। সিংহবাহিনীর মূর্তি পেয়ে তিনি এতই পুলকিত ও ধন্য হয়ে যান যে ওই মূর্তির জন্য মন্দির গড়ে পুজো-অর্চনার জন্য তাঁর সেই নিজস্ব সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিলেন এবং ঘনশ্যামকে পুরস্কৃত করার জন্য সিমলের মালিবাগানে চার কাঠা জমির ওপর একটা দোতলা বাড়ি কিনে দিলেন। শুধু তাই নয়, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন প্রায় নিয়মিতই বসাক বাড়ি থেকে এই ব্রাহ্মণ পরিবারে নানারকম উপঢৌকন আসত।

ঘনশ্যামের ছোটো ছেলে মথুরানাথ অতি সুশ্রী বালক, তাকে ভিক্ষাপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ভাগ্যবতী। অর্থাৎ এই ছেলেটির পোশাক-পরিচ্ছদ, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির সমস্ত খরচই বহন করবেন ভিক্ষামাতা। ভট্টাচার্য পরিবারটির অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন বালক মথুরানাথের মৃত্যু হল। বজ্রপাতের আঘাতটি নিশ্চিত ঘনশ্যামেরই বেশি লেগেছিল, কারণ তিনি নিজে তো জানতেন যে নখদর্পণের মতন জোচ্চুরি এবং ঠাকুর ওঠার ষড়যন্ত্রের তিনি অংশীদার এবং সে কারণেই তাঁর অবস্থা ফিরেছে। এইজন্য কি ভগবান তার পাপের শাস্তি দিলেন এবং প্রিয়তম পুত্রটিকে কেড়ে নিলেন? শোকগ্রস্ত ও বিমর্ষ অবস্থায় কিছুদিন কাটাবার পর ঘনশ্যাম ঠিক করলেন, তিনি আর কলকাতাতেই থাকবেন না, সপরিবারে চলে গেলেন কাশী।

ভাগ্যবতী কিন্তু খুবই পছন্দ করতেন ঘনশ্যামকে। তিনি বারবার কাশীতে পত্র লিখে ও লোক পাঠিয়ে ঘনশ্যামকে ফিরিয়ে আনলেন। একটি রাধামাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে ঘনশ্যামকে সেবার ভার দিলেন, মাসিক বৃত্তি ঠিক হল তেইশ টাকা। সে যুগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেইশ টাকা বেশ ভালোই টাকা, অনেক চাকুরিজীবীর মাস মাইনে হত দশ-পনেরো টাকা। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাবা দশ টাকা মাইনে পেতেন।

ঘনশ্যামের মৃত্যুর পর সংসারের প্রধান হন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামজয়। ইনিও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কিন্তু জীবিকার জন্য চিন্তাভাবনা ছিল না। বসাক পরিবারে পৃষ্ঠপোষকতা তখনো চলছিল একরকমভাবে। তিনি কোনোরকম অলৌকিক মমতা-টমতা দেখাবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছবার আগেই তাঁকে মৃত্যুরোগ ধরে।

সেকালে চিকিৎসকরা জবাব দিলে (অর্থাৎ আর আশা নেই বলে দিলে) ব্রাহ্মণদের গঙ্গাযাত্রা করার প্রথা ছিল। অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্রাহ্মণটিকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে জলে খানিকটা পা ডুবিয়ে রাখা হত, তার উদ্দেশ্য, ওই অবস্থায়, গঙ্গার সংস্পর্শে মৃত্যু হলে

সরাসরি স্বর্গে যাবার ব্যবস্থাটা পাকা। কমলকুমার মজুমদার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে এবং ওই একই নামে গৌতম ঘোষ নির্মিত চলচ্চিত্রে গঙ্গাযাত্রার মর্মন্তুদ চিত্র আছে। সে কাহিনীতে অবশ্য গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধটি কিছুতেই মরতে চাইছিল না এবং সেই অবস্থায় তার সঙ্গে একটি যুবতীর বিয়ে দেবারও ব্যবস্থা হয়।

রামজয়ের আর আয়ু ছিল না, গঙ্গাযাত্রার তিন-চারদিন পর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। তখন তাঁর বড়ো ছেলেটির বয়েস এগারো বছর আর ছোটো ছেলেটির বয়েস ছয়ও পূর্ণ হয়নি। বড়ো ছেলেটির নাম রামকমল, আর ছোটো ছেলেটি, কৃষ্ণকমল, সেই আমাদের এই আখ্যানের মূল চরিত্র। পিতার মৃত্যুদিনে সে বাড়িতে সকলের কান্নাকাটির তাৎপর্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ির ওড়াওড়ি দেখছিল।

অত কম বয়েসেই রামকমল বাবার কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টি ও অভিধান ইত্যাদি পাঠ শিখে নিয়েছিল। তার পড়াশুনোর আকর্ষণ ছিল খুব তীব্র, বাবার মৃত্যুর পর সে নিজে নিজেই সংস্কৃত কলেজে গিয়ে ভর্তি হল। তখন সংস্কৃত কলেজে মাইনে লাগত না। মেধাবী ছাত্ররা বৃত্তি পেত। রামকমলের বৃত্তি পেতে দেরি হল না এবং অবিলম্বে সে বিভিন্ন শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠল। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে মাসিক বৃত্তি পেল কুড়ি টাকা।

সংস্কৃত কলেজে যাবার সময় রামকমল প্রত্যেক দিন সঙ্গে করে নিয়ে যেত ছোটো ভাইটিকে। যতক্ষণ ক্লাস চলত, ততক্ষণ কৃষ্ণকমল বসে থাকত সিঁড়ির কাছে একটা বেঞ্চের ওপর।

রামকমল ভাইটিকে বাড়িতে পড়ায়, আবার কলেজ ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে ও সেদিন ক্লাসে কী শিখেছে তা শোনায়। একদিন বিদ্যাসাগরমশাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছোটো ছেলেটিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে রে?

কৃষ্ণকমল আড়ষ্টভাবে নিজের পরিচয় দিল।

ভালো ছাত্র হিসেবে রামকমলকে তখন সবাই চেনে। তার ভাইকে বিদ্যাসাগর বললেন, তুই এভাবে বসে থাকবি কেন? চল তোকে আমি ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিই।

সেই থেকে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক স্থাপিত হল। সে সম্পর্ক অবশ্য একনিষ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধার নয়, কখনো বিনীত আনুগত্যের, কখনো উদ্ধত বিরোধের।

ছাত্র হিসেবে বড়ো ভাই রামকমলের খ্যাতি ছড়াতে লাগল দিন দিন। যেমন সংস্কৃত, তেমনই ইংরেজি এবং গণিতেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। কোনো কোনো অধ্যাপক স্বীকার করেছেন যে তাঁদের চেয়েও ছাত্রটির জ্ঞান বেশি। অন্য বিষয়গুলি শেষ করে রামকমল যখন দর্শন পড়তে শুরু করলেন, তখন তাঁর সমকক্ষ ছাত্র আর কেউ নেই, ক্লাসে তিনি

একমাত্র ছাত্র, পরীক্ষার সময় তাঁর জন্য ছাপা হত একটি মাত্র প্রশ্নপত্র।

কৃষ্ণকমলও সুযোগ্য ভাইয়ের মতন পড়াশুনোয় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগল। উত্তরকালে কৃষ্ণকমল প্রথমে সংস্কৃতের একজন প্রধান পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন, তারপর ইংরেজি ভাষায় দুর্ধর্ষ জ্ঞানী হয়েছিলেন, ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন, বিশ্ব সাহিত্যে ও দর্শন মন্থন করে হয়েছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঝোঁক ছিল বিজ্ঞানে, আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতে করতেই আইন পড়তে শুরু করেন এবং এক সময় অধ্যাপনা ছেড়ে উকিল হয়ে বেশ অর্থোপার্জন শুরু করেন, আইনের অধ্যাপনাও করেছেন কিছুদিন।

একজন মানুষের মধ্যে এতরকম বিদ্যার সমন্বয় সে যুগেই সম্ভব ছিল। এ যুগেও যে এরকম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নেই তা নয়, কিন্তু তারা যুগের ধর্ম অনুযায়ী বিজ্ঞান, কারিগরি বা ডাক্তারির দিকে চলে যায়। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠে ক্বচিৎ মেধাবীরা আসে, এবং স্পেশালাইজেশানের ঝোঁকে এক বিদ্যার অধিকারী অন্য কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করতে চায় না।

কৃষ্ণকমল আর বঙ্কিমচন্দ্র একই বছরে এন্ট্রান্স পাশ করেন। (পরে এই এন্ট্রান্সের নাম হয় ম্যাট্রিক, এখন তা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মাঝামাঝি) কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্গে একই বছরে কৃষ্ণকমল বি. এ. পাশ করতে পারেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দুজন গ্র্যাজুয়েটের অন্যতম হন বঙ্কিম, কৃষ্ণকমল দুবছর পিছিয়ে যান। কেন?

এন্ট্রান্স পাশ করে বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন কৃষ্ণকমল, তারপর তাঁর কী মতি হল, তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন বিবাগী হয়ে। কোথায় যে গেলেন, কেউ তাঁর খোঁজ পেল না। ফিরেও এলেন কয়েক মাস বাদে। কিন্তু পড়াশুনোয় ছেদ পড়ে গেল। কলেজে আর গেলেন না, বাড়িতে বসেই নিজে নিজে পড়ে বি এ পাশ করলেন আড়াই বছরের মধ্যে।

সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কৃষ্ণকমল একই বয়সী। কালীপ্রসন্নর বাল্যকালটি অতি সংক্ষিপ্ত। যৌবনে পৌঁছবার আগেই তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের মতন অনেক কাজকর্ম শুরু করে দেন। যেমন চোদ্দো-পনেরো বছর বয়েসেই নিজের প্রাসাদে একটি সমিতি খোলেন, যার নাম বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সেখানে ভারি ভারি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হত। যদিও কু-লোকে আড়ালে তার নাম দিয়েছিল মদ্দোৎসাহিনী সভা। সেকালের ধনী বাড়ির রীতি অনুযায়ী সভা শেষে পানাহারের ব্যবস্থা থাকত অবশ্যই।

কৃষ্ণকমল ওই বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্য হয়ে দু-একবার প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেই তাঁর বাংলা রচনায় হাতেখড়ি। কৃষ্ণকমলের কিন্তু সাহিত্যিক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একেবারেই ছিল না, যোগ্যতা ছিল যথেষ্ট কিন্তু খ্যাতির ব্যাপারে উদাসীন। পরবর্তী জীবনে এলোমেলো ভাবে যা লিখেছেন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের সময় এক-একটাতে

নিজের নামই দেননি। বই প্রকাশের ব্যাপারেও আগ্রহ ছিল না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কৃষ্ণকমল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে কোথায় ছিলেন তা কারুকে জানাননি, ফিরে আসার পর তিনি একটি দীর্ঘ কাহিনী লেখেন, সেটা ওই প্রবাসবাসেরই ফল। প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ। রচনাটির নাম 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কেউ কেউ হয়তো রচনাটি পড়েছেন, আর অনেকেই নাম শুনেছেন কিন্তু পড়েননি। পড়া খুব সহজও নয়, তখনো বঙ্কিমী গদ্য প্রতিষ্ঠা পায়নি, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতবহুল, সমাসবদ্ধ পদের বাংলা গদ্যই প্রচলিত, কৃষ্ণকমলও সেই ধারাতেই লিখেছেন। একটু কষ্ট করে পড়লে দেখা যাবে, 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতন, কোথাও কোথাও রয়েছে চমৎকার কবিত্বের ছোঁওয়া।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম :

একটি হিন্দু বাঙালি যুবক খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করল এই লোভে যে তাহলে অনেক ইংরেজি বিবি তাকে প্রাণনাথ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে, মিশনারিরাও তাকে খাতির করবে। বাস্তবে তার কিছুই হল না, কোনো মেমসায়েবই প্রণয়ীভাবে তার দিকে তাকাল না, মিশনারিরাও সামান্য বৃত্তি দেয় মাত্র। বাঙালি বলে ইংরেজরা ঘৃণা করে আর ধর্মভ্রষ্ট বলে স্বদেশবাসীরাও তার সঙ্গে মিশতে চায় না। তখন সে ঠিক করল, বাংলা মুল্লুক ছেড়ে, এমনকি ইংরেজ রাজত্বেরও বাইরে কোথাও চলে যাবে। মহীশূরের হায়দার আলির দেশীয় রাজ্যে থাকার বাসনা নিয়ে সে গঙ্গায় ফ্লোরেন্স নামে এক জাহাজে চেপে বসল।

রচনাটি উত্তমপুরুষে লেখা, নায়কের নাম নেই। সে শুধু 'আমি'। জাহাজে যুবকটির সঙ্গে একটি ফরাসি তরুণীর আলাপ হল, তার নাম জুলিয়া। ফরাসি মেয়েরা ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি উদার। দুজনের আলাপ যখন প্রায় প্রণয়ে পর্যবসিত হতে চলেছে, সেই সময় উঠল প্রবল ঝড়, এমনই সেই ঝড়ের দাপট যে কথা বলতে বলতেই জুলিয়া উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে গেল সাগরে। জাহাজটিরও ডুবুডুবু অবস্থা দেখে যুবকটিও একটি নৌকায় ভেসে পড়ল। কিন্তু দারুণ ঢেউয়ে ওঠানামা করতে করতে তার প্রাণ সংশয় অবস্থা, একসময় সে জ্ঞান হারাল।

এইরকম অবস্থায় যদি আবার জ্ঞান ফিরে আসে, তাহলে মানুষ প্রথমেই চোখ মেলে কী দেখে? গল্প-উপন্যাসে অবশ্যই এক সুন্দরী তরুণীর নীলবর্ণ উজ্জ্বল নয়ন! নৌকোটি ভাসতে ভাসতে এক পাহাড় ঘেরা দ্বীপে এসে ঠেকেছে এবং নায়কটিকে উদ্ধার করেছে ওই যুবতী। স্থানটি অতি মনোরম, প্রচুর গাছপালার মধ্যে রয়েছে সুগন্ধ চন্দন গাছও। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে যে যুবকটি জুলিয়ার প্রেমে গদগদ ছিল, এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এই অনামা যুবতীটির প্রণয়-বশংবদ হতে চাইল। 'ইহারই নাম মানুষের অচঞ্চলতা, ইহারই নাম মানুষের জিতেন্দ্রিয়তা। আর ইহারই নাম মানুষের এক পত্নীব্রততা।'

যুবতীটির প্রণয়ে ও সেবায় নায়ক সুস্থ হয়ে উঠল এবং সেখানেই দুমাস থাকার পর সে স্থানীয় ভাষা শিখে নিল। জায়গাটিতে পুরোপুরি আধুনিক সভ্যতা এসে পৌঁছয়নি। মানুষগুলি স্নিগ্ধ স্বভাবের এবং দারিদ্র নেই। উদ্ধারকারিণীটি সেই স্থানটির অধিপতির মেয়ে, তার নাম কমলাদী, সে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব দিল একসময়। পাঠক যদি ভেবে থাকেন যে এই দু'মাস একসঙ্গে, নিভৃতে থাকার সময় দুজনের পরস্পরের মধ্যে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে, লেখক তাই জানিয়ে দিচ্ছেন, তা কিন্তু নয়, কমলাদী খুব সরল হলেও ধর্ম মেনে বিবাহের আগে ওসব চিন্তা করেনি। বাড়ির লোকেরা এ বিবাহে আপত্তি জানায়নি।

তারপর অনন্ত মধুমাসের মতন সময় কাটতে লাগল। নির্জন অরণ্যে কিংবা ঝরনার ধারে উদ্দাম শরীর খেলা। ক্রমে কেটে গেল একটা বছর। তখন যুবকটির মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, সে কি সারাজীবন এইভাবেই কাটাবে? এই একটা উপজাতীয়দের মধ্যে সংসারী হয়ে থেকে যাবে? শুধু রমণীর প্রণয়ই যথেষ্ট, তার আর কোনো কর্মোদ্যোগ কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে না? একদিন কমলাদীর শরীরে সন্তান সম্ভাবনার চিহ্ন দেখলে সে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এই রে, একটা ছেলে বা মেয়ে হলে তো সে স্নেহের বন্ধনে আরও বাঁধা পড়ে যাবে।

এক ভোরবেলা গর্ভবতী পত্নীকে ফেলে সে পালাল। তারপর অনেক পাহাড়-জঙ্গল ও দুর্গম পথ পার হয়ে সে কোনোরকমে এসে পৌঁছল এক জনপদে। তার পাশেই হায়দারি আলির রাজ্যের সীমানা। সেখানকার লোকজনের মুখে শুনল হায়দার আলির সুশাসনের অবিমিশ্র প্রশংসা, তাঁর রাজত্বে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সুখে আছে। সে-রাজ্যে পৌঁছে সে সেনানায়কের সঙ্গে দেখা করে সৈনিকের চাকরি চাইল। সেনানায়ক তার পোশাক ও বাঙালির মতন চেহারা দেখে প্রথমে ইতস্তত করছিল, তারপর যুবকটির মুখে ইংরেজদের সম্পর্কে নিন্দে শুনে ভর্তি করে নিল সৈনিকদের দলে। কিছুদিনের মধ্যেই একদল দুর্ধর্ষ দস্যুকে ধরিয়ে দিয়ে যুবকটির পদোন্নতি হয়ে গেল। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও তার বীরত্বের কথা রটে গেল দিকে দিকে। স্বয়ং সুলতান হায়দার আলি পছন্দ করেন তাকে। নিজের ছেলে টিপুর সঙ্গে তার তুলনা করে টিপুর সামনেই এর প্রশংসা করেন, টিপুর তা পছন্দ হবে কেন? হায়দার আলি তাঁর মেয়ের সঙ্গেও এই বাঙালি যুবকটির বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর হল না, হায়দারের মৃত্যু হল অকস্মাৎ। সুলতান হয়েই টিপু শত্রুতা শুরু করে দিল ওর সঙ্গে। এমনকি এই বাঙালিকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একদিকে সন্ধির সুযোগ নিতে চাইলেন টিপু, আমাদের নায়ক তা জানতে পেরে আবার পলায়ন করল। যদিও এত সৈন্য তার অনুরক্ত ছিল যে সে অনায়াসে বিদ্রোহ করতে পারত টিপুর বিরুদ্ধে।

এবার সে পৌঁছল সিন্ধিয়ার রাজ্যে। তার সুনাম এ রাজ্যেও পৌঁছেছে আগেই, তাই সিন্ধিয়া তাকে সভাসদ করে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হাতের পাখি ফসকে গেছে দেখে ইংরেজরা সিন্ধিয়ার কাছে দূত পাঠাল ওই বাঙালি বীরকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য। মারাঠাদের তখন প্রবল প্রতাপ, ইংরেজদেরও গ্রাহ্য করে না। সিন্ধিয়া অবজ্ঞার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন সেই দূতকে। এর ফলে, বাঙালি যুবকটির ইংরেজ বিদ্বেষ আরও বেশি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

সব রাজ্যেই রাজা নবা নবাবের এক অবিবাহিতা কন্যা থাকে। আমাদের এই যুবকটি বেশ দীর্ঘকায় এবং রূপবান নিশ্চয়ই, সেই জন্যই মেয়েরা পটাপট তার প্রেমে পড়ে যায়। মালবের রাজকুমারী চিকের আড়াল থেকে তাকে দেখে প্রণয়জালে পতিত হয়েছে। এই সংবাদ যুবকটির কানে এল কোনোক্রমে। কিন্তু মারাঠারা নিজেদের জাত সম্পর্কে খুবই রক্ষণশীল, অন্য জাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয় না। সুতরাং সরাসরি বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবেই। যুবকটি ঠিক করল, কোনোক্রমে গোপনে বিয়ে করতে হবে। একবার বিয়ে করলে সিন্ধিয়া নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে তাড়িয়ে দেবেন না। মেনেই নেবেন শেষ পর্যন্ত। সিন্ধিয়ার মেয়েকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই আরও উচ্চপদ পাওয়া যাবে। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর জামাইয়ের পক্ষে সিংহাসন দখল করাও আশ্চর্য কিছু নয়। তারপর প্রাণপণে লড়াই করা যাবে ইংরেজদের সঙ্গে।

দুজন অমাত্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, তাদের সাহায্য নিয়ে এক সন্ধেবেলা প্রহরীদের চক্ষু এড়িয়ে নায়ক ঢুকে পড়ল রাজবাড়ির বাগানে। সেখানে মধ্যরাত পর্যন্ত লুকিয়ে রইল ঝোপের আড়ালে। তার কাছে আংটা লাগানো দড়ির মই ছিল, মধ্যরাতে সেই মইয়ের সাহায্যে রাজকুমারীর শয়নকক্ষের জানলার কাছে উপস্থিত হল। সেখানে সে কী দেখল? এটা লেখকের ভাষাতেই শোনা যাক।

"সকল আলোক নির্বাণ হইয়াছিল, কেবল একটিমাত্র প্রদীপ সুপ্ত নৃপতনয়ার মুখে আপনার প্রভাজাল ছড়াইয়া দিতেছিল। আমি এক উচ্চ পর্যঙ্কে শায়ন রাজকুমারীর শরীর দর্শন করিয়া যেন জড়ীভূত হইয়া গেলাম। সেই ভক্তিযোগ্য রূপ দর্শন করিলে মনে কোনোপ্রকার অসৎ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয় না। আমার সেই আকারকে যেন অলৌকিক জীব বোধ হইল। পবিত্রতা যেন মূর্তিমতী হইয়া আমা হইতে ভক্তির আকর্ষণ করিতে লাগিল। এরূপ মহিমা, এরূপ কান্তিচয়, এমন আকর্ষণীয়তা কখনো দেখি নাই। তাহার রূপ মধুর। তবু মনে হয় একপ্রকার সম্ভ্রমের উৎপাদন করে।"

যুবকটি মন্ত্রমুগ্ধের মতন দূরে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর অলৌকিক রূপ দর্শন করছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাজকন্যার। তখনই সব ভক্তিরস কিংবা মধুর ভাব উধাও হয়ে গেল। সেই সুন্দরী ললনা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, ওরে দুরাত্মা, আমি তোর অভিসন্ধি

বুঝতে পেরেছি। যার শিরায় শিবাজির রক্ত বইছে, সেই মারহাট্টা যুবতী তোর জন্য চরিত্র নষ্ট করবে? তোকে আমি ভালো বেসেছিলাম বটে, কিন্তু এখন বুঝলাম, তুই তার যোগ্য নয়। এই রাতেই এ রাজ্য থেকে দূর হয়ে যা নইলে কালই তুই খুন হবি।

তারপর খানিকটা দয়াপরবশ হয়ে রাজকন্যা নিজের গা থেকে একটা গয়না খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যা, তোর পাথেয় হবে।

আবার পলায়ন। প্রত্যেকবারই যাত্রাপথের সুদীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর বর্ণনা আছে। এবার তার সঙ্গে যোগ হয়েছে উৎকণ্ঠা রস। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ সে পড়ে গেল এক হিংস্র বাঘের মুখোমুখি। যুবকটির কাছে কোনো অস্ত্র নেই। বাঘটি যখন তার দিকে লাফাবার জন্য লেজ আছড়াচ্ছে, তখন সে উপায়ান্তর না দেখে তার দিকে রাজকুমারীর দেওয়া গয়নাটি ছুঁড়ে মারল। সেই হিরে-মুক্তো বসানো জিনিসটির চাকচিক্য দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল বাঘটা। তারপর দাঁত দিয়ে সেটা কড়মড় করে ভাঙতে লাগল। সেই অবসরে যুবকটি উঠে পড়ল একটা বটগাছে।

বাঘ তাকে ছাড়বার পাত্র নয়, গাছের নীচে বসে রইল প্রতীক্ষায়। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দেয়। বাঘটিও ক্ষুধার্ত। মানুষটি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। ধৈর্যের পরীক্ষায় কেটে গেল একটা দিন ও রাত। তারপর যুবকটির অবস্থা যখন খুবই শোচনীয় সেই সময় বাঘটি মরণ-আর্তনাদ করে উঠল। আড়াল থেকে এক ব্যাধ তাকে তির মেরেছে। তারপর লাফিয়ে এসে ব্যাধটি একটি তলোয়ারের কোপে বাঘের মুণ্ডু কেটে ছাল ছাড়াতে লাগল।

ব্যাধটি পুলিন্দ নামে এক অরণ্যচারী জাতির মানুষ। এইসব আদিবাসীরা হিংস্র হলেও খুবই অতিথিপরায়ণ হয়। সে যুবকটিকে অভয় দিয়ে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। সেখানকার নারীদের সেবাযত্নে সে সুস্থ হয়ে ওঠার পর পুলিন্দদের দলপতি বা রাজাকে সে জানাল যে, ইংরেজরা তার কথা জানতে পারলে এখানকার সকলেরই বিপদ হবে। তার চলে যাওয়াই উচিত। দলপতি বললেন, ইংরেজরা কোনোদিনই এই গভীর জঙ্গলে ঢোকে না। সুতরাং তার কোনো চিন্তা নেই। সে এখানেই থাকতে পারে। দলপতি তাকে খাতির করে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

বলাই বাহুল্য এই দলপতিরও একটি যুবতী কন্যা থাকবেই। তার বয়েস ষোলো বছর। এখন আমরা ফ্রক পরা, বেণী দোলানো পনেরো-ষোলো বছরের কন্যাদের পুঁচকে মেয়ে মনে করি, কিন্তু সেকালে এই বয়েসী মেয়েরাই হত সব কাব্য-কাহিনীর নায়িকা।

রবীন্দ্রনাথও তো লিখেছেন পঞ্চদশী মেয়েরা পূর্ণিমায় পৌঁছে যায়।

গভীর অরণ্যের এই আদিবাসীদের মধ্যে শহুরে সভ্যতার স্পর্শ লেগেছে খুবই কম। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় নগ্ন। অধিপতির মেয়েটির রূপ এইরকম :

“ময়ূরপুচ্ছ হইতে পালক তুলিয়া অতিস্ফীত কপোলে বসাইয়া দিয়া বিচিত্রিত

করিয়াছে। তিসীপুষ্প সদৃশ দুই উরুতে লোহিত বসন জড়ানো আছে। সম্পূর্ণরূপে পরিবৃদ্ধ স্তনদ্বয় চুচুক ব্যতীত সর্বাগ্রে সিন্দুরাক্ত হইয়া ঠিক দুই বৃহৎ গুঞ্জাফলের মতন দেখিতে হইয়াছে। (গুঞ্জাফল হচ্ছে কুঁচফল, সেগুলি বেশ ছোট। কল্পনা করতে হবে বৃহৎ কুঁচফল।) শীর্ষস্থ কেশপাশ ঘাড়ে এক খোঁপা বাঁধা আছে। তাহাতে দুটি একটি পুষ্পও প্রদত্ত হইয়াছে। বেগুনের মতন সর্বাঙ্গ চিক্কন।''

নিজের রূপ নিয়ে এই মেয়েটির বেশ গর্ব আছে। তার প্রণয়প্রার্থীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু ফর্সা বাঙালিটিকেই তার মনে ধরে গেল। যুবকটি সেখানে শিকার করে ও সাঁতার কেটে বেশ দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু সেই মেয়েটি তাকে বিয়ে করার বায়না ধরে বসল, বাবার সামনেই সে তার দয়িতকে আলিঙ্গন ও আদর করে। মেয়ের আগ্রহ দেখে দলপতি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন, আমন্ত্রিত হয়ে এল তাঁর স্বজাতির অনেক মানুষ।

যে-কোনো কারণেই হোক, আমাদের নায়কটি প্রথম থেকেই এই নায়িকাকে পছন্দ করতে পারেনি। সম্ভবত আগের সেই মারাঠা রাজকন্যার রূপের বিভা তার চক্ষে লেগেছিল। তাছাড়া, যে-মেয়ে অপমান করে, তার কথাই বেশি মনে থাকে। কিন্তু এখানেও প্রত্যাখ্যান করলে দলপতির ক্রোধ হতে পারে। এখন উপায়?

যুবকটি লক্ষ করল, আমন্ত্রিত যুবকদের মধ্যে একজন তার দিকে রাগ রাগ চোখে তাকাচ্ছে। সে ছিল এই দলপতির কন্যার পাণিপ্রার্থী। এই বহিরাগত যুবকটির ধৃষ্টতা সে সহ্য করতে পারছে না। সুযোগ পেলে সে হয়তো বাঙালির বাচ্চাটিকে খুনই করে ফেলবে।

সে ওই যুবকটিকে একটি নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ভাই, তোমার প্রিয়ার পাণিগ্রহণ করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছি। তুমি যদি আজ রাত্তিরেই আমার পালাবার ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে তোমার ইচ্ছেতে আর কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু ইংরেজদের হাতে যেন আমি না পড়ি, তা হলে সমূহ বিপদ। যুবকটি উল্লসিত হয়ে তার এই প্রতিপক্ষকে এক পথপ্রদর্শক মারফত পাঠিয়ে দিল ওড়িশার জঙ্গলের দিকে। সে অঞ্চল তখনও ইংরেজের অধিকৃত হয়নি।

কাহিনীর নামে ভ্রমণ শব্দটি আছে। বারবার এই পলায়ন অংশেই রয়েছে ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভূপ্রকৃতি ও ঝড়বৃষ্টি বর্ণনার বৈচিত্র্য আছে। এবারে সে পড়ে গেল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে। একেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ চেনা দায়, তার ওপর ঝড়বৃষ্টির অন্ধকারে দিশেহারা অবস্থা হয়। যাই হোক, অনেকক্ষণ পর, অনেক কষ্টের পর সে দেখতে পেল আলো, একটি কুটিরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। সেখানে এক পাকা চুল-মাথা বৃদ্ধ তাকে আশ্রয় দিল দরজা খুলে।

হ্যাঁ। পাঠক আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, এখানেও রয়েছে একটি যুবতী। বাইরে ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ, কুটিরের ভেতরটা আশ্চর্য রকমের শান্ত। যুবতীটি কোনো কথা না বলে

নিঃশব্দে পদ্মবীজের মালা গাঁথছে। তার দু'পাশে রয়েছে একটি কুকুর ও বেড়াল। বৃদ্ধটিকে দেখে মনে হয়, তাঁর আয়ু আর বেশি দিন নেই। বৃদ্ধের নির্দেশে যুবতীটি এক সময়ে উঠে গিয়ে একটা নারকেলের খোল ভর্তি লেবুর রস, আখের রস ও জল মেশানো একরকম পানীয় এন দিল নায়ককে। যা পান করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার শরীর।

এরপর পরিচয় বিনিময়ের পালা। প্রথমে যুবকটি জানায় তার নানারকম অভিজ্ঞতার কথা। এরপর বৃদ্ধের আত্মপরিচয়, তা বেশ সুদীর্ঘ। সংক্ষেপে এই, সেই বৃদ্ধটি মালাবারের সবচেয়ে নিচু জাতি পরিয়া (আমরা এখন বলি পারিয়া) সম্প্রদায়ের সন্তান। পরিয়ারা শুধু অচ্ছুৎ নয়, ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের চোখের সামনে এসে পড়লেও তাদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। অপমান এবং লাথি ঝাঁটা খেয়েই তাদের জীবন কেটে যায়। এই লোকটি একটু বয়েস বাড়বার পর ঠিক করল, সে আর মানুষের কাছাকাছি থাকবে না। বনের পশুদের সঙ্গে গিয়ে বাস করবে, সেও ভালো। এইভাবেই সে একা একা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। বেশ কিছু বছর কাটবার পর তার মন ব্যাকুল হতে লাগল মানুষের মুখ দেখার জন্য। কিন্তু মানুষ তো তাকে চায় না। হীন জাতি বলে মানুষ তাকে ঘেন্না করে। তাই সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতন কোনো শহরে ঢুকে ঘুরে বেড়াত। দিনের পর দিন গাছপালা দেখার পর ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ি ঘর দেখতেও ভালো লাগত তার। এইভাবে দিনের বেলায় তার কাটে জঙ্গলে, আর রাত্রির অন্ধকারে কোনো জনপদে।

একদিন এক শ্মশানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে সে দেখতে পেল এক যুবতী বিধবাকে সতী করার জন্য চিতায় চড়ানো হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনরা কাছে ছিল না, দূরে বসে ছিল। পরিয়া পুরুষটি ছুটে গিয়ে মহিলাটিকে চিতা থেকে নামিয়ে আনে ও তাকে সঙ্গে নিয়ে বনে পালিয়ে যায়।

এতদিন পর তার একজন সঙ্গিনী হল। মৃত্যু থেকে যে ফিরে এসেছে তার কোনো জাত থাকতে পারে না। বিয়েরও প্রশ্ন নেই। সেই রমণীটি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে কিছুদিন পরে সত্যি সত্যি মারা যায়। সেই শিশু কন্যাটিই বর্তমানের যুবতী, সে অরণ্যের বাইরে কখনো যায়নি।

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধটি হা-হুতাশ করতে লাগল, তার মৃত্যুর পর মেয়েটির কী হবে? একে তো নিচুস্য নিচু জাত, তার ওপর মেয়েটি বেজন্মা। তাকে কেউ বিয়ে তো করবেই না, এমনকি রক্ষিতা হিসেবেও স্থান দেবে না। এই জঙ্গলে সে একাকিনী জীবন কাটাবে কী করে?

বৃদ্ধটি কাঁদতে শুরু করল, মেয়েটিও নীরবে অশ্রুপাত করছে, তা দেখে আমাদের নায়কটির মনে জেগে উঠল আদর্শবাদ। এতদিন সে ছিল চতুর, স্বার্থপর, নারীলোভী ও ধান্দাবাজ, হঠাৎ যেন তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে গেল। সে বৃদ্ধের হাত ধরে বলল,

তাত, আমি তোমার কন্যার ভার গ্রহণ করব। বিশ্বাস করো, আমি কখনো রিপু চরিতার্থ করে ওকে পরিত্যাগ করব না। এই আমার শপথ।

সত্যিই তাই, সে বৃদ্ধের সামনে তাঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ করল এবং অচিরকালেই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর সেখানেই রয়ে গেল আজীবন। একসময় সে এক গর্ভবতী পত্নীকে ফেলে পালিয়েছিল, এখন তার আর কোনো উচ্চাশা নেই, খ্যাতির মোহ নেই। সভ্য সমাজের প্রতি আকর্ষণ নেই। দূরাকাঙ্ক্ষের ভ্রমণ এখানেই শেষ এবং তা একেবারে বৃথা নয়।

কাহিনিটি আমি একটু সবিস্তারেই বর্ণনা করলাম। বিখ্যাত সাহিত্য রচনার চলচ্চিত্র রূপ দেখেই যেমন কেউ কেউ বলেন, মূল গ্রন্থটি পড়া আছে, সেইরকম, আমার এই সরল রচনাটি পাঠ করে কেউ কেউ বলতে পারবেন, খটোমটো ভাষার মূল বইটিও পড়ে ফেলেছি।

কাহিনিটিতে ঘটনার ঘনঘটা খুব বেশি। নায়িকার সংখ্যাও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তবে এটা মনে রাখতে হবে, এই গ্রন্থ-রচনার সময় কৃষ্ণকমলের বয়েস তেরো। এই বয়েসে যৌন আবেগ ও নারী কল্পনায় একপ্রকার স্বপ্ন পূরণ হয়। তবে, অনেক বয়স্ক লেখকদের রচনাতেও কি অবান্তর নায়িকাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি থাকে না?

মাত্র সতেরো বছরের এক বালকের (আমরা এখন বালকই বলি, তখন বলা হত যুবক) পক্ষে এ গ্রন্থের রচনাশক্তি বিস্ময়কর। তাঁর ভাষা আভিধানিক এবং অলঙ্কারবহুল হলেও তাতে ধ্বনিমাধুর্য আছে এবং বাংলা গদ্যের সেই আদিযুগে খানিকটা মৌখিক ভাষারও আঙ্গিক ব্যবহারের প্রয়াস আছে। চর্চা চালিয়ে গেলে তিনি যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যে কীর্তি স্থাপনের কোনো আগ্রহই যেন ছিল না তাঁর। এমনকি 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়, তার আখ্যাপত্রে নাম ছিল না লেখকের।

এই উপন্যাসটির দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। প্রথমেই তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কারণ হিসেবে লোভের কথা বলেছেন। তখন অনেক হিন্দু যুবকেরই কিছু না কিছু প্রাপ্তির আশায় ধর্মান্তরের আগ্রহ হত। কৃষ্ণকমল পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন, কোনো ধর্মেই তাঁর শ্রদ্ধা নেই। খ্রিস্টধর্মকে যারা অন্য ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাদের তিনি ঘৃণা করেন।

রচনাটির শেষ অংশে হিন্দুদের কুৎসিত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই তেরো বছরের লেখকটি। উঁচু জাতগুলিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি, নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁর সহানুভূতি অন্ত্যজদের প্রতি এবং এক অচ্ছুৎ কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে কাহিনির নায়ক। সেকালের পক্ষে এই চিন্তা আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা বলা যেতে পারে।

কৃষ্ণকমলের দাদা রামকমল অল্প বয়েসে পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে পুজোআচ্চা করতেন, ক্রমে তিনি নাস্তিক হয়ে যান। তখন ছোটো ভাই কৃষ্ণকমলের ওপর এই ভার পড়ে। কৃষ্ণকমলও কিছুদিন পুজো করেছিলেন, গোঁফের রেখা দেখা দেবার আগেই তিনিও দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, সবরকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর তাঁর ভক্তি চটে যায়। এই দুই ভাইই নাস্তিকতার প্রেরণা পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর নাস্তিক হলেও তা নিয়ে প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করতেন না, বড়োজোর কেউ পরলোক কিংবা পরজন্ম নিয়ে কথা বললে মৃদু কৌতুক করতেন। একবার কোনো ব্যক্তিকে বলেছিলেন, ঈশ্বর যদি থাকেনও তো তিনি তো আর কামড়াবেন না। কৃষ্ণকমল বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সদর্পে ঘোষণা করতেন নিজের অবিশ্বাসের কথা।

রামকমলের জীবন অকস্মাৎ এক ট্র্যাজেডিতে শেষ হয়ে যায়। দারুণ পড়ুয়া ছিলেন রামকমল, এমনই তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা যে সারাদিন কোনো না কোনো বই চোখের সামনে না থাকলে তাঁর চলে না এবং তাঁর আগ্রহ বহু বিষয়ে। যৌবনেই তাঁর চোখের রোগ দেখা দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। এক সময় বই পড়াই তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিছু কিছু লিখতেও শুরু করেছিলেন, তাও থেমে যায়। খাওয়া-দাওয়ার চেয়েও বই পড়া যে মানুষের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়, সে পড়তে না পারলে বাঁচবে কী করে। তখন তো আর ভেলোরের নেত্রালয় হয়নি, চোখের রোগের বিশেষ চিকিৎসাও ছিল না। রামকমল শিক্ষকতা করতেন, তা নিয়ে তাঁর মনে কিছুটা অশান্তি ছিল, পারিবারিকভাবেও কিছু ছিল কি না জানা যায় না, সম্ভবত বই পড়তে না পারার দুঃখেই তিনি হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন তাঁর স্ত্রী পাঁচ মাসের গর্ভবতী।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এটাই বোধহয় প্রথম আত্মহত্যার ঘটনা। ছোটো ভাই কৃষ্ণকমল অবশ্য বেঁচেছিলেন অনেকদিন।

বিদ্যাসাগরের সাহচর্য ছাড়াও কৃষ্ণকমল আকৃষ্ট হয়েছিলেন ইওরোপের এক দার্শনিকের প্রতি। ইনি জাতে ফরাসি, নাম অগুস্ত কোঁৎ (August Comte)। তখন অনেকেই উচ্চারণ করত কোম্‌ত, ইংরেজরা বলত কম্‌ট। কৃষ্ণকমল এঁর এত ভক্ত ছিলেন যে দাদার মৃত্যুর পর সান্ত্বনা চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন এই ফরাসি দার্শনিককে। কিন্তু কোঁৎ যে এর মধ্যে নিজেই মৃত হয়েছেন তা কৃষ্ণকমল জানতেন না। চিঠিখানায় প্রেরকের নামে কেয়ার অফ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিল, সেইজন্য ডেড লেটার অফিস থেকে চিঠি বিদ্যাসাগরের কাছেই ফিরে আসে। কৌতূহলী হয়ে বিদ্যাসাগর চিঠিখানা পড়ে দেখেন। খুব সম্ভবত কোঁৎ-এর দর্শন তাঁর কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল।

কোঁৎ একটি ধর্মমত প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তার নাম Positivism। তার বিশদ

আলোচনার দরকার নেই, শুধু এইটুকু বলা যায় যে সমস্ত ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাস বা পরলোক বিশ্বাসের মূলে আছে ভয়, ধর্মের নামে অনেক হিংসা ও কাটাকাটি হয়। সমাজে ধার্মিক হিসেবে অনেক ব্যক্তি আসলে পাপাচারী, যেমন ধর্মের প্রবক্তারাও অনেক কুকার্য করে। তাই কোঁৎ চেয়েছিলেন, সমস্ত ধর্মের নির্যাস বজায় রেখে সামাজিক সদাচার ও বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার বদলে মানবকিতা। খুবই উন্নত আদর্শের চিন্তা সন্দেহ নেই, কিন্তু ইউটোপিয়াও বটে। মানুষ এসব মানবে কেন, মানুষ তো ধর্মের ছল-ছুতোয় হিংসাই ভালোবাসে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই মতবাদ খানিকটা সাড়া জাগিয়েছিল বটে, এখন অনেকেই ভুলে গেছেন। বরং কোঁৎ-এর প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন জন স্টুয়ার্ট, যুক্তিবাদী হিসেবে তাঁর কদর আছে এখনও।

কোঁৎ কতকগুলি মজার কাণ্ড করেছিলেন, তিনি বদলে দিতে চেয়েছিলেন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের নামকরণ। যাকে আমরা এখন ইংরেজি মাস বলি, তার অনেকগুলিই গ্রিক বা রোমান দেবদেবীর নামে। কোঁৎ সেগুলির বদলে, তাঁর মতে যাঁরা মহামানব, রাখতে চাইলেন তাদের নাম। যেমন প্রথম মাসের নাম মোজেস, দ্বিতীয় হোমার, তৃতীয় অ্যারিস্টটল, চতুর্থ আর্কিমিডিস, পঞ্চম সিজার, ষষ্ঠ সেন্ট পল, সপ্তম শার্লামাইন, অষ্টম দান্তে, নবম গুটেনবার্গ, দশম শেকসপিয়র, একাদশ ডেকার্ত, দ্বাদশ ফ্রেডরিক দা গ্রেট। তার পরিকল্পনায় আর একটি মাসও আছে, কারণ প্রতিটি মাসই হবে আঠাশ দিনে। ত্রয়োদশ মাসটির নাম হবে মিসা। অন্য নামগুলি মোটামুটি পরিচিত হলেও এই মিসাটি কে? ইনি একজন ফরাসি শরীরতত্ত্ববিদ, টিসু নামে ব্যাপারটির উদ্ভাবক, কিছু কিছু চিকিৎসক ছাড়া আর কেউ এঁর নাম জানে কিনা সন্দেহ।

বোঝাই যাচ্ছে, পশ্চিমী সভ্যতার বাইরে বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না এই দার্শনিকের। ভারত বা চিনের প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে কিছুই জানতেন না। মাসের মতন তিনি সপ্তাহ ও দিনগুলির নামও দিয়েছিলেন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের, তাঁদের মধ্যে অতি কষ্টে মনু, বুদ্ধ, মহম্মদ ও কনফুসিয়াসের নাম খুঁজে বার করা যায়। কৃষ্ণকমল এমনই কোঁৎ-এর ভক্ত ছিলেন যে এইসব মহাপুরুষদের তালিকায় হোমার, দান্তে, শেকসপিয়রের পাশাপাশি বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের নাম নেই কেন তা নিয়েও আপত্তি করেননি।

কৃষ্ণকমলের কোনো রচনারই পাঠযোগ্যতা নেই একালে। তবে তার একটিমাত্র রচনা (মৌলিক নয়, অনুবাদ) স্মরণীয় হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে। সে রচনাটিও এখন কেউ পড়বে না, কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীর অন্তর্গত হয়ে আছে। সেটি একটি ফরাসি উপন্যাসের অনুবাদ, বার্নাদিন দ্য স্যাঁ-পিয়ের রচিত 'পোল এ ভির্জিনি'। এটি অনুবাদেরও প্রেরণা কৃষ্ণকমলের ভাবগুরু কোঁৎ। কোঁৎ সকলের আদর্শ পাঠ্য আড়াইশো খানা গ্রন্থের

একটি তালিকায় (বলাই বাহুল্য, সবই পশ্চিমী) তার মধ্যে এই গ্রন্থটির নাম ছিল। কয়েক দশকের মতো এই উপন্যাসটি ফরাসি দেশে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, এখন হারিয়ে গেছে, ফরাসি সাহিত্যে এর স্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। (কোঁৎ-এর প্রেরণায় কৃষ্ণকমল এই উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু তিনি নেপোলিয়নের একটি জীবনীও লিখতে গিয়েছিলেন কেন তা বোঝা যায় না। কোঁৎ নেপোলিয়নকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। এই যোদ্ধাটি ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শ নষ্ট করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্রাজ্যের। কৃষ্ণকমল বোধহয় নেপোলিয়ন সম্পর্কে কোঁৎ-এর মতামত আগে জানতেন না। সম্ভবত পরে জানতে পেরে জীবনীটি অসমাপ্ত রেখে দেন।)

কৃষ্ণকমল বাংলায় এই উপন্যাসটির নাম দিয়েছিলেন 'পৌল বর্জ্জীনী', মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। তখন বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়, বালক রবীন্দ্রনাথ গোগ্রাসে গিলতেন এই ধারাবাহিক রচনাটি। তাঁর উপভোগের কথা তিনি লিখেছেন আত্মজীবনীতে, 'অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌল বর্জ্জীনী গল্পের নামে বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর। সে কোন্ সমুদ্র সমীরকম্পিত নারিকেল বন। ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা। কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত। আর সেই মাথায় রঙীন রুমাল পরা বর্জ্জীনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল।'

অন্য একটি রচনাতেও তিনি আবার লিখেছেন, 'এখনো মনে আছে, ইস্কুল ফাঁকি দিয়া একটি দক্ষিণদ্বারী ঘরে সুদীর্ঘ নির্জন মধ্যাহ্নে অবোধবন্ধু হইতে পৌল বর্জ্জীনীটির বাংলা অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে প্রবল বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তখন কলিকাতার বহির্বর্তী প্রকৃতি আমার নিকট অপরিচিত ছিল— এবং পৌল বর্জ্জীনীতে সমুদ্রতটের অরণ্য দৃশ্য বর্ণনা আমার নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত এবং সেই তরঙ্গাঘাত ধ্বনিত বনচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল বর্জ্জীনীর মিলন এবং বিচ্ছেদ বেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মূর্চ্ছনা সহকারে অপূর্ব সংগীতের মতো বাজিয়া উঠিত।''

আর কোনো বিদেশি গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এমন উচ্ছ্বাসের কথা লেখেননি। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণকমলের অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের মনে এমনই ছাপ ফেলে দিয়েছিল যে, কোনো কোনো সমালোচকের মতে, রীবন্দ্রনাথের কিছু কিছু কৈশোরের রচনায়, যেমন 'কবি-কাহিনী' কিংবা 'ভগ্ন-হৃদয়'-এ এই কাহিনিটির প্রভাব রয়েছে।

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর দু-একজনের সঙ্গে কৃষ্ণকমল 'হিতবাদী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, সে পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প লেখার

হাতেখড়ি। নিজের অস্থিরতার জন্য অবশ্য কৃষ্ণকমল বেশিদিন সে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।

সাহিত্যের অঙ্গনে জাঁকিয়ে না বসলেও কৃষ্ণকমলকে সমস্ত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ সমীহ করতেন। একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং যে কোনো কুসংস্কার ও সামাজিক অধিকার বিষয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতে দ্বিধা নেই। তবে, এইসব মানুষ জনপ্রিয় হতে পারে না। তিনি বাঙালি জাতির নানা দুর্বলতা ও দোষের কথা তীব্র ভাষায় বলেছেন অনেকবার। পুরুষরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের ওপর কত নির্যাতন করে তাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। এবং তাঁর মতন প্রকাশ্য নাস্তিক ও ঈশ্বর বিযুক্ত লোককেও বেশিরভাগ মানুষই তখন পছন্দ করত না, এখনও করে না।

তাঁর কিছু কিছু খামখেয়ালিপনার কথাও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা জানতেন। একবার তিনি 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার জন্য চিঠিপত্রের আকারে একটি ছোটোগল্প লিখে দেন। গল্পটি প্রেসে কম্পোজ হয়ে যাবার পর হঠাৎ কৃষ্ণকমলের মনে হল সেটি ছাপা উচিত নয়। সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে তিনি একদিন প্রেসে গিয়ে সমস্ত টাইপ ঘেঁটেঘুঁটে এমনভাবে নষ্ট করে দিলেন যে গল্পটি আর পুনরুদ্ধার করা গেল না, পাণ্ডুলিপিরও খোঁজ নেই। ঘটনাটি জানতে পেরে পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এবং কৃষ্ণকমলের বিশেষ বন্ধু বিহারীলাল চক্রবর্তী এমনই চটে গিয়েছিলেন যে তাঁকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিলেন। (বিহারীলাল বেশ মারকুটে ছিলেন, একবার এক পুলিশের বুকে লাথি মেরে পালিয়েছিলেন) এই ঘটনার পর কৃষ্ণকমল আর একটাও ছোটোগল্প লেখেননি।

অধ্যাপক হিসেবে কৃষ্ণকমল যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন, শেষ জীবনে ছিলেন রিপন কলেজের (এখন সুরেন্দ্রনাথ) প্রিন্সিপাল। কিন্তু যৌবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি এমন একটি কাণ্ড করে বসেছিলেন, যা নিয়ে চতুর্দিকে, বিশেষত বিদ্বৎজন মহলে ঢিটিক্কার পড়ে যায়।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বহু বাধা অতিক্রম করে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়ে ছেড়েছেন। প্রথম প্রথম কয়েকটি বিধবা বিবাহের খরচও দিতেন তিনি নিজে। তারপর তিনি বহুবিবাহ রোধ করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন, তার সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষাবিস্তারের প্রসঙ্গ তো আছেই। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে নারীদের অবস্থার উন্নতি না হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। তার জন্য বাল্যবিবাহ আর বহুবিবাহের মতন হিন্দু সমাজের কু প্রথা আগে দূর করা দরকার। এবারের প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা আরও বেশি, এমনকি ইংরেজ সরকারও এগুতে সাহস পাচ্ছে না। সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কারে হাত দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ সিপাহি অসন্তোষের

অন্যতম কারণ হিসেবে বিধবা বিবাহ আইনের কথাও বলাবলি করা হয়েছিল।

কৃষ্ণকমল সব ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের সমর্থক। বিদ্যাসাগর যেমন বহু সংস্কৃত শাস্ত্র ঘেঁটে তাঁর মতের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে আনতেন, কৃষ্ণকমল তেমন বিদেশি সাহিত্যের উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। সতীদাহ প্রসঙ্গে একবার তিনি চমৎকার একটি প্রতি-তুলনা দিয়েই চলেন। সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ের সিন্ধুদেশ জয় করে সেখানে ইংরেজের শাসন প্রবর্তন করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে সে দেশে আর সতীদাহ কিংবা ক্রীতদাস প্রথা চলবে না। ইংরেজ রাজত্বে এসব বেআইনি হয়ে গেছে। তখন একদল বয়স্ক, চাঁইগোছের হিন্দু এসে বলেছিল, হুজুর, সতীদাহ উঠিয়ে দিলে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে যে! তা শুনে চার্লস গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বিধবাদের পুড়িয়ে মারা তোমাদের ধর্মসঙ্গত হতে পারে, কিন্তু আমারও একটা ধর্ম আছে। সেই অনুযায়ী ওই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকবে, তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে।

এই ঘটনার সঙ্গে কৃষ্ণকমল তুলনা করেছেন ভট্টিকাব্যের দুটি শ্লোকের। রাক্ষস মারীচ বলছেন, আমাদের ধর্মই এই যে দ্বিজ ও বেদযজীদের হত্যা করা। নগরকে প্রেতের আবাসভূমি করে তোলা। তা শুনে রামচন্দ্র বললেন, তোমাদের যদি ওটা ধর্ম হয়, তবে আমারও একটা ধর্ম আছে, যারা ওইসব কাজ করবে, তাদের নিধন করা।

বিদ্যাসাগর মশাই যখন বহুবিবাহ রোধ করার জন্য লেখালেখি করছেন, তখনই আচম্বিতে শোনা গেল, তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ, প্রায় পুত্রতুল্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে উদ্যত হয়েছে।

এ সংবাদে বিদ্যাসাগরের শুভার্থীরা একেবারে স্তম্ভিত। এত কাছের একজন মানুষই যদি এই কাণ্ড করে, তাহলে আন্দোলনের মূল্য কী থাকবে? বিরুদ্ধ-পক্ষীয়রা হাসাহাসি করবে না? যেভাবেই হোক কৃষ্ণকমলকে নিবৃত্ত করতেই হবে।

বিদ্যাসাগরের কানেও এ সংবাদ পৌঁছেছিল। কাছের মানুষদের কাছ থেকে এরকম আঘাত তিনি আরও পেয়েছেন। তাঁর নিজের ছেলে এবং এক ভাই তাঁকে কম দুঃখ দেয়নি। বীরসিংহ গ্রামের অধিবাসীরাও তাঁর অনুরোধ শোনেনি। কৃষ্ণকমলের আর মুখদর্শন করবেন না ঠিক করেছিলেন, তবু বন্ধুদের অনুরোধে তাঁকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বিষাদমাখা গলায় তিনি বললেন, আমার বন্ধুবান্ধব আমায় কী বলে জানিস? তুই আমার কথা শুনিস, চিরকাল তুই আমার বাধ্য, আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ করি, তাহলে তুই শুনবি আমার কথা?

কৃষ্ণকমলের তখন প্রেম বা কাম যার তাড়নাতেই হোক, মাথার ঠিক নেই। ওই তরুণীটিকে তিনি নিজের করে পেতে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া তাঁর স্বভাবটাও একরোখা। তিনি অম্লান বদনে গুরুকে উত্তর দিলেন, আপনি কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার

কথা না শুনতে পারি। আমি আপনার অবাধ্য!

আর একটিও কথা না বলে গম্ভীরভাবে চলে গেলেন বিদ্যাসাগর। হয়ে গেল দুজনের বিচ্ছেদ।

পরবর্তীকালে কৃষ্ণকমল তাঁর এই দুষ্কৃতির জন্য প্রচুর অনুতাপ করেছেন। তাঁর মতিভ্রম হয়েছিল। একজন অতিশিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী মানুষ হয়ে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণের জন্য আত্মহারা হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কৃষ্ণকমল বারবার স্বীকার করেছেন বিদ্যাসাগর তাঁকে বন্ধুর মতন, উপদেষ্টার মতন সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, তাতে কর্ণপাত না করার দোষ ও ভুল তাঁরই। ওই ঘটনার পর বিদ্যাসাগর তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন জেনেও বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ববৎ বজায় আছে।

সত্যিই কি তাই? যতই অপরাধের জন্য অনুতাপ হোক, একজন তাঁকে ঘৃণা করছেন জেনে কখনো কখনো মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতেই পারে। বিদ্যাসাগরের কীর্তি, আদর্শ, পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেও তাঁর দু-একটি দুর্বলতারও ইঙ্গিত করেছেন। তার মধ্যে একটি অভিযোগ বেশ গুরুতর।

কৃষ্ণকমল তাঁর একটি বই 'বিচিত্রবীর্য্য' পড়তে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে। কয়েক মাস বাদে বিদ্যাসাগর বইটি ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, পড়ার সময় পাননি। বিদ্যাসাগরের ব্যস্ততা খুবই স্বাভাবিক। নিজের কাজের জন্য এত শাস্ত্র ঘাঁটতে হত যে অন্য কিছু পড়তে পারতেন না হয়তো। কিংবা লেখাটি ভালো না লাগলে অনেকেই মন্তব্য এড়িয়ে গিয়ে অন্য অজুহাত দেন। তাতে একজন নবীন লেখকের রাগ বা অভিমান হওয়ারই কথা। কৃষ্ণকমলের রাগ হয়েছিল, নিজেই স্বীকার করেছেন। রাগ করে একটি কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। তখন ছাপেননি অবশ্য। তবে, একথা সত্যি বিদ্যাসাগর বাংলা বই বেশি পড়তেন না। সমসাময়িকতার বিচারে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যরুচিতে যে ঘাটতি ছিল, সে ইঙ্গিত কৃষ্ণকমল করেছেন বেশ কয়েকবার। তিনি পছন্দ করতেন ভারতচন্দ্রের কবিতা। ওখানেই থেমেছিলেন। মাইকেলকে নানাভাবে সাহায্য করলেও তাঁর কবিতায় যে বিদ্যাসাগর কখনও মুগ্ধ হননি, তা সবাই জানে। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে অকারণে খোঁচা মেরেছেন, বিদ্যাসাগর প্রকাশ্যে কখনো তার প্রতিবাদ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর চ্যালারা বঙ্কিমকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। হালিশহর পত্রিকায় বেরিয়েছিল এই পদ্য :

কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে
যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগ নাই
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।

আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস
'সাগরে' সাঁতার দিতে করেছে সাহস।...
ঈশ্বর চন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা
সেদিন শহরে আসি দিয়াছিল দেখা।...

বিদ্যাসাগরের স্বভাবের একটি দিক সম্পর্কে কৃষ্ণকমল বক্রোক্তি করলেও তার চরিত্রের দৃঢ়তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন বিদ্যাসাগরের বাল্যবন্ধু, দুজনের সংস্কৃত জ্ঞান প্রায় সমান সমান। মদনমোহন বাংলায় সাহিত্য রচনাও করেছেন। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' তাঁর বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তকের কবিতা। টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ হয়েও বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় নিজের মেয়েদের সেখানে ভর্তি করে দেন বলে সাহেবদের নজরে পড়েন। পারিতোষিক হিসেবে তিনি ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের চাকরি পান। শিক্ষকতা ছেড়ে ডেপুটিগিরি করতে গিয়ে তিনি সাহিত্য সাধনার জলাঞ্জলি দেন চিরতরে।

একসময় দুই বন্ধুর মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য মদনমোহনই অনেকটা দায়ী, কিন্তু সে তিক্ততার প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর নিজে কখনো প্রকাশ করেননি, কৃষ্ণকমলও নিশ্চুপ থেকেছেন। কিন্তু দুজনের তুলনা করে কৃষ্ণকমল বলেছেন, বিদ্যে-বুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুজনেই বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আশমান জমিন প্রভেদ। যাকে ব্যাকবোন বলে তা বিদ্যাসাগরের পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো মেরুদণ্ডী শ্রেণির মধ্যে পড়েন কিনা সন্দেহ।

বিদ্যাসাগরের এত প্রশংসার পরও তাঁর একটি দুর্বলতার কথা বারবার বলেছেন কৃষ্ণকমল। সেটি হচ্ছে বিদ্যাসাগরের সাহেব-সংসর্গ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, কর্মোদ্যম ও দৃঢ়তা দেখে সাহেবরা মুগ্ধ হয়েছিল, তাঁকে উচ্চপদ দিয়েছে এবং তাঁর মতামত গ্রাহ্য করেছে। সাহেবরা যাঁর প্রশংসা করে, আমাদের দেশের লোক তাঁকেই বড়ো বলে মেনে নেয়। এ দুর্বলতা সেকালেও যেমন ছিল, একালেও সে মনোভাবের কিছুই পরিবর্তন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া, রবিশঙ্করের বিটলসের গুরু হওয়া কিংবা অরুন্ধতী রায়ের বুকার প্রাইজ, এগুলির আগে বা পরের অবস্থা বিচার করলেই তা সম্যক অনুধাবন করা যাবে। শিশিরকুমার ভাদুড়ি সাহেবদের দেশে গিয়েও পাত্তা পাননি, তাই এ দেশেও তাঁর কদর কমতে শুরু করেছে।

বিদ্যাসাগর যে নিজের যোগ্যতাতেই সাহেবদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন তাতে কৃষ্ণকমলের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃষ্ণকমলের মতে, বিদ্যাসাগর আর কোনো বাঙালিকে সাহেবদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। He could not bear a brother near the throne. যদি আর কোনো বাঙালি তাঁর চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি পায় সাহেবদের কাছে, এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের 'আশঙ্কা' ছিল। সাহেবদের কিছুটা কাছাকাছি যাঁরা যেতেন,

তাঁদের বিদ্যাসাগর হেয় করার চেষ্টা করতেন। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন, ও লোকটা ইংরেজিতে একজন দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, কহিতে লিখিতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহবেদের কাছে বলে বেড়ায়, ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি কিছু আমার জানাশুনো থাকে তা সংস্কৃত শাস্ত্রে। ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন, বাপ রে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে।

কৃষ্ণকমল কোনো আসরে নিজের কানে শুনেছেন, বিদ্যাসাগর একজন সাহেবকে বলছেন, আমাদের দেশের অকর্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পসার করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।

বিদ্যাসাগরের এই ধরনের হিংসে বা ঈর্ষার মনোভাবের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকমল যোগ করেছেন, অনেক বড়ো মানুষদেরও এরকম দুর্বলতা থাকে। প্রতিভাবানরা সমকক্ষদেরও সহ্য করতে পারেন না।

বিদ্যাসাগরমশাই একটু তোতলা ছিলেন, ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না, অনেক সময় নিজের লেখা অন্যদের দিয়ে পাঠ করাতেন, এ তথ্যও কৃষ্ণকমলের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণকমলের এইসব মন্তব্য পত্রিকায় ছাপা হবার পর খুব প্রতিবাদ হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের প্রতি পুরনো আক্রোশ থেকেই কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর এইসব অপকথা বলছেন। এর উত্তরে কৃষ্ণকমল বলেছেন, চল্লিশ বছরে আগেকার একটা ঘটনার জন্য এখনো তাঁর মনে কোনোরকম আক্রোশ থাকতেই পারে না, তিনি ভুল করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁকে যা বলেছিলেন সেটাই ঠিক, নিজের দুর্বুদ্ধিতাবশত তিনি বিদ্যাসাগরের থেকে দূরেও সরে গেছেন, এখনো তিনি বিদ্যাসাগরের একান্ত ভক্ত এবং তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব ও ঔদার্য সর্বাঙ্গীন বলে স্বীকার করেন।

কিন্তু তিনি মূল অভিযোগটি প্রত্যাহার করেননি।

একরোখা, দুর্মুখ, বিশাল পণ্ডিত ও জ্ঞানী, বিশ্বসাহিত্য মন্থন করেও দূরে থেকেছেন বাংলার সাহিত্যসংসার থেকে। বেঁচেছেন অনেকদিন। ছিয়াশি-সাতাশি বছর বয়েসে একলা ঠুকঠুক করে হেঁটে গিয়ে বিডন পার্কের একটা বেঞ্চে বসে থাকেন। পরিচিত আত্মীয়স্বজন, যৌবনের সঙ্গীরা প্রায় কেউ বেঁচে নেই। বন্ধুহীন, নিঃসঙ্গ। নাস্তিকরা এমনিতেই নিঃসঙ্গ, পরিণত বয়সে সে নিঃসঙ্গতা আরও বাড়ে। কল্পনায় কারুর সঙ্গ পাবার জন্যই মানুষ সংকটের সময় ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে গিয়ে হত্যে দেয়, মা, মা করে কাঁদে, কিংবা বলে, ঠাকুর একবার আমার দিকে চোখ তুলে চাও। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বর আরাধনারও মূল কথা সেই কল্পনায় কারুর সঙ্গ পাবার বাসনা। নাস্তিকদের সে উপায় নেই, সব সংকটে তাদের একাকী মুখোমুখি হতে হয়।

বিপিনবিহারী গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক সেই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের পাশে বসে আস্তে আস্তে আলাপ জমিয়ে নেন। তারপর তাঁর কাছে পুরনো আমলের কথা শুনতে চান। কৃষ্ণকমল যা মনে এসেছে বলে গেছেন এলোমেলো ভাবে, বোঝা যায় তাঁর স্মৃতিশক্তি তখনো সাংঘাতিক। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যাচ্ছেন অনবরত। সেই আলাপচারিতা লিখিত ও মুদ্রিত হয়ে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আলাপের সূত্রপাতে বিপিনবিহারী বলেছিলেন, 'সুপ্রভাত' নামে একটি পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি পুরনো চিঠি ছাপা হয়েছে, রাজনারায়ণ বসুকে একটা চিঠিতে দ্বিজেন ঠাকুর আপনার সম্পর্কে লিখছেন, 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক— he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.

তা শুনে সম্ভবত মুচকি হেসেছিলেন কৃষ্ণকমল।

বঙ্কিমচন্দ্র

একা কোথাও বেড়াতে গেলে, ট্রেনযাত্রার সময় সঙ্গে কোনো বই না-থাকলে আমার কিছুতেই চলে না। সাধারণত প্ল্যাটফর্মের দোকান থেকেই দু-একটা বই কিনে নেওয়া আমার অভ্যেস। ইদানিং সেইভাবে বই কিনে বার-বার ঠকছিলাম। আজকাল বিদেশি পত্র-পত্রিকা খুব কম আসে, নতুন লেখকদের বইয়ের সমালোচনা পড়ে আগে থেকে কোনো মতামত তৈরি করে নিতে পারি না। যেহেতু পুরনো এবং চেনা লেখকদের বই শেষ হয়ে গেছে তাই নতুন লেখকদের বই বাছতে হলে মলাটের চাকচিক্য এবং পেছনের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হয়। পর-পর সে-রকম কয়েকজনের বই কিনে দেখেছি প্রত্যেকটিই অখাদ্য।

কিছুদিন আগে বার্নপুর যেতে হয়েছিল একটা কাজে। ট্রেনে একা যেতে হবে। কী বই সঙ্গে নিই? কলকাতা ছাড়ার আগে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে একখণ্ড 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী' দেখে সেটাই কেড়ে নিলাম। এই খণ্ডটিতে বঙ্কিমের সব-ক'টি উপন্যাস রয়েছে। আমার বাড়িতে 'বঙ্কিম রচনাবলী'র যে একটিমাত্র খণ্ড আছে, তাতে রয়েছে শুধু কিছু প্রবন্ধ, 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র'। সেগুলি মাঝে-মাঝে পড়েছি বটে, কিন্তু সে-দিন প্রথম অনুভব করলাম বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আমি বহুদিন চর্মচক্ষে দেখিনি। সুতরাং এই এক চমৎকার সুযোগ।

অনেকের ধারণা, ট্রেনযাত্রার সময় বুঝি লঘুপাঠ্য বই-ই সঙ্গে রাখতে হয়। আমার জীবনে সে-রকম কোনো নিয়ম নেই। আমি ট্রেনে কবিতার বই, প্রবন্ধের বই, গোয়েন্দা কাহিনী— সমান আগ্রহ নিয়েই পড়ি। ওভিডের 'মেটামরফোসিস', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', স্টেইনবেকের 'ইস্ট অব ইডেন' ইত্যাদি বই আমি ট্রেনে বা বিমানে শেষ করেছি, মনে আছে।

দৈবাৎ বন্ধুর হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ওই-খণ্ডটি পাওয়া একটি আকস্মিক ঘটনা। সে-দিন

ওই-বইটি হাতে না-পেলে হয়তো আরও বহুদিন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আমার পড়াই হত না। শব্দ করে কে আর ওই-সব পড়ে। কিন্তু এই কাকতালীয় যোগাযোগের ফলেই আমার জীবনে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। আমার মানবিক জগতে রীতিমতন একটা আলোড়ন এবং পরিবর্তন দেখা দিল বলা যায়। পাঠকদের কাছে আমি আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই।

আমার পাঠক-জীবন মোটামুটি পঁচিশ বৎসরের। বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কিছু না-জানলেও, বাংলা সাহিত্য আমার বেশ ভালোই পড়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমার অপরিচিত লেখক নন। খুব ধারাবাহিকভাবে না-হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনাই আমি প্রথম যৌবনে একবার দু-বার পড়ে ফেলেছিলাম, প্রবন্ধগুলি পড়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার আমি যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম।

আরও অনেকের মতন আমিও বাঙালি; সাহিত্যের কয়েকটি গুজবে বিশ্বাসী। গুজবগুলিকে হঠাৎ গুজব হিসেবে চিনতে পারলে নিজেকে কীরকম অসহায় মনে হয়, সেইরকমই বাংলায় সুদীর্ঘকালের গুজব এই যে ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম এখনো মহত্তম। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যতই ভালো লিখে থাকুন, খাঁটি ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম এখনও আদর্শস্বরূপ। এবং তিনি যুগস্রষ্টা ও ঋষি। তাহলে আমি এগুলো কী পড়লাম?

বার্নপুর যাত্রার পর থেকে আরো একমাসের মধ্যে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সব-ক'টি উপন্যাস পড়ে শেষ করেছি। শুরু করেছি একেবারে প্রথম উপন্যাস থেকে, তারপর পাতার পর পাতা নিঃশেষ করেছি অধীর আগ্রহে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এত খারাপ? এ কি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?

এ জন্য দারুণ মনোকষ্ট পেয়েছি আমি। হায়, যৌবনের কত স্বপ্ন কত উচ্চ আদর্শ ছিল বঙ্কিমকে ঘিরে। সেগুলি সব ভুল? স্কুল-কলেজে, বিভিন্ন প্রবন্ধ-পুস্তকে আমাদের এইভাবে প্রতারণা করা হয়েছে? এই উপলব্ধি বড়ো মর্মান্তিক। এর চেয়ে, এই গ্রন্থটি আমার না-পড়াই ভালো ছিল। স্বপ্নভাঙার চেয়ে ভুল-স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা হয়তো মধুর।

ঋষি বঙ্কিম বা স্বদেশচেতনার উদগাতা হিসেবে বঙ্কিমের যে-চিত্র, তার প্রচার হতে শুরু হয়েছে তাঁর মৃত্যুর দশ-বারো বছর পর থেকে। এ-কথা বলেছেন তাঁর সমসাময়িক একাধিক ব্যক্তি, জীবিতকালে বঙ্কিম পরিচিত ছিলেন প্রধানত ঔপন্যাসিক এবং সুসম্পাদক হিসেবে; পরবর্তীকালে আমরা তাঁকে একমাত্র ঋষি বঙ্কিম বলেই সম্বোধন করতে শিখেছি এবং তাঁর রচনার সব-কিছুতেই মহত্ত্ব আরোপ করেছি। উপন্যাসের বিচার যে তার শিল্পরূপের বিচার— সে-কথা ভুলে গেছি। এটা আমাদের বাঙালি ন্যাকামো ছাড়া আর কিছুই না। ঔপন্যাসিক হিসেবে বিচার করতে গেলে, বঙ্কিমকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

সাহিত্যের বিচার করতে গেলে, দুটি দিক দেখা দরকার। সাহিত্য যেহেতু ভাষাশিল্প, তাই ভাষার ব্যবহারে কতখানি সৌন্দর্য ফুটেছে সেটাই প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত। আর-একটি দিক আছে, বক্তব্য বা কাহিনী নির্মাণে মানবজীবনের কতখানি সত্য ফুটে উঠেছে, তার বিচার। বাংলাভাষায় বঙ্কিম নিঃসন্দেহে প্রথম বড় ঔপন্যাসিক, সুষ্ঠু এবং সুললিত গদ্য রচনায় যে তিনি প্রথম একটি বড়ো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, সে-কথাও অবশ্যস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই বলেছেন উপন্যাস আর ইতিহাস এক নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কালের সীমানা পেরিয়েও রসোত্তীর্ণ থাকতে পেরেছে কিনা— সেটা বিচার করে দেখা নিশ্চিত দোষের নয়।

বঙ্কিমের উপন্যাস ভাষা-প্রধান নয়, কাহিনী-প্রধান। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মাঝে-মাঝে প্রকৃতি বা নারীর রূপ বর্ণনায় তিনি একাধিক পরিচ্ছেদ ব্যয় করলেও দ্রুতগতির একটি নাটকীয় কাহিনী বর্ণনার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। কোনো ঔপন্যাসিকের যেমন আগাগোড়াই ভাষাকে নিখুঁত এবং সৌন্দর্যময় করার দিকে লক্ষ্য থাকে (যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ফ্লবেয়ার)— বঙ্কিম সেই ধরনের লেখক নন, বরং চার্লস ডিকেন্স বা শরৎচন্দ্রের মতন কাহিনীর বিন্যাসের দিকেই তাঁর প্রধান আগ্রহ। এই কাহিনীগুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়। কয়েকটিতে তিনি স্পষ্টভাবে একটা আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছেন, কয়েকটি নিতান্তই মনোরঞ্জনী উপন্যাস। তাঁর সব-কটি উপন্যাস পড়ে আমার এই গভীর দুঃখের উপলব্ধি হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি উপন্যাসেও আমাকে তৃপ্ত করতে পারলেন না। তার প্রত্যেকটি কাহিনী কৃত্রিম এবং উদ্ভট— যেন মানসচক্ষে তিনি হিন্দি সিনেমা নামক একটা জিনিসের কথা জানতে পেরে তারই কাহিনী বানিয়েছেন। তিনি যে-আদর্শের কথা প্রচার করেছেন তার প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত—এবং তার একটিও পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি। হলেই বরং দেশের আরো বিপদ ঘটত। তাঁর অন্তত দুটি উপন্যাস আমাদের দেশ ও সমাজের অনেকখানি ক্ষতি করে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জানি, সকলে আমার সঙ্গে একমত হবেন না। আমি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আরও কয়েকটি সংখ্যা ধরে লিখব। অনুগ্রহ করে সেগুলি ধৈর্য ধরে পড়ে তারপর আমার বিচার করবেন।

।।১।।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতার বই বেরয় তাঁর আঠারো বছর বয়সে। এর আগে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা রচনা করে কুড়ি টাকার এক পুরস্কার পান। এবং সে-কবিতাটি স্ত্রীলোক বিষয়ক। সচরাচর পনেরো বছরের ছেলের এ-রকম

কবিপ্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কিশোর বয়স থেকেই তাঁর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল।

মাঝখানে কিছুদিন পড়াশোনা ও চাকরিবাকরির কারণে তিনি লেখাটেখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। সাত-আট বছর তার কোনো সাহিত্য-রচনার চিহ্ন নেই। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে, চাকুরিজীবনে খানিকটা স্থিত হয়ে তিনি ইংরেজিতে শুরু করলেন একটি উপন্যাস। এটা লিখতে-লিখতে হঠাৎ একসময় মত বদল করে ফেললেন, ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় নতুন উপন্যাস রচনার কথা চিন্তা করলেন এবং অবিলম্বে শুরুও করে দিলেন। বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্ত-বদল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাইকেলের ভাষা-বদলের তুলনায় বঙ্কিমের এই ভাষা-বদল, আমার মতে, আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম বাংলা উপন্যাসটি বঙ্কিম লিখেছিলেন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে। এই বয়সে একটি গ্রন্থ লিখে সারা দেশে আলোড়ন তোলা কম কৃতিত্বের কথা নয়। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা খুব বেশি নেই। এখনকার কোনো পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে পারবে এ-রকম কোনো কাণ্ড ঘটাতে? তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বাল্য-বিবাহের যুগে পুরুষমানুষেরও জীবন শুরু হত অনেক তাড়াতাড়ি। অল্পবয়স থেকেই দায়িত্ব নিতে হত, বুদ্ধিরও বিকাশ হত দ্রুত। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হয়েছিলেন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। এখন ওই-বয়সী কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কথা চিন্তা করা যায়? এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে পর্যন্ত একজন পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছরের বাঙালি ভদ্রলোক বলতে বোঝাত এমন ধীরস্থির সামাজিক মানুষ, যার মতামতের পাঁচজন মূল্য দেয়। কয়েকটি সন্তানের পিতা এবং দায়িত্ববান নাগরিক। এখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকেও গায়ে চক্রাবক্রা জামা পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খায়, পার্কে প্রেম করে। এখন যৌবনের বয়স অন্তত দশ-পনেরো বছর বেড়ে গেছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সময় বাঙালি পাঠকদের মধ্যে যে কী বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল, তা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্যেও আমরা তা জানতে পেরেছি। এর আগে গদ্যে লেখা একটি রুচিশীল তৃপ্তিকর দীর্ঘকাহিনীর তো অস্তিত্বই ছিল না। বিলিতি উপন্যাস তখন সদ্য এ-দেশে আসতে শুরু করেছে। বাংলাভাষাতেও যে এ-জিনিস লেখা সম্ভব, বঙ্কিমের আগে কোনো পাঠকও বোধহয় তা কল্পনা করেননি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবের তারিখটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নিশ্চিত লেখা থাকবে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীটি অবশ্য নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। অনেকটা রূপকথার ধরনে, ভাবালুতার ভাগ খুব বেশি, চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস খুবই কৃত্রিম। এই একধরনের কাহিনী,

যার টানা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে, কিন্তু তার বেশি আর-কিছু থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটি ছাপার আগে কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাষার ব্যাকরণের কোনো দোষ আছে কিনা? পণ্ডিতরা বলেছিলেন, গল্প ও ভাষার বর্ণনাশক্তিতে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে অন্য কোনোদিকে মনই দিতে পারিনি।

স্কটের 'আইভান হো'র সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীর মিল কতখানি, সে-প্রসঙ্গ এখন অবান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ওই-বই লেখার আগে তিনি স্কট পড়েননি। তাঁর সমসাময়িক কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, 'আমি তাঁহার অনেষ্টি আন্‌ইম্‌পিচেবল্‌ বলিয়া বিশ্বাস করি।' আমরাও সেই বিশ্বাস করি।

তবে, প্রথম উপন্যাস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি দুর্বলতা একেবারে দারুণভাবে আঁকড়ে ধরলেন। বঙ্কিম ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য হলেও, মনে হয়, শেক্‌সপিয়রের কাছ থেকে তিনি বাইরের ঘটনাবিন্যাস ছাড়া শিক্ষণীয় আর-কিছু পাননি। তাঁর প্রিয় ছিল লেখক, কবিকুল ও রোমান্স লেখকগণ, হৃদয়-রহস্য বলতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় সব-কটি উপন্যাসেই দুটি নায়িকা। এদের মধ্যে একজন অতি কোমল, অতি পবিত্র একেবারে কুসুমপেলব যাকে বলে, এদের কাজ মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। আর-একটি মেয়ে বেশ তেজস্বিনী, যাকে বলে দস্যি মেয়ে, এর কাজ রাতদুপুরে পুরুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানো। বঙ্কিম যে-যুগের কথা লিখেছেন, সেই যুগের মেয়েরা সন্ধের পর রাস্তায় বেরোত কিনা সন্দেহ— কিন্তু বঙ্কিমের এইসব নায়িকারা মধ্যরাতে রাস্তায় বেরুবেই, তা-ও একা, এবং মাঝে-মাঝেই পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে কী করে যে অবলীলাক্রমে এরা অন্যের চোখে ধুলো দিয়েছে, তাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বাতিক বা মুদ্রাদোষটা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারেননি। কোনো বড় লেখকের এরকম ধারাবাহিক মুদ্রাদোষের উদাহরণ চোখে পড়ে না।

'দুর্গেশনন্দিনী' নাম দেখে বুঝতে হয় যে এই উপন্যাসের নায়িকা তিলোত্তমা। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে তাকে মাত্র তিন-চারবার দেখা গেছে। একবার মন্দিরের অন্ধকারে। এরপর দু-বার সে জগৎ সিংহের মুখোমুখি হয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। তারপর তাকে দেখা গেল গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়, রাজকুমারের সঙ্গে শেষকালে বিয়ে হওয়ায় তার রোগ সারল। গোটা উপন্যাসে তিলোত্তমার মুখে এমন একটাও উক্তি নেই, যা মনে দাগ কাটে। এই তুলনায় বিমলা চরিত্রটি জুড়ে আছে উপন্যাসের সিংহভাগ, সে কতরকমের অ্যাডভেঞ্চার, শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি পর্যন্ত করেছে। সে প্রথমে ছিল দাসী, পরে নায়িকার সৎমা, শেষে পাগল।

এক হিসেবে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস থেকে আলাদা। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে আর-একটি দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা তিনি অবিলম্বেই

সংবরণ করে নেন। এই উপন্যাসেও যবন সম্পর্কে কিছু-কিছু বক্রোক্তি থাকলেও তিনি ওসমান ও আয়েষা চরিত্র দুটিকে যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে মহৎ ও মহিয়সী করে তুলেছেন। পরে আর কোথাও, বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনো মুসলমান চরিত্রের প্রতি সামান্য মায়া-দয়াও দেখাননি।

চরিত্রচিত্রণে তিনি সব সময়েই সাদা ও কালো এই দুটি রং ছাড়া আর কোনো রং ব্যবহার করতেন না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গ এলেই তিনি হয়ে উঠতেন ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। কোনো-কোনো প্রবন্ধে বাংলার সাধারণ দরিদ্র চাষীদের প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসমলান চাষীকে সমান মূল্য দিয়েছেন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু উপন্যাসে কোথাও রেয়াত করেননি। তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষ তাঁর নারী-বিদ্বেষের চেয়েও উগ্র। সাহিত্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করায় তিনি বাঙালি হিন্দু লেখকদের মধ্যে প্রথম এবং অদ্বিতীয়।

।।২।।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি সম্পর্কে অনেকেরই বেশ দুর্বলতা আছে। আমারও ছিল। বাল্যকালে পাঠক হিসেবে আমিও কপালকুণ্ডলার প্রেমে পতিত হয়েছিলাম। প্রথম দর্শনে বড় অপরূপ, রহস্যময়ী এই বালিকা। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যর্থ বই।

চাকরিতে ঢুকে বঙ্কিম বিভিন্ন জেলায় স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন। প্রথমে যশোর, তারপর কাঁথি। মেদিনীপুরে এসে খুব সম্ভবত তিনি প্রথম সমুদ্র দর্শন করলেন। প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই চমকপ্রদ; তাঁর কবিহৃদয় নিশ্চিত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, সমুদ্র, বালিয়াড়ি, অরণ্য এই পটভূমিকায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি রচনা করার কথা চিন্তা করছিলেন কিছুদিন ধরে। একজন সন্ন্যাসী এইসময় প্রায়ই রাত্তিরবেলা এসে তাকে জ্বালাতন করতেন। সেই চরিত্রটিও মাথায় গেঁথে যায়।

মাঝখানে একটা ছুটিতে বঙ্কিম বাড়িতে এসেছেন। আড্ডা দিতে বন্ধুবান্ধবরাও আসেন মাঝে মাঝে। একদিন দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরেক ভাইয়ের সঙ্গে খোশগল্প হচ্ছে, এরই মধ্যে বঙ্কিম হঠাৎ দীনবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মনে করো, সমুদ্রের ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক কাপালিক একটা মেয়েকে মানুষ করছে বাচ্চা বয়েস থেকে। মেয়েটার যখন ষোলো বছর বয়েস তখন পর্যন্ত সে কাপালিক ছাড়া আর কোনো মানুষ দেখেনি। সমাজের কিছুই জানে না। পরে যদি কেউ সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে সমাজ সংসারে নিয়ে আসে, তা হলে কি মেয়েটি মানিয়ে নিতে পারবে? কাপালিকের প্রভাব কি চলে যাবে?

একথা শুনে দীনবন্ধু কী উত্তর দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় তার কোনো রেকর্ড নেই।

পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন, দীনবন্ধু নাকি নীরব ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস হয় না। দীনবন্ধু যে-রকম সুরসিক ও ঠোঁটকাটা ছিলেন, তাতে এই অবস্থায় একেবারে চুপ করে থাকবেন বলে মনে হয় না। প্রশ্নটাও এমন কিছু জটিল নয়, প্রত্যেকেরই এক এক রকম মতামত থাকতেই পারে।

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র জিনিসটাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেন। স্বভাবসুলভ ভাবে তিনি বললেন, কী আর হবে! প্রথমে কিছুদিন সন্ন্যাসীর কথা খুব মনে থাকবে। তারপর বাচ্চাকাচ্চা হলে, স্বামীর সঙ্গে ভাবসাব হলে গিন্নিবান্নি হয়ে পড়বে—সন্ন্যাসীর কথা একেবারে ভুলেই যাবে!

বোঝাই যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্রের ফ্রয়েড-প্রীতি ছিল না!

বঙ্কিম কিন্তু কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে লেখেননি। উপন্যাসে মূল প্রশ্ন এই নয় যে মেয়েটি কাপালিককে ভুলতে পারবে কি না! তার চেয়েও বড় প্রশ্ন কাপালিক ওই মেয়েটিকে ভুলতে পারবে কি না!

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমের অস্থিরচিত্ততার নমুনা পদে পদে। তিনি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। মনে হয় যেন তিনি এই মেয়েটিকে ভয় পাচ্ছেন, ক্রমশই এর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এই উপন্যাসে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ (আগে আর একটি বেশি ছিল, কোনো কারণে বঙ্কিম সেটি বাদ দিয়েছেন)— এর মধ্যে মাত্র দশ-এগারোটি পরিচ্ছেদে আমরা কপালকুণ্ডলাকে দেখতে পাই। আর দু-তিনটি পরিচ্ছেদে তার নাম উল্লেখ আছে মাত্র। উপন্যাসটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে মতিবিবি, যার চরিত্র কপালকুণ্ডলার চেয়েও অবাস্তব! গোটা বইটা জুড়ে সে যে কত রোমহর্ষক কাণ্ড করেছে তার আর ঠিক নেই! ঔপন্যাসিক জীবনের শুরু থেকেই বঙ্কিম এই ফর্মুলা নিয়ে নিয়েছেন যে একটি সরল নিষ্পাপ মেয়ে থাকলেও আর একটি ডানপিটে, মুখরা, ছদ্মবেশ ধারণে পটীয়সী মেয়ে দেখাতেই হবে। অধিকাংশ উপন্যাসে লেখক এই দ্বিতীয় মেয়েটিকে নিয়েই মেতে উঠেছেন বেশি, পৃষ্ঠাসংখ্যা সেই বেশি পেয়েছে—যদিও শেষ পর্যন্ত সে এলেবেলে হয়ে যায় কিংবা পাগল হয় কিংবা হঠাৎ মরে। কিছুই সে পায় না।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের আরম্ভ অপূর্ব সুন্দর। তীর্থযাত্রীতে বোঝাই একটি নৌকোর পথ হারানো কিংবা সমুদ্রে কুয়াশার বর্ণনায় বঙ্কিমের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমারের চরিত্রটিও প্রথম দর্শনে বেশ মনোহর, তীর্থ-দশনের চেয়ে প্রকৃতি-দর্শনে তার বেশি আনন্দ এবং ভদ্রলোকের মতন পরোপকারী। নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি বাঁধিয়ে রাখার মতন। নায়ক-নায়িকার উদ্বোধনী-সংলাপ, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"— এর তুলনা পাওয়া ভার, সামান্য অতি-নাটকীয়তা সত্ত্বেও কবিত্বের সৌরভময়। গোটা উপন্যাসে এর চেয়ে ভালো অংশ আর নেই—

আদৌ আর কোনো অংশ ভালো নেই।

কাপালিকটিকে প্রথম থেকেই যাত্রাদলের কাপালিক বলে মনে হয়, যে অকারণে সংস্কৃতে কথা বলে। এবং বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মতনই তার ক্রিয়াকলাপ একটু বেশি রকমের ভয়াবহ, যাই হোক সেটাও আমরা ভুলতে পারি কপালকুণ্ডলাকে দেখে। সমুদ্রের ধারে বসে আছে নবকুমার, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সামনে অনবরত ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে। এই অবিরাম ঢেউ পতনের দৃশ্যে সময় যেন থেমে থাকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নবকুমার দেখল এক অপূর্ব নারীমূর্তি। রাশি রাশি কালো চুলে ঢাকা যার দেহ, যার দৃষ্টি স্থির অথচ সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর জ্যোৎস্নার খেলার মতন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল।

বর্ণনা দেখে মনে হয়, প্রথমে কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিম প্রকৃতই একটি অরণ্য-বালিকা হিসেবে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। পুরুষ দেখে যার লজ্জার উন্মেষ পর্যন্ত হয়নি যতদূর মনে হয়। কপালকুণ্ডলার পরনে কোনো পোশাক নেই। এই ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে অনেকবার। কিন্তু বর্ণনা আছে, কপালকুণ্ডলার রাশীকৃত চুলে তার শরীরের কতখানি অংশ ঢাকা পড়েছে। পোশাকের কথা নেই। কাপালিকের প্রসঙ্গে আছে, তার কোমরে একখণ্ড 'শার্দুল-চর্ম' আটকানো— কপালকুণ্ডলার বর্ণনায় সেকথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, একটি আলাদা বাক্যে, 'রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ'! জঙ্গলের মধ্যে একটি মেয়ে গয়না-গাঁটি পরবে, আমরা আশাও করিনি। বনের মেয়ের পক্ষে ফুল-টুলের গয়না পরাও খুব স্বাভাবিক নয়— বিশেষ গয়না সম্পর্কে যার কোনো রকম ধারণা থাকারও কথা নয়। এবং 'একেবারে' শব্দটি এবং আলাদা বাক্য লক্ষণীয়।

অবশ্য একটু পরেই বঙ্কিম তাঁর মত পাল্টে ফেললেন। কপালকুণ্ডলাকে আর অতটা অরণ্য-বালিকা রাখতে চাইলেন না। দুই পরিচ্ছেদ পরেই আমরা জানতে পারলাম যে সে প্রায়ই অধিকারী বলে একজন লোকের কাছে আসত। এমনকী সে রাতদুপুরে এলেও অধিকারী অবাক হয় না। তা হলে কপালকুণ্ডলা নিশ্চিত শাড়ি পরে, ভাত খায় এবং বাইরে লোকদের চেনে। কাপালিক সম্পর্কেও আমরা আগেই এরকম সন্দেহ করেছিলাম, তাকে 'আসব' পান করতে দেখে। নিশ্চয়ই তাকেও শহরে আসতে হয় মদ কেনার জন্য।

কপালকুণ্ডলার প্রথম দেখা রূপটা বঙ্কিমচন্দ্র পরে বারবার কটুভাবে ভেঙে দিয়েছেন। চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছবার জন্য তাঁকে খুবই দুর্বলভাবে একটা চিঠির আশ্রয় নিতে হয়েছে বলে, বঙ্কিম হঠাৎ শেষের দিকে তাড়াহুড়ো করে বলে দিয়েছেন যে কপালকুণ্ডলা অধিকারীর কাছে লেখাপড়াও শিখেছিল। হায়! কোথায় সেই অরণ্য-বালিকা! যে চুপচাপ বসে থাকা একজন লোককে জিজ্ঞেস করেছিল, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? বঙ্কিম একে সহ্য করতে পারলেন না, হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলেন।

মতিবিবির যাবতীয় মতিগতি এবং কার্যকলাপ এতই বিরক্তিকর যে সে-সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। তবে, এই প্রসঙ্গে আবার সেই কথাটি বলা যায়। বঙ্কিম রাত-দুপুরে রাস্তায় মেয়েদের বার করতে বড় ভালোবাসতেন। এ ব্যাপারে তাঁর অসম্ভব দুর্বলতা ছিল। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা রাত্তিরবেলা ঘোরাঘুরি করেছে। কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী এবং মৃন্ময়ী ওরফে কপালকুণ্ডলা দু'জনেই রাত্তিরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে পর্যন্ত গেছে। মৃণালিনী উপন্যাসে সব ক'টি মেয়েই রাত্তিরে ছাড়া যাতায়াত করে না। এর মধ্যে মনোরমা আবার ঘোর রাতে রাস্তার ধারে পুকুর-পাড়ে বসে হাওয়া খায়। বিষবৃক্ষে হীরা, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী— সবাই গভীর রাতে একা একা পথ দিয়ে যায় (কপালকুণ্ডলায় যেমন এক মেয়ে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরেছিল, এ উপন্যাসে আবার একটি পুরুষ মেয়ের ছদ্মবেশ ধরেছে)। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী তো বটেই নবাবপত্নী দলনী পর্যন্ত মধ্যরাতে পুরুষ সঙ্গী ছাড়া রাস্তায় ঘোরে। এই রকম পর-পর উপন্যাস ধরে দেখানো যায়— কী ঐতিহাসিক কী সামাজিক পটভূমিকায় বঙ্কিমের নায়িকারা রাতের অন্ধকারে অবলীলাক্রমে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে খুব ভালোবাসে।

আসলে, বঙ্কিম যখন লিখছেন, তখন পর্যন্ত ভারতে ছিল ঘোরতর পর্দাপ্রথা। কী হিন্দু, কী মুসলমান পরিবারের মেয়েদের বাইরে বাইরে বেরুনো প্রায় একরকম নিষিদ্ধই ছিল। ক্বচিৎ ভ্রমণকালে খুব ভালোরকমের ঘেরা-টোপের ব্যবস্থা থাকত। সুতরাং রাস্তায় যে-কোনো সময় একা কোনো মেয়েকে দেখতে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। অথচ নায়ক-নায়িকার মাঝে মাঝে দেখাশুনো না হলে উপন্যাস জমে না। কাহিনীকে অতিনাটকীয় করার জন্য মেয়েদের মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পালানোও দরকার। সেইজন্যই বঙ্কিমকে দিনের আলোর বদলে রাত্রির আশ্রয় নিতে হয়েছে। ঠিক যে-রকম আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ রোমান্স লেখকদের রচনায় দেখি। উপন্যাস জিনিসটার কাঠামোর মতনই, রাতের ভ্রাম্যমাণা নারীরাও বিদেশ থেকেই এসেছে।

অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় কপালকুণ্ডলাতে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই একমাত্র উপন্যাস, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সন্ন্যাসীকে দেখিয়েছেন— যে লোকটা আসলে খুব খারাপ। কাপালিকটির এত খারাপ হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে একেবারে নরপিশাচ করে তোলা হয়েছে, যে নকুমারকে মদ খাইয়ে পত্নী-হত্যার প্ররোচনা দেয়। বঙ্কিমের আর কোনো উপন্যাসে এরকম চরিত্র নেই। এরপর বহু উপন্যাসে বহু সাধু সন্ন্যাসীর ছড়াছড়ি আছে। এক এক সময় তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অকারণ। সেইসব সাধুদের কাজ শুধু গালভরা উপদেশ দেওয়া— এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উপদেশগুলি ভুল এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও ভুল। মনে রাখতে হবে, সেই

সময় বঙ্কিমের চেয়ে বেশি শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে পলগ্রেভ সাহেবের গোল্ডেন ট্রেজারি নামক কাব্য সংকলনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বঙ্কিম ছিলেন তাঁর সময়ের পক্ষেও অনাধুনিক। এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

কপালকুণ্ডলা রচনার আগে তরুণ বঙ্কিম একটি সাধুর দ্বারা ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গুরুবাদে তাঁর বিশ্বাসও দৃঢ় হয়। পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতেও এই ছাপ পড়েছে এবং তার ফল খুব সুখের হয়নি।

।।৩।।

আমি বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলাম, তার মাত্র দুটি কিস্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরই সমাজে তুমুল শোরগোল ওঠে, অসংখ্য পত্রদাতা অভিশাপ বর্ষণ করেন আমার উদ্দেশে, পত্রিকাটির প্রতিও রাশি-রাশি কটূক্তি ছুটে আসে জ্বলন্ত গোলার আকারে। পত্রিকাটির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও একেবারেই পছন্দ করেন না আমার মতামত। আমি বঙ্কিমের ভাবমূর্তিকে কলঙ্ক লেপন করছি, এমন অভিযোগ আসে। সুতরাং আমার রচনাটির প্রকাশ মধ্যপথে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাটিতে আমি প্রভূত কৌতুক ও কিছু বিস্ময় বোধ করেছিলাম। ক্লাসিক রচনাবলী তো বার-বার নতুনকালের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাচাই করা হয়, তাতে ক্লাসিকগুলির কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, এ-কালের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। আমার মতন সামান্য ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করতে চাইলেও আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের বদ্ধমূল বঙ্কিম-প্রীতি দূর করবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, সে-রকম কোনো আলটপকা ধন্ধও আমার ছিল না। আমি কোনো অন্যায় বা ভুল অভিযোগ করলেও যে-কোনো কৃতবিদ্য ব্যক্তিই তো তার সংশোধনী রচনা করতে পারেন। পরমত-সহিষ্ণুতা বোধহয় মানুষের ঠিক স্বভাবধর্ম নয়, ওটা নিছক কথার কথা।

আমাদের দেশে সাহিত্য আলোচনায় যে একটা দাঁতে দাঁত চেপে অতি সিরিয়াস ভঙ্গি থাকে, সেটি আমার পছন্দ না। সাহিত্যচরিত্র উন্নয়নের মাধ্যম কিংবা সাহিত্যিকরা জ্যাঠামশাইদের মতন শ্রদ্ধেয়, এমনও আমি মনে করি না। সাহিত্য আনন্দের সামগ্রী, যেমন সঙ্গীত বা চিত্রকলা। সুতরাং খোলামেলা হাসিখুশিভাবে একে গ্রহণ করাই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। যাইহোক, পত্রিকায় আমার বঙ্কিম-বিষয়ক রচনা অসমাপ্ত থেকে যাওয়ার জন্য আমি সংকল্প নিয়েছিলাম পরে বঙ্কিম-বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করব। ক্রমে মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়, সংকল্পের মধ্যে

এসে যায় শিথিল অন্যমনস্কতা এবং আরো অনেক-কিছুর মতন এই কাজটিও দূর ভবিষ্যতের জন্য বরাদ্দ দিয়ে রাখি। কিন্তু যেহেতু মানুষের আয়ু পদ্মপত্রে নীরবৎ, তাই ইদানিং হঠাৎ চেতনা জাগল, বঙ্কিম-বিষয়ে আমার বাকি বক্তব্য আপাতত সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমার অগাধ শ্রদ্ধা, অথচ তাঁর উপন্যাসগুলি তিনবার বা চারবার পাঠ করার পরও একটিও আমার পুরোপুরি পছন্দ হয় না। আগে অপছন্দের কথা ও কারণ ব্যক্ত করি। শ্রদ্ধার কথা পরে নিবেদন করা যাবে।

লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা সমমর্মিতা জন্মালেই সে-সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা বড় সুখের হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এ-কালের একজন পাঠক হিসেবে আমার সমমর্মী নন। তিনি যে-কালে যে-পরিবেশে লিখেছেন তা সম্পূর্ণ মনে রেখেও এবং নিজের কাছে বারংবার প্রশ্ন করেও আমার এই সিদ্ধান্ত বদলাবার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিপ্রতিম, তিনি স্বদেশীমন্ত্রের উদ্গাতা, এইসব কথাগুলি যে পরবর্তীকালে চালু হয়ে এসেছে,তা সত্যমিথ্যা যাই হোক, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে এর কোনো পরিচয় নেই। তাঁর প্রথমদিককার উপন্যাসগুলির কাহিনী অতি কৃত্রিম ও দুর্বল, চরিত্রগুলি অবাস্তব শুধু নয়, উদ্ভট, পরে ক্রমশ কাহিনীর বাঁধুনিতে তাঁর দক্ষতা জন্মায়, রচনার গতি আরো রোমহর্ষক হয় বটে কিন্তু শেষের দিকে উপন্যাসের মধ্যে নানারকম বক্তব্য প্রচারের অনাবশ্যক ঝোঁকও দেখা দেয়। এই ঝোঁক রসহানিকর এবং তাঁর বক্তব্যগুলি প্রতিক্রিয়াশীল। এ-সব বক্তব্যগুলি অগ্রাহ্য করে তাঁর উপন্যাসগুলি উপভোগ করা যায় বটে এবং এইসব বই যেহেতু আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদের অন্তর্গত তাই দোষ-গুণ বিচার না-করে এগুলি আমাদের অবশ্যপাঠ্যও বটে। কিন্তু উপন্যাস লিখে বঙ্কিম আমাদের দেশ বা সমাজের কোনো উপকার করে গেছেন, এ-কথা মেনে নিতে আমি রাজি নই।

বঙ্কিম মোট চোদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন, সব-কটিই তাঁর চাকরি জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি যেন এক অন্যমানুষ। বঙ্কিম যে-বৎসর চাকরিতে ঢোকেন, ঠিক তার আগের বৎসরই সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেছে এবং কোম্পানির আমল বদলে বৃটিশ রাজত্ব এসেছে। কোম্পানির আমল ও বৃটিশ রাজ— এই দুই অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থারও যে অনেক পরিবর্তন এসে যায়, তা সবারই জানা। প্রকৃত পরাধীনতা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব শুরু হয় বঙ্কিমের চাকুরির আমলেই। তখনকার পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষিত, চরিত্রে সৎ ও দায়িত্ববান এবং আদর্শবাদী বঙ্কিম সরকারি কার্যেও ছিলেন অত্যন্ত পারঙ্গম। কিন্তু দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর চাকুরির পরও তিনি যে-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ঢুকেছিলেন, অবসর নিলেন সেই পদেই। চাকুরিকালে খবরের কাগজওয়ালা কিছু-কিছু সাহেব তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করলেও শুধুমাত্র ভারতীয় বলেই

বঙ্কিমের পদোন্নতি ঘটেনি এবং কয়েকবার কিছু দুঃশীল ইংরেজদের কাছে তাঁকে অপমানিতও হতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের ঘৃণা করতেন অন্তর থেকে, 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে ইংরেজ বা ইওরোপীয় পণ্ডিতদের সম্পর্কে তাঁর গভীর অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, কমলাকান্তের রচনায় ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ ও ইংরেজ শাসনের প্রতি বর্ষণ করেছেন তীব্র বিদ্রূপ, কিন্তু চাকুরি জীবনে তিনি ইংরেজ-বিরুদ্ধ একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। চাকুরি জিনিসটাই একটা অরুচিকর কঠিন কাজ, চাকুরি বাঁচাবার জন্য অনেককেই অনেক-কিছু করতে হয়, সেজন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রর কোনো দোষ ধরি না। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে তিনি ইংরেজের অনাবশ্যক জয়গান করেছেন বলে পরবর্তী যুগের উপন্যাসপাঠক হিসেবে আমরা তাঁর এই ব্যাপারটিকে উপন্যাস আঙ্গিকের ত্রুটি বলেই নিশ্চিত গণ্য করব।

আমরা এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সামান্য তুলনা করতে চাই। বিদ্যাসাগর উপন্যাস-কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি, সুতরাং সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তবে ঋষি, স্বদেশীমন্ত্রের উদগাতা বঙ্কিমের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দু-চার কথা বলা চলে নিশ্চয়ই। বিদ্যাসাগর পরকর্তীকালে ঋষি হননি, স্বদেশীমন্ত্রের উদগাতার সম্মানও কেউ তাঁকে দেয়নি। বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিতি কাজও খুব কমই করেছেন। তাঁর জ্ঞান উজাড় করে কোনো মহাগ্রন্থও লিখে গেলেন না। কয়েকটি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য খাটাখাটনি করে জীবন ব্যয় করলেন। আমরা বিদ্যাসাগরের অনুপন্থী, তাই অনেক ব্যাপারেই বঙ্কিমকে সমর্থন করতে পারি না। এটা ওই দুই বিশাল পুরুষের পুরনো ঝগড়ার জের টানা নয়। বিদ্যাসাগর যুদ্ধ করেছেন দেশবাসীর সংস্কারমুক্তির জন্য। এই ধর্মীয় গোঁড়ামির দেশে তিনি দেশবাসীকে কণামাত্র ধর্মের আফিম পরিবেশন করেননি, এবং সাধ্যমতন কয়েকটি কণা অপসরণ করতে চেয়েছেন এবং কিছুটা পেরেছেনও; আর বঙ্কিম বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িয়েছেন ধর্মীয় ডোজ, প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন বহুবিবাহ, বিরোধিতা করেছেন বিধবাবিবাহ ও স্কুল-কলেজে স্ত্রীশিক্ষার। শুধু তা-ও নয়, দেশে বহুস্তরে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন বিদ্যাসাগর, সে-সময় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু বঙ্কিম এ-ব্যাপারে কোনো কার্যকর উৎসাহ দেখাননি। এমন-কি যখন দেশীয় ব্যক্তিদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করে সরকার শুধু কেরানি বানাবার শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাব আনে, তখন স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত হয়েও বঙ্কিম সমর্থন করেছিলেন সরকারি প্রস্তাব। দেশের বাকি উচ্চশিক্ষিত লোকেরা তখন ছিলেন সরকারের বিপক্ষে।

বিদ্যাসাগরও ইংরেজের অধীনে চাকরি করেছেন। প্রথম জীবনের একটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে সেটি মূলত অনুবাদ, তিনি ইংরেজ জাতির গুণগান করেছিলেন বটে কিন্তু পরবর্তীকালে

তিনি এ-দেশে ইংরজে শাসনের উপকারিতা-অপকারিতা সম্পর্কে ছিলেন নীরব। ইংরেজদের কাছ থেকে যতটুকু সুযোগ-সুবিধে আদায় করে দেশের উন্নতি করা যায়, সেইদিকেই ছিল তাঁর মন। শিক্ষা-বিস্তারের কাজে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বাধা পান, এবং সেই সময়েই চাকরি জীবনে তাঁর পদোন্নতিতে সঙ্কট দেখা দেয়। বঙ্কিমের মতনই, তাঁকে ডিঙিয়ে এক শ্বেতাঙ্গকে দেওয়া হয় উপরের পদ। এজন্য বিদ্যাসাগর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি বটে, আবার বঙ্কিমের মতন দীর্ঘকাল মেনে নিয়ে চাকুরি চালিয়েও যাননি। বঙ্কিমের চেয়ে অনেক বেশি মাইনের চাকুরি তিন সামান্য অজুহাত দেখিয়ে এককথায় ছেড়ে দেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর ইংরেজের দাসত্ব করতে যাননি।

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের পর যখন কিছু-কিছু সংগঠনের চেষ্টা হয়, তখন বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগর কেউ যোগ দেননি প্রকাশ্য রাজনীতিতে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগর দু-জনের কাছেই ডাক এসেছিল। বঙ্কিম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে কংগ্রেস শুধু কিছু শিক্ষিত লোকের সমাবেশ মাত্র, এর আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী অন্তঃসারশূন্য, দেশের সাধারণ মানুষের যোগদানের উপযুক্ত হয়নি। (দ্রষ্টব্য : 'বঙ্কিম রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, যোগেশচন্দ্র বাগলের ভূমিকা, পৃ. ২৪) বঙ্কিম নিজে সাধারণ মানুষ ছিলেন না, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে কীভাবে সামিল করা যায়, তার কোনো প্রস্তাবও তিনি দেননি। আর বিদ্যাসাগর কংগ্রেসের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন একটি সহজ কারণ দেখিয়ে; উদ্যোক্তাদের তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, 'দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে?' বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না-দিতে পেরে তারা বিব্রত হয়ে পড়ে; তখন বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'আমাকে বাদ দিয়াই তোমরা এই কাজে এগোও।' (ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃতি, ইন্দ্রমিত্র রচিত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', পৃ. ১২) এরপরও দেশের সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা বিদ্যাসাগরকে মনেও রাখেনি। বঙ্কিমচন্দ্রকেই তাদের দীক্ষাগুরু মনে করেছে। হায় ইতিহাসের এইসব বাঁকগুলিকেই নিয়তির পরিহাস বলতে ইচ্ছে হয়।

বিদ্যাসাগর মূলত কর্মযোগী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত লেখক। বিদ্যাসাগরের আদর্শের প্রতিফলন তাঁর কর্মসাফল্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিকাশের পরিচয় তাঁর রচনায়। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের কর্ম ও আদর্শের নিন্দে করেছেন বারবার। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলিয়েছেন, পরে অন্য জায়গায় আবার 'তাহারা শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায়' বলেও কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করেছেন। কেননা, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে তেমন শাস্ত্রবিশারদ বলে মনে করতেন না। বিদ্যাসাগরের পরাশর-মত সমর্থন বঙ্কিমের

ধারণায় ভুল। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারকদের উদ্দেশে বজ্রপাত করতে চেয়েছেন, 'যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?' শেষের দিকে বঙ্কিমের গোঁড়ামি উত্তরোত্তর বেড়েছে, যা-কিছু আধুনিক, তার ওপরেই তিনি খড়্গহস্ত, সমাজ সংস্কারের যে-কোনো প্রচেষ্টাই তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত। দিনের বেলা স্বামীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়াটাই তাঁর মতে অন্যায়। 'দেবী চৌধুরাণী'তে স্বয়ং লেখকই মাঝে-মাঝে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদের কথা লিখিতেছি না', কিংবা 'প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মতো নহে—ধিক একাল!' বঙ্কিমের আমলেই নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে, বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা মেয়েদের অধিকার অর্জনের জন্য নানারকম প্রয়াস করছেন, আর সে-কালের সবচেয়ে সার্থক এবং সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক এর প্রতিরোধ করতে চাইছেন, এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? পরে অবশ্য 'সাম্য'প্রবন্ধে তিনি দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শোচনীয় অবস্থা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজের কাজের সামান্য প্রশংসা করে মুখরক্ষা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে তিনি ঘোরতর সনাতনপন্থী। এবং বিদ্যাসাগরের মতোই ব্রাহ্মসমাজকেও যে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অপছন্দ করতেন তা সুবিদিত।

বহুবিবাহের নির্লজ্জ সমর্থন করেছেন বঙ্কিম তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাসে। বিদ্যাসাগরের মতের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'বহু বিবাহ'। বিদ্যাসাগরের মতের বিরোধিতা করা তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য বঙ্কিমের নিন্দে করেননি কোনোদিন, প্রকাশ্যে তাঁর প্রশংসাই করতেন। শুধু শোনা যায়, বঙ্কিমের উক্ত প্রবন্ধ পড়ে তিনি মনে দুঃখ পেয়েছিলেন। সেইজন্য বঙ্কিম কিছুদিন প্রবন্ধটির পুনঃপ্রকাশ করেননি, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরই তিনি সেটি আবার ছাপতে দেন।

'বন্দেমাতরম্' পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির ধ্বনি এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিকে একসময় বাঙালি বিপ্লবীরা গীতার মতন ভক্তি করেছে। যে-মানসিকতার ফলে ভারতবর্ষকে বাধ্য হয়ে বিভক্ত করা হল, তার উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ 'আনন্দমঠে'র মতন উপন্যাসের রচনা এবং এই উপন্যাসের লেখককে 'স্বদেশী মন্ত্রের উদ্গাতা' হিসেবে গণ্য করা।

ছাত্র বয়সের পর বঙ্কিম আর কবিতাচর্চায় তেমন মন দেননি। তবু পরিণত বয়সে একদিন ঝোঁকের মাথায় আধা-সংস্কৃত আধা-বাংলায় একটি পদ্য রচনা করলেন, যেটিকে দেখে ছাপাখানার পণ্ডিত 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠার ফাঁক ভরাবার পক্ষে 'মন্দ নয়' বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরে সেই 'বন্দেমাতরম্' পদ্যটিকে সুর দিয়ে গান করা হয় এবং আরও

পরে 'আনন্দমঠ' লেখবার সময় তিনি ওই 'বন্দেমাতরম্' গানটি ওই-উপন্যাসে ঢুকিয়ে দেন। এই নির্দোষ প্রক্রিয়ার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

'বন্দেমাতরম্' গানটির প্রথমাংশ দেশবন্দনার কাব্য হিসেবে অতি উচ্চাঙ্গের। 'বন্দেমাতরম্' এই ধ্বনিও জাতীয়তাবোধ জাগাবার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারত। দেশকে জননী বলা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুযায়ী এবং মুসলমানদের এটা মেনে না-নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই, এবং মুসলমানরা শুধু দেশকে জননীরূপে দেখার কারণেই 'বন্দেমাতরম্'কে বর্জন করলে সেটা তাদের নিকৃষ্ট গোঁড়ামি বলে আমরা ধিক্কার দিতে পারতাম অনায়াসেই। কিন্তু ক্রমশ এই দেশজননীর রূপকল্পনা রূপান্তরিত হয়েছে সম্পূর্ণ এক হিন্দু দেবীর মূর্তিতে, মুসলমানরা সেই দেবীমূর্তির বন্দনা করতে কেন বাধ্য হবে? এবং 'বন্দেমাতরম্' গানটি রয়েছে এমন একটি গ্রন্থে, যে-গ্রন্থের মূল বক্তব্যই হল মুসলমানরা হিন্দুদের শত্রু। ইংরেজ বন্ধু, কিন্তু মুসলমান শত্রু। যাতে কেউ এই বক্তব্য বুঝতে ভুল না-করে তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য তিনি স্পষ্ট করে উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বলে দিয়েছেন সে-কথা। মুসলমানদের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে কিন্তু হিন্দু রাজ্য এখনও স্থাপিত হয়নি বলে সত্যানন্দের আফসোসের উত্তরে এক অলৌকিক চিকিৎসক জানিয়ে দিলেন যে, "যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে— নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। ... মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ— ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ।... শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।"

ইংরেজের জয়গান দিয়ে গ্রন্থ শেষ করলেন ইংরেজ-কর্মচারী বঙ্কিম। ভবিষ্যতের জন্য যে-আশা রাখলেন, তা-ও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের। দেশের অর্ধেক লোক যে মুসমলান, তাদের তুচ্ছ করে দেওয়া হল। মুসমলান পাঠক ও সমালোচকরা 'আনন্দমঠ'কে অতি সাম্প্রদায়িক ও ক্ষতিকর গ্রন্থ বলে অভিহিত করলেও হিন্দু সমালোচকরা সে-সমালোচনার কিছুমাত্র মূল্য দিলেন না, তাঁরা 'আনন্দমঠে' খুঁজে পেলেন স্বদেশপ্রেমের সার্থক ছবি এবং 'বন্দেমাতরম্'কে করলেন জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। এটা অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেশের অর্ধেক সংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে এ কোন ধরনের দেশপ্রেম? বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রও একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক লিখেছিলেন। 'নীলদর্পণে' চেষ্টা করেছেন দীনবন্ধু হিন্দু-মুসলমানকে একজায়গায় মেলাতে, একটি প্রহসনে মাইকেলও তা-ই করেছেন, আর বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসগুলিতে অনবরত চেষ্টা চালিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির। বাঙালি জাতি ও তার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ড করার জন্য কাঁঠালপাড়া-নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি কিছুটা পরিমাণে দায়ী নন?

মোট চোদ্দখানি উপন্যাসের মধ্যে একটিতেও বঙ্কিম কলকাতা শহর, নাগরিক জীবন বা সমসাময়িককালের কোনো পরিপূর্ণ চিত্র আঁকেননি এ-ও বড়ো আশ্চর্য কথা। কোনো মহৎ লেখক তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা বর্তমান কালকে নিজের রচনায় স্থান দিলেন না এ-ও যেন অভূতপূর্ব ব্যাপার। অথচ লেখক হিসেবে বঙ্কিম যে মহৎ ছিলেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্পর্কেই তাঁর কোনো উপন্যাসেরই কাহিনির গঠন কিংবা প্রকট বক্তব্য আমার কাছে রুচিকর মনে হয় না। উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিম প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন তেরোটি, এর মধ্যে তাঁর ধর্ম-বিষয়ক দুটি বাদ দিলে বাকি এগারোটি অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ।

সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা স্পষ্ট : 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের ব্যাপারে নানা লোকের নানা মতামত থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যে সৌন্দর্যসৃষ্টিরও বিষয়, সেটি বঙ্কিম জানতেন। মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন ঘটাতে গিয়ে তিনি নানান বিভ্রম ঘটিয়েছেন বটে, কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছেন তিনি। এইখানেই তিনি শ্রদ্ধেয়। প্রথম থেকেই তিনি বাংলাভাষায় একটা উঁচু মান বেঁধে দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীর অবাস্তবতাও শেষ পর্যন্ত আমরা অগ্রাহ্য করে বইখানিকে প্রিয় বলে মেনে নিতে পারি, তার কারণ শব্দ ব্যবহারে ও ভাষাসৌন্দর্যে এর অনেক স্থান প্রকৃত কাব্যময় হয়ে উঠেছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রচুর গাঁজাখুরি থাকা সত্ত্বেও শেষ দৃশ্যে মুমূর্ষু প্রতাপের কথা শুনলে শরীরে শিহরন হয়। 'সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল, বলিল, কী বুঝিবে তুমি, সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালোবাসা বুঝিবে!' তখন পাঠক এইটুকু অন্তত বুঝতে পারে যে এই লেখক জাত শিল্পী।

'বঙ্গদর্শনে'র মতন একটি পত্রিকা প্রকাশ করে বঙ্কিম সমগ্র বাঙালি জাতিকে কৃতজ্ঞ করে গেছেন। লেখক এবং সম্পাদকের তুলনা চলে না। কিন্তু লেখক বঙ্কিম মনুষ্যজাতির যত-না মঙ্গলসাধন করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন সম্পাদক হিসেবে। 'বঙ্গদর্শনে'র কঠোর সুবিচার এবং সাহিত্য রচনার যে উচ্চমান বঙ্কিম নির্ধারণ করে গেছেন তার ফলেই পরবর্তীকালের সাহিত্য অনেক সম্পদশালী হতে পেরেছে। সাহিত্যরুচিকে অতখানি পরিশীলিত করে দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের মতন এমন সূক্ষ্মরুচির লেখককে আমরা এত তাড়াতাড়ি পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্য যতকাল বেঁচে থাকবে ততদিন বঙ্কিম এর পিতৃপুরুষ বলে গণ্য হবেন।

কিন্তু আমরা 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বরের মতন, তার পিতার অন্যায় বা অসঙ্গত কথাগুলিও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারব না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই মহৎ লেখকটি ছিলেন প্রাচীনপন্থী ও বিপরীতমুখী। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগেই এমন একজন শক্তিমান ভাষাশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল।

'দেশ'-'কৃত্তিবাস' ১৩৮৪-৮৬। ১৯৭৮-৭৯

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় উপন্যাসের জন্ম

আঠারোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশ বছর বয়স্ক তরুণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরাজিতে লিখতে শুরু করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। Indian Field নামে একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল "Rajmohan's Wife"। কৈশোরকাল থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল, সরকারি চাকরির বদলে সাহিত্য রচনাতেই যে তাঁর প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটবে এই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রাজমোহন্‌স ওয়াইফ উপন্যাসে প্রতিভার কোনো চিহ্ন নেই, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় এই উপন্যাস পাঠকদের মনে কোনোরূপ আগ্রহের সৃষ্টি করেনি। সদ্য ইংরেজি শিক্ষিতরা সেসময় যেমন অনেক দুর্বল কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করতেন, ভারতের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

উপন্যাসটি লিখতে লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বোধ হয় বুঝেছিলেন যে, কিচ্ছু হচ্ছে না। সেই জন্যই তিনি এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চাননি, সারা জীবনে এই রচনাটির কথা বিশেষ উল্লেখও করেননি।

সাহিত্যিক হিসেবে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় ব্যর্থতা।

ছাত্র বয়েসে তিনি কবিতা লিখতেন। ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্য রয়েছে, বাঙালিরা ভাবপ্রবণ, কবিতাপ্রিয় জাত, সুতরাং সদ্য বিবাহিত এক রোমান্টিক কিশোর যে কবিতা রচনা দিয়েই সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু সেসব অতি সাধারণ কবিতা। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, তিনি নতুন ধরনের কবিতা লিখে বাংলা কাব্যরচনার রীতিই বদলে দেবেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ললিতা-তথা মানস'-এর ভূমিকায় তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ-কথাও উল্লেখও করেছিলেন, কিন্তু সেই কাব্যগ্রন্থটির এরকম কোনো যোগ্যতাই ছিল না। বইটি বিক্রি হয়েছিল মাত্র ছ'কপি, পাঠক বা সমালোচক কেউই সে কাব্যগ্রন্থটিকে কোনোরকম গুরুত্ব দেননি। বহুকাল পরে বঙ্কিম নিজেও স্বীকার করেছেন যে তাঁর ওই কাব্যগ্রন্থটির কোনো

গুণ ছিল না। (তবে, আশ্চর্যের বিষয়, অনেক বছর পরে, বঙ্কিমের একটি পরীক্ষামূলক কবিতা আকস্মিকভাবে অমরত্ব লাভ করেছে। ভাঙা ভাঙা সংস্কৃত ও বাংলা মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের খেয়ালে একদিন বন্দেমাতরম্ কবিতাটি লিখেছিলেন।)

প্রথম কাব্যগ্রন্থের জন্য কোনোরকম সমাদর না পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কয়েক বছর আর কলম ধরেননি। তারপর ইংরেজি উপন্যাস লিখেও সুবিধে করতে পারলেন না, তাতেও নিরুদ্যম না হয়ে তিনি পরের বছরই বাংলায় লিখলেন আর একটি উপন্যাস। মাতৃভাষাই যে সাহিত্য রচনার প্রকৃষ্ট বাহন, সে উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল খুব সম্ভবত তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দৃষ্টান্ত থেকে। প্রথমে ইংরেজিতে কাব্য লিখে মাইকেল মধুসূদনও অপাঠ্য রচনার বোঝা বাড়িয়েছিলেন, বাংলা লিখতে শুরু করে মাইকেল রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কিন্তু মাইকেলের চেয়ে বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল অনেক কঠিন। মাইকেল ইংরেজি কবিতার আঙ্গিক ধার করলেও তাঁর পিছনে ছিল বিশাল সংস্কৃত কাব্যের পটভূমিকা, বাংলাতেও কয়েক শতাব্দী ধরে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমের কাছে কোনো ভারতীয় গদ্যের আদর্শ ছিল না, বাংলা গদ্যও তখন নাবালক শিশুর মতন সদ্য দুর্বল পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে, সেই শিশুকে দিয়ে কোনো গভীর কথা বলানো যায় না। শুধু বাংলা কেন, প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই গদ্য উপন্যাস একটা অভিনব ব্যাপার, যে-কোনো গল্পকেই অনেকে তখনো গদ্যকাব্য বলে।

ইংরেজি সাহিত্যে ততদিনে উপন্যাসের বয়েস মোটামুটি একশো বছর। বর্ণনামূলক কাব্যের চেয়ে গদ্য উপন্যাসই যে সাহিত্যের জনপ্রিয় আঙ্গিক হতে চলেছে, তা এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু উপন্যাসের কাঠামো গড়ে তোলার মতন পরিচ্ছন্ন গদ্য তখনো ভারতীয় ভাষাগুলিতে দানা বাঁধেনি। মিশনারিরা এসে তাদের প্রয়োজনে কাজ চালানো গদ্যের প্রবর্তন করেছে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু-কিছু পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হতে শুরু করেছে দেশীয় ভাষায়, কিন্তু তাতে সাহিত্যের কোনো চিহ্ন নেই।

বঙ্কিম যখন বাংলায় তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লেখেন, তখন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গদ্য রচনার প্রচেষ্টা কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

বাংলার তুলনায় অসমীয়া ভাষায় গদ্য অনেক আগেই চালু হয়ে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে অহোম রাজাদের রাজসভার দৈনন্দিন বিবরণ লেখা হত প্রধানত গদ্যে, সেগুলিকে বলে বুরুঞ্জি। এইসব বুরুঞ্জিগুলিতে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে। কিন্তু এই গদ্যরচনার ধারায় ছেদ পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, বর্মার সৈন্যদের আক্রমণে কিছুদিনের জন্য অসমীয়ারা স্বাধীনতা হারায়। তারপর ইংরেজরা যখন অসম দখল করে নেয়, তারপর দীর্ঘকাল শিক্ষার মাধ্যম ও আদালতের ভাষা হিসেবে অসমীয়া ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, সুতরাং তখন অসমীয়া গদ্যের চর্চাও বিশেষ হতে পারেনি। অসমের

প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখেন রজনীকান্ত বরদলুই গত শতাব্দীর একেবারে শেষের দশকে, তখন বঙ্কিমের সবকটি উপন্যাস বেরিয়ে গেছে এবং রজনীকান্ত বরদলুই বঙ্কিমের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাঙা স্থানীয় ভাষা নিয়ে গড়ে উঠেছিল হিন্দি ভাষা। কিন্তু বেনারস-কেন্দ্রিক খারি-বোলি ভাষাকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে নেওয়ার পরই আধুনিক হিন্দি সাহিত্য গড়ে ওঠে। এই ভাষার প্রথম দিকের প্রধান দু'জন লেখক ছিলেন ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র এবং মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী। এঁরা দু'জনেই বঙ্কিমের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট এবং হিন্দি গদ্যনির্মাণে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য হলেও এঁদের রচিত উপন্যাস তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম সার্থক উপন্যাসের জন্য হিন্দি সাহিত্যকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রেমচাঁদ-এর আগমন পর্যন্ত।

ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার আগে অবধি উর্দু ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও সে ভাষায় ক্ষমতাবান লেখকরা কবিতা ও গজল রচনাই করেছেন বেশি, উর্দু গদ্য গড়ে উঠতে অনেক সময় লাগে। রতননাথ সরকার এবং আবদুল হালিম শারার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা শুরু করেন বঙ্কিমের অনেক পরে, গত শতাব্দীর শেষের দিকে। তাঁরা বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমন বললে অত্যুক্তি হয় না।

গুজরাতি সাহিত্য প্রেম ও ভক্তি রসাশ্রিত কাব্যে যথেষ্ট ধনী। কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাসের উপযোগী গদ্য তৈরি হতে সে ভাষায় অনেক সময় লেগেছে। নর্মদ এবং গোবর্ধনরাম আধুনিক গুজরাতি সাহিত্যের দু'জন প্রধান গদ্যলেখক। এঁরা দু'জনেই বঙ্কিমের পরবর্তী কালের। গুজরাতি ভাষার প্রথম সার্থক ও কালজয়ী উপন্যাস 'সরস্বতীচন্দ্র' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিম তাঁর সবকটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন।

মালয়ালম ভাষায় পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও, ওই ভাষার গদ্য সাহিত্যের বয়েস একশো বছরের কাছাকাছি মাত্র। গত শতাব্দীতে এই ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ছিল খুব বেশি, যার ফলে সাহিত্য রচিত হত একটা কৃত্রিম ভাষায়, যার সঙ্গে মালয়ালিদের মুখের ভাষার মিল ছিল খুবই কম। ক্লাসিকাল স্টাইল ভেঙে মালয়ালিদের নিজস্ব ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন চান্দু মেনন। তাঁর 'ইন্দুলেখা' এবং 'সারদা' উপন্যাস পরবর্তীদের প্রেরণা দিয়েছে।

কন্নড় ভাষা উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে অনেক প্রাচীন। প্রায় চোদ্দশো বছর ধরে এই ভাষায় গৌরব করার মতন সাহিত্য রচিত হচ্ছে। কিন্তু ওই ভাষায় বহুকাল ধরে কবিতার তুলনায় গদ্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কেম্পু নারায়ণের 'মুদ্রা মঞ্জুষা'কে বলা যায় প্রথম আধুনিক কন্নড় গদ্যের সার্থক নিদর্শন। এই বই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমের জন্মেরও আগে। কেম্পু নারায়ণের কাহিনীটি অবশ্য মৌলিক নয়, সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রা রাক্ষস'-এর ভাব নিয়ে রচিত। মহীশূরের রাজা মুম্মাদি কৃষ্ণ রায়া

(Mummadi Krishna Raya) ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং নিজেও একজন উত্তম গদ্যলেখক। কিন্তু কন্নড় ভাষায় সার্থক উপন্যাস এসেছে আরও পরে। অধ্যাপক V. K. Gokak-এর মতে, বাংলা ও মারাঠী উপন্যাস প্রথম যুগের কন্নড় উপন্যাস লেখকদের প্রভাবিত করেছিল।

ভারতের দুই প্রান্তে দু'টি ভাষায় দু'জন বড়ো মাপের লেখককে বঙ্কিমের প্রায় সমসাময়িক বলা যায়। মারাঠী ভাষায় হরিনারায়ণ আপ্তে এবং ওড়িয়া ভাষায় ফকিরমোহন সেনাপতি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই মারাঠী গদ্য মোটামুটি একটা রূপ নিয়েছে এবং সিপাহী বিদ্রোহের বছরে প্রকাশিত হয়েছে মারাঠী ভাষায় প্রথম উপন্যাস 'যমুনা পর্যটন' (Yamuna Paryatan)। হরিনারায়ণ আপ্তে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লিখতে শুরু করেন, তখন এই ধরনের রোমান্স মারাঠী পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। আপ্তের প্রথম উপন্যাস 'মাধলি স্থিতি' (Madhli Sthiti) প্রকাশিত হয়েছিল অবশ্য বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের ঠিক কুড়ি বছর পর।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং ছাপাখানার সুযোগ কলকাতার তুলনায় বম্বেতেও যথেষ্ট ছিল, সেই জন্য আধুনিক মারাঠী গদ্যসাহিত্য সেই সময় গড়ে ওঠা আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু ওড়িশায় সেইসব সুযোগ ছিল খুবই কম, তবু যে সেখানে একটি শক্তিশালী গদ্যসাহিত্য গড়ে উঠতে পেরেছিল, তা সত্যিই বিস্ময়ের। এবং সেই আধুনিকতার নায়ক ফকিরমোহন সেনাপতি। তিনি বঙ্কিমের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন বয়েসে। বঙ্কিম ভারতের প্রথম গ্র্যাজুয়েট আর ফকিরমোহন স্কুলে পড়েছেন মাত্র তিন-চার বছর। বঙ্কিম চাকরিজীবনে প্রথমেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন আর ফকিরমোহন বালাসোর বন্দরে এক জাহাজের পাল সারাবার কারখানায় চাকরি নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি ওড়িশার কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান পর্যন্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজে অজস্র লিখেছেন এবং প্রতিবেশী সাহিত্যের প্রভাব থেকে ওড়িয়া সাহিত্যকে মুক্ত করে একটা স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে গেছেন। বঙ্কিম যখন লিখছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ধনী শ্রেণীর মানুষের প্রণয় কাহিনী, ফকিরমোহন তখন লিখলেন সাধারণ নিচুতলার মানুষের কথা। তাঁর উপন্যাস 'ছামানা আতাগুণ্ঠা' (Chhamana Athaguntha) এক নিপীড়িত তাঁতি পরিবারের কাহিনী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফকিরমোহনের রচনা ওড়িশার বাইরে বহুদিন পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

ইতিহাসের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আপ্তে এবং সেনাপতি, এই দু'জনেরই পূর্বসূরি। তিনি যখন দুর্গেশনন্দিনী রচনা করেন, তখনও ওঁরা দু'জনে কলম ধরেননি। সারা ভারতবর্ষে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে নিঃসঙ্গ।

বঙ্কিম অহঙ্কারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড, নিজের মতামতকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং অন্যদের মতামত নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে দু'টি কাহিনী আছে। বঙ্কিম নাকি

প্রথমে তাঁর দুই দাদাকে দুর্গেশনন্দিনী পড়ে শোনান, এঁদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে বিখ্যাত লেখক হয়েছিলেন। সেই দুই দাদাই মন্তব্য করেছিলেন, বইটি ছাপাবার যোগ্য নয়। আবার অন্য মতে, বঙ্কিম তাঁর বাড়িতে অনেক লোকের সামনে দু'দিন ধরে এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, শ্রোতাদের মধ্যে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত এবং অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতও ছিলেন, তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হন। যাই হোক, বঙ্কিম এই উপন্যাসটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে না দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন ১৮৬৫ সালে, দাম এক টাকা।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় বেশ দুর্বল। ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। গদ্যের আঙ্গিক ইংরেজি ঘেঁষা, কিন্তু সংস্কৃত থেকে প্রচুর শব্দ আহরণ করেছেন এবং বিশেষণের এত বাহুল্য যে অনেক জায়গায় কৃত্রিম শোনায়। তবু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে একটা সাড়া পড়ে যায়। বাংলাভাষায় একটা অভিনব সৃষ্টি তো বটেই। জমজমাট কাহিনী ও চরিত্রগুলির আবেগ সৃষ্টিতে তিনি যে প্রকৃত ঔপন্যাসিক তা চমকপ্রদভাবে প্রমাণ করে দিলেন প্রথম রচনায়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এই বইটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে, তাঁর জীবৎকালে দুর্গেশনন্দিনী বিক্রি হয়েছে ১২,৫০০ কপি, গত শতাব্দীতে কোনো দেশীয় ভাষার গ্রন্থের পক্ষে এই সাফল্য অভাবনীয় বলা যায়।

পত্র-পত্রিকায় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের সময় কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনাও হয়েছিল, প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে এই উপন্যাসে স্কট-এর 'আইভানহো' উপন্যাসের প্রভাব খুব বেশি। মোগল-পাঠান যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা হলেও দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনীর সঙ্গে আইভানহো-র কাহিনীর যে যথেষ্ট মিল আছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ইহুদি রমণী রেবেকার সঙ্গে আয়েষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। দু'টি গ্রন্থেরই শেষ দৃশ্যে বিবাহ ও ব্যর্থ প্রেমিকার করুণ বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা। তবে কি দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী মৌলিক নয়? এই প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ বিরক্ত হতেন এবং তিনি বারবার বলেছেন যে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি 'আইভানহো' পড়েননি। দৃঢ়চেতা এবং অহংকারী বঙ্কিম মিথ্যে কথা বলবেন, এটা বিশ্বাস করা যায় না। তাঁর সমসাময়িক অনেকেই এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে His honesty was unimpeachable.

বঙ্কিমের সমসময়ে ইংরেজি সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন চার্লস ডিকেন্স। এছাড়া উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে (কলকাতায় যাঁর জন্ম) ব্রন্টি ভগ্নীত্রয় এবং জর্জ এলিয়ট-এর উপন্যাসগুলি ক্রমশই কবিতার তুলনায় গদ্যকাহিনীকে বেশি জনপ্রিয় করে তুলছিল। ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' ছাপা হয় বঙ্কিমের জন্মের বছরে। পিকুইক পেপারস আগেই বেরিয়ে গেছে। 'এ টেল অফ টু সিটিজ' বা 'গ্রেট এক্সপেক্টেশানস্'-এর মতন মহৎ উপন্যাসগুলি যখন লেখা হচ্ছে বঙ্কিম তখন পূর্ণ যুবা। ব্রন্টি বোনেরা এবং জর্জ এলিয়টের মতন নারী-ঔপন্যাসিকরা কাছাকাছি সমাজজীবনের চরিত্র বেছে নিয়ে বাস্তব কাহিনী বুনছেন। জর্জ এলিয়টের 'অ্যাডাম বিড' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

বঙ্কিম ইংরেজি সাহিত্যের নিয়মিত পড়ুয়া ছিলেন। তবে তিনি প্রবন্ধ ও দর্শন যত পড়তেন, সেই তুলনায় গল্প উপন্যাস কী কী পড়েছিলেন, তা ঠিক জানা যায় না। বিদেশি সাহিত্যের সাগর পাড়ি দিতে খানিকটা সময় লাগে, সেই জাহাজ চলাচলের যুগে আরো বিলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বঙ্কিমের পক্ষে প্রায় তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের উপন্যাসের খোঁজ রাখা হয়তো সম্ভব ছিল না। অবশ্য জর্জ এলিয়টের কোনো উপন্যাস বঙ্কিম পড়েছিলেন, এর একটা তির্যক নিদর্শন আছে। বঙ্কিম মেয়েদের বিদ্যাচর্চার বিরোধী ছিলেন। কমলাকান্তের মুখ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না। স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন, মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।''

কিন্তু ওয়াল্টার স্কটের মৃত্যু হয়েছে বঙ্কিমের জন্মেরও আগে। 'আইভানহো' প্রকাশিত হয়েছে ১৮২০ সালে। রোমান্টিক যুগের লেখকদের মধ্যে স্কটের মতন এমন জনসমাদর আর কেউ পাননি। স্কটের 'দা ওয়েভার্লি', 'আইভানহো', 'কেনিলওয়ার্থ' কিংবা 'দা ট্যালিসমান'-এর মতন সুখপাঠ্য উপন্যাসগুলি তখন ইংল্যান্ড ছাড়িয়ে ইউরোপের নানা দেশের স্কুল-কলেজের ছেলেদের হাতে হাতে ঘোরে। সুতরাং 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হবার পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত 'আইভানহো' উপন্যাসটি কলকাতার শিক্ষিত পাঠকমহলে পরিচিত থাকাই স্বাভাবিক ছিল। হিন্দু পেট্রিয়টের কোনো অজ্ঞাতনামা সমালোচক যে পড়েছিলেন, তার তো প্রমাণই অছে।

বঙ্কিম বলেছেন, তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার আগে 'আইভানহো' পড়েননি। আমরা অবশ্যই বঙ্কিমের কথা বিশ্বাস করব, সেটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানায়। আবার এই দু'টি উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগত প্রকট মিলের প্রতি চোখ বুজে থাকলে তাকে সুষ্ঠু সাহিত্য বিচার বলা যায় না। আমাদের দেশের বঙ্কিম-গবেষকরা অনেকেই এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন কিংবা সংক্ষেপে সেরেছেন। কিংবা অক্ষয় দত্তগুপ্তের মতন কোনো ভক্ত জীবনীকার বলেছেন, ''যে প্লট সার ওয়াল্টার স্কটের মাথায় খেলিয়াছিল, তাহা কি বঙ্কিমের কল্পনায় আসা অস্বাভাবিক?''

এক লেখকের প্রকাশিত কাহিনী যদি কোনো দৈব প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো লেখকের মাথায় যায়, তাহলেও দ্বিতীয় লেখকের রচনাকে মৌলিক বলা যাবে না। শেক্সপিয়ারের নাটকের সব কাহিনীই অন্যের থেকে নেওয়া, কালিদাস রামায়ণ-মহাভারত থেকে ইচ্ছেমতন কাহিনী বেছে নিয়েছেন, এসব ছাপাখানার যুগের আগেকার কথা। তখন মুখে মুখে নানারকম কাহিনী ফিরত, রচয়িতা কিংবা মূল উৎসের কোনো ঠিক ছিল না। হাওয়া থেকে একটা কাহিনী ধরে নিয়ে অন্য লেখকরা তাতে রং চড়াতেন। সেটাই ছিল রীতি। একালে, ছাপার অক্ষরে যাঁর কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হবে, তিনিই মৌলিক স্রষ্টা, পরবর্তী কেউ সে কাহিনী ক্ষীণভাবে অবলম্বন করলেও তার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবেই পেয়ে থাকুন, 'আইভানহো'-র সঙ্গে এতখানি মিল কী করে

দেখা গেল, সে কারণও রহস্যাবৃত থাকে থাক, তবু দুর্গেশনন্দিনীকে মৌলিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ভারতীয় ভাষায় প্রথম মৌলিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী নয়। (আইভানহো এবং দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের তুলনামূলক বিচারে একটি কথা অবশ্য এখানে যোগ করা উচিত। স্কটের উপন্যাসটি ভাষাশিল্পে নিপুণ, কাহিনীর গতি ঊর্ধ্বশ্বাস হলেও শেষ পযর্ন্ত একটি সার্থক কিশোরপাঠ্য রচনা বলে মনে হয়। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা বেশ কাঁচা এবং কৃত্রিম, সবকটি চরিত্র ঠিকমতন দানা বাঁধেনি, তবু বঙ্কিমের উপন্যাসটি স্কটের তুলনায় যে যথেষ্ট অ্যাডাল্ট নভেল, তা অবশ্যই স্বীকার্য।)

শুধু কাহিনীতেই যে বিদেশি গন্ধ তা নয়। ওই উপন্যাসের রচনা-রীতিটিও যে ইংরেজি থেকে পুরোপুরি ধার করা, এমন অভিযোগও উঠেছিল। এদেশের সাহেবরাও বঙ্কিমের রচনার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল প্রথম থেকেই। ম্যাকমিলান্স ম্যাগাজিনে Cowell নামে এক অধ্যাপক লিখেছিলেন, "We think it is well worthy of some notice in England as the first attempt to transplant into India our own historical novel." কেউ কেউ এই উক্তিটিকে বঙ্কিম সম্পর্কে প্রশংসাসূচক হিসেবে গণ্য করেছেন বটে, কিন্তু transplant শব্দটি কি সম্মানজনক? ভারতীয় সাহিত্যের কোনো শিকড় নেই? ইংরেজি সাহিত্যে যেভাবে সেখানকার কাহিনী কাব্যগুলির অনুসরণে উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছিল, ভারতীয় ভাষাগুলিতেও সেইভাবেই উপন্যাসের আগমনে বাধা কোথায়?

এইসব মন্তব্য বঙ্কিমকে বিচলিত করেছিল নিশ্চিত। এর পরেই তিনি 'কপালকুণ্ডলা' রচনার সময় অনেক আঁটঘাঁট বেঁধে নিয়েছিলেন। জঙ্গলবাসী কাপালিক সন্ন্যাসীকে বঙ্কিম নিজে দেখেছিলেন। সভ্যতা-বহির্ভূত এক বালিকার কল্পনা তাঁর মাথায় এলেও তাকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় কিনা তা বারবার যাচাই করে নিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের কাছে। উপন্যাসটি লিখতে বসে সুষ্ঠু পরিচ্ছেদ বিভাগ করেছেন, সংস্কৃত-ইংরেজি-বাংলায় নানান উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজস্ব ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার রচনারীতির প্রায় আকাশ পাতাল তফাত, দুটি যে একই লেখকের রচনা তা বোঝাই শক্ত। এক বছরের মধ্যে বঙ্কিম অনেকখানি আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন, এবং প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই বোঝা যায়, তিনি নেহাত একটি কাহিনী রচনা করছেন না, তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছেন।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গুণাগুণ অন্য আলোচনার বিষয়। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন কোনো কোনো সমালোচক এই উপন্যাসের কোনো কোনো অংশের বর্ণনার সঙ্গে অনেক বিদেশি কবিদের রচনার অংশবিশেষের সঙ্গে মিল দেখাবার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু অনেকটাই কষ্টকল্পনা। এই উপন্যাসের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই হিসেবে, কপালকুণ্ডলাই প্রথম ভারতীয় ভাষায় পূর্ণাঙ্গ মৌলিক উপন্যাস।

বিষবৃক্ষ নয়, এবার প্রত্যাশা করি অমৃতফলের

বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ উপন্যাসটি সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সন্দর্শনেই যেন হাতে স্বর্গলাভের অনুভূতি হইল। *বঙ্গদর্শন* পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার সময়েই এই *বিষবৃক্ষ* পাঠে অপূর্ব রোমাঞ্চ ও শিহরন বোধ করিয়াছি, ব্যাকুল আগ্রহে পরবর্তী মাসের জন্য, নীড়মধ্যস্থ পক্ষিশাবক যেমনভাবে মাতার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনভাবেই অপেক্ষা করিতাম। বাংলাভাষার পাঠক হিসাবে আমরা সদ্যোজাত পক্ষিশাবক বই-কি! আহা, ভাষার কী প্রাণদায়িনী সুধা! বাংলাভাষা যে একই সঙ্গে কোমল ও সুদৃঢ়, ঝংকারময় এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ, লঘু চাপল্য ও প্রণয়ের ফিশফিশানি হইতে শুরু করিয়া গভীর তত্ত্বকথা, ধর্ম ও দর্শনের মর্মও যে এই ভাষাতে প্রকাশ করা যায়, তাহা আগে কে জানিত। একদিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অন্যদিকে ইংরাজিনবিশেরা এতকাল ক্ষীণকায়া বাংলাভাষার প্রতি কত না কটূক্তি ও বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু যেন সকলের গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। আইস, দেখ, বঙ্গভাষার কত শক্তি। ধন্য বঙ্কিমবাবু, আপনি আমাদের গর্বের সহিত মাথা তুলিয়া কথা বলিবার সুযোগ দিলেন, আপনার জননী এবং দেশজননী আজ সত্যই রত্নপ্রসূ। আপনি যেদিন ইংরাজি-কলম সরাইয়া রাখিয়া বাংলা উপন্যাসের জন্য লেখনী ধারণ করিলেন , সেই দিনটার কথা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে নিশ্চিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

বঙ্গদর্শন মাসিকে একবার পড়িয়াছি, পুস্তকটি পাইয়া *'বিষবৃক্ষ'* আরও দুইবার আহার নিদ্রা ভুলিয়া পাঠ করিলাম। এ উপন্যাস যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই নূতন বোধ হয়। প্রথমবার কাহিনির অত্যুৎকৃষ্ট বুননে ও চরিত্রগুলির ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরে মোহিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় পাঠে ভাষাসৌন্দর্য ও কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিলাম নূতনভাবে, কোনো কোনো স্থলে বর্ণনা যেন মৃত্তিকা হইতে গগন স্পর্শ করিয়াছে। দুই পাতা পড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, লেখককে শতকোটি প্রণাম জানাইয়া সেই পৃষ্ঠাগুলিই ফিরিয়া

পড়ি ও নতুন করিয়া মুগ্ধ হই। তৃতীয় পাঠে কাহিনির অন্তরালে যে বিষয়বস্তু ও লেখকের ভাব, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ খটকা জন্মিল। এই উপন্যাসে কি প্রণয়ের বিচিত্র লীলা এবং পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্কের জয়ের কথাই বর্ণিত হইয়াছে, না আরও কিছু আছে?

পূর্বের তিনখানি উপন্যাসই ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স, *কপালকুণ্ডলা*-তে তেমন ইতিহাস নাই বটে কিন্তু তাহা সমকালের কথা নহে, কিছুটা দূরত্বতাহাতে রহস্য সৃষ্টির সাহায্য করিয়াছে। '*বিষবৃক্ষ*'ই প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমবাবুর প্রথম সামাজিক উপন্যাস। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম, বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও তির্যকভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসঙ্গও আসিয়াছে। বোঝা গেল, বঙ্কিমবাবু ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তাদের প্রতি সদয় নহেন। সদ্য দাঁত ওঠা শিশুর মতন নব্য ইংরাজি শিক্ষিতের দলটি যখন আমাদের সমাজ, ধর্ম ও দেশাচারের উপর সর্বত্র দংশন করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং পাদরিরা তাহাদের খুব উৎসাহ দিতেছিল, তখন তাহাদের হস্ত হইতে আমাদের ঐতিহ্য ও তরুণ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য মহামতি রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। উচ্চশিক্ষিত, ধীমান, স্থিতপ্রজ্ঞ বঙ্কিমবাবুর নিকট সেই ব্রাহ্মদের সংস্কারবাদী আন্দোলন উপহাস-তব বিদ্রুপের বিষয় হইল! শুধু তাহাই নয়, *বিষবৃক্ষ*-র এক অতিশয় কুচরিত্র, মদ্যপ-লম্পট-পাপীকে তিনি ব্রাহ্মদের নেতা করিয়াছেন, এবং তাহার নাম দিয়েছেন দেবেন্দ্র! ইহাতে বড়োই মর্মপীড়া জন্মিল, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, বঙ্কিমবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বেচ্ছায় এই কালিমালিপ্ত চরিত্রের নাম রাখিয়াছেন একালের এক শ্রদ্ধেয় মহান ব্যক্তির নামে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার বিবাহ দিয়াছেন এবং সেই বিধবাকে মারিয়া উপন্যাস শেষ করিয়াছেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে এখনও প্রবল তর্কবিতর্ক হইতেছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমবাবু নিরপেক্ষদের দলে নন, বোঝা গেল স্পষ্টই তিনি ইহার বিপক্ষে। বিধবাবিবাহের কুফল দর্শানোই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য, প্রকৃতপক্ষে *বিষবৃক্ষ* প্রণয়ের কাহিনি নয়, প্রচারের কাহিনি। বঙ্কিমবাবু বিদ্বান এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, আমরা দুই চারিখানি স্বদেশি গ্রন্থ পড়িয়াছি মাত্র, তাহাতে দেখিয়াছি, আমাদের প্রাচীন কবি-নাট্যকার যেমন, তেমনই একালের উচ্চাঙ্গের বিদেশি গ্রন্থকারগণ সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। সকল চরিত্রের প্রতিই তাঁহাদের সহানুভূতি থাকে। কিন্তু *বিষবৃক্ষ*-তে পতিব্রতা সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া বহুরকম বিপদ ও ব্যাধিতে পড়িয়াও অলৌকিকভাবে বাঁচিয়া উঠিল, আর নিষ্পাপ, সরল কুন্দনন্দিনী মরিল প্রায় চোখের নিমেষে। এ যেন লেখক কর্তৃক এক অসহায় বালবিধবা হত্যা!

বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথার কুফলে আজ বাংলার ঘরে ঘরে বালবিধবার প্রাবল্য। এই নিরপরাধ ভগ্নী-কন্যারা স্বামী হারাইয়া সারা জীবন বঞ্চনা, অপমান, পুরুষের লালসার দৃষ্টি ও লাথি-ঝাঁটা খাইয়া মরে। এতকাল এইরূপই চলিতেছিল, এখন এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাহাদের দুঃখ মোচনে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়রা অতি প্রবল। জমিদারশ্রেণি এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজীরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নাকাল করিতে,

এমনকি তাঁহাকে প্রাণের ভয় দেখাইতেও কম চেষ্টা করেন নাই। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই একরোখা ব্রাহ্মণ কিছুতেই স্বমত হইতে বিচ্যুত হন নাই এবং শুধু কথায় বা যুক্তিতে নয়, কার্যেও বিধবাবিবাহ চালু করিতেছেন। আর বঙ্কিমবাবু তাঁহার বিপক্ষে গেলেন? শুনিয়াছি তিনি কোঁৎপন্থী বা পজিটিভিস্ট, অধিক সংখ্যক মনুষ্যের হিতসাধনই এই মতের মূল কথা। বঙ্কিমবাবু কি নারীজাতিকে ঠিক মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না? 'দাসী-মাগী-ছাগী' এইরূপ তিনি প্রায়শ লেখেন। এই উপন্যাসের কাহিনি কৌশলে সূর্যমুখীর উপরে পাঠকদের সহানুভূতি আসিবে, কারণ সে অধিকার-বঞ্চিতা, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তো কদাচ স্ত্রী বর্তমান রহিয়াছে এমন পুরুষের সহিত বিধবাবিবাহের কথা বলেন নাই! রমণীদের দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি কি বিধবাদের কখনও বিবাহিত অর্থবান ভোগী পুরুষদের লালসার খাদ্য হইতে দিতে পারেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইলেন? সূর্যমুখীর মুখ দিয়া তিনি বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলাইয়াছেন তাহাতে ক্ষোভ নাই, কারণ উহা অপমানিতা সূর্যমুখীর রাগের কথা, কিন্তু লেখক স্বয়ং লিপিচাতুর্যে বিধবাবিবাহের বিষময় পরিণাম দেখাইলেন!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালি জাতির সম্মুখে আজ আদর্শ তেজ ও দার্ঢ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি আমাদের নমস্য। বঙ্কিমবাবু বঙ্গসাহিত্যের ভগীরথ, তাঁহাকে লইয়া আমাদের গর্বের সীমা নাই। তাঁদের মতন বিদ্বান-বুদ্ধিমান-রসজ্ঞ ব্যক্তি যদি এমন সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীল না হইতেন, বরং তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী লইয়া বিদ্যাসাগরের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে আমাদের কিছু কিছু সমাজসংস্কার ত্বরান্বিত হইতে পারিত, আমরা বঙ্কিমবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অশ্রু বিসর্জন করিতাম। আশা করি, বঙ্কিমবাবু আমাদিগের মতন সামান্য পাঠকের অনুরোধ ভবিষ্যতে দুই একবার বিবেচনা করিবেন। *বিষবৃক্ষ* নয়, তাঁহার নিকট হইতে সত্যই নব নব অমৃত ফল প্রত্যাশা করি।

(*বিষবৃক্ষ*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩)

'শরৎচন্দ্র নয়, এঁরাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পুরোধা'

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব এবং সার্থকতা কী?

উত্তর : তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দেন। শরৎচন্দ্র নন, এই তিনজনই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পুরোধা পুরুষ।

প্রশ্ন : তিনজনের স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েও কে সমধিক উজ্জ্বল, কেন?

উত্তর : বলা শক্ত। আমি, ব্যক্তিগতভাবে, এক-এক সময় এঁদের এক-একজনের ভক্ত হয়েছি। ছাত্রবয়সে, মনে আছে, তারাশঙ্করের প্রতিটি নতুন রচনার জন্য আগ্রহী থাকতাম। কিছুকাল পরে বিভূতিভূষণের সব বই একটা-একটা করে পড়ে ফেলি। বলা বাহুল্য, পড়ে যে মুগ্ধতা, তার রেশ এখনও কাটেনি। তবে, সব মিলিয়ে নিজস্ব পক্ষপাত মানিকের প্রতিই। কেন-না, তিনজনের মধ্যে একমাত্র তিনিই নিজেকে বারবার বদলেছেন। বিশেষত, তাঁর ঈর্ষিত গদ্য! মৃত্যুর এত বছর পরও সে-গদ্যের ধার একটুও কমেনি। বিষয়ের দিক দিয়েও তিনি এখনও ভীষণ সমকালীন।

প্রশ্ন : এঁরা তিনজন কি বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী শিল্পী হয়ে গেছেন? হলে কেন?

উত্তর : এঁরা তিনজনই ৩০/৪০ দশকে তাঁদের প্রধান রচনাগুলি লিখেছেন। শতাব্দী প্রায় শেষ হয়ে এল। এখনও তো তাঁরা আমাদের আগ্রহ জাগান, অনুপ্রেরণা দেন। এও তো কম নয়! তবে, আগামী শতকেও টিকবেন হবেন কি না কে জানে!

প্রশ্ন : তিনজনের বিষয় এবং বিন্যাসের মধ্যে কাকে আপনি অধিক গুরুত্ব দেন, কেন?

উত্তর : তারাশঙ্করের রচনায় বিষয়বৈচিত্র্যই প্রধান। স্টাইলে তার কিঞ্চিৎ ঘাটতি ছিল। বিভূতিভূষণের বিষয়ের থেকেও তাঁর সারল্য, সহজ-সাবলীল গদ্য আমাকে টেনেছে। বলা যায়, এই সারল্যই তাঁর স্টাইল। ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে, লেখার মধ্যে স্টাইলটি কখনও প্রকট হয়ে উঠবে না, এই স্টাইলটি তিনি খুব যত্ন করে আয়ত্ত করেছিলেন। বিষয়বিন্যাস এবং স্টাইলে সবচেয়ে আধুনিক মানিক। শুধু কাহিনি বা চরিত্র নয়, মানুষের মনের গহন জটিলতার অন্তস্থলে ডুব-মারাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষকে তিনি প্রবল নিরাসক্ত চোখে দেখতেন। আর তাঁর ভাষা! চাঁছাছোলা, ঝকঝকে। অবিশ্যি শেষ-জীবনে তিনি সমাজের নীচুতলার মানুষজনকে নিয়ে, শ্রেণিসংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়ে বেশ-কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তার অনেকগুলিই তত সার্থক হয়নি। তবুও কেবল লেখার গুণেই সেগুলিও আমার প্রিয়।

প্রশ্ন : তিনজনের তিনটি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস?

উত্তর : তারাশঙ্করের *কবি* পড়েছি বহুবার। *গণদেবতা* বা *পঞ্চগ্রাম*-এর মতো উপন্যাসগুলিকে যেন একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়। শেষের দিকের উপন্যাসের মধ্যে *আরোগ্য নিকেতন* বিষয়বৈচিত্র্যে এখনও স্মরণীয়। কিন্তু *কবি* উপন্যাসের বসন চরিত্রটির জন্যই যেন উপন্যাসটি আমার এখনও খুব প্রিয়। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পগুলির কথাই বেশি মনে পড়ে। উপন্যাসে *পথের পাঁচালি*-র প্রভাব কাটবার নয়। তবে, *অনুবর্তন*, উপন্যাসটি, তুলনায় অপরিচিত হলেও, উল্লেখযোগ্য। *পথের পাঁচালির* প্রথম অনেকটাই রোমান্টিক ধরনের। সে-তুলনায় *অনুবর্তন*-এর গ্রামে প্রকৃত রূঢ় বাস্তবের ছবি আছে। নানাকারণে *কেদার রাজা* উপন্যাসটিও উল্লেখযোগ্য।

মানিকের প্রথম উপন্যাস *জননী* সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী উপন্যাস। *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা *অহিংসা*-র মতো টানটান উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। তবে, আমার সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি*। বাস্তবতার সঙ্গে ফ্যান্টাসির এরকম সংমিশ্রণ আগে কোনো বাংলা উপন্যাসে দেখিনি।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ চরিত্র প্রিয় এবং সার্থক?

উত্তর : তারাশঙ্করের বসন; বিভূতিভূষণের নিশ্চয়ই অপু; মানিকের হোসেন মিয়া।

প্রশ্ন : তিনজনই কি বিশেষ ধরনের (টাইপড্) লেখক? তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম, মানিকের জটিল মনস্তত্ত্ব কি তাঁদের বিশেষ-চিহ্নিত করেনি?

উত্তর : দ্যাখো, এভাবে দেখা ঠিক নয় বোধহয়। অধিকাংশ লেখকই নিজস্ব একটি ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যে বিচরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এঁরাও বস্তুত, তাই-ই

করেছেন। এতে আশ্চর্যের কী আছে! তবে এর মধ্যেও মানিকের ক্ষেত্রটি ছিল অনেক বিস্তৃত : নদীর জীবন থেকে শহরের বস্তি পর্যন্ত।

প্রশ্ন : বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাস কি একটু বেশি কাব্যিক প্রায় রূপকথাধর্মী?
উত্তর : বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে কাব্যিক ও রূপকথাধর্মী। এবং সেখানেই তাঁর সাফল্য। মাঝে মাঝে তিনি খুব রিয়েলিস্টিক হতে গেছেন, যেমন ধর, *অথৈ জলে* উপন্যাসে। কিন্তু তেমন সার্থক হতে পারেননি।

প্রশ্ন : তারাশঙ্করের উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর যে টান, সহানুভূতি, তাকে আপনি কী চোখে দেখেন? তারাশঙ্করই কি প্রথম অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে সাহিত্যের উপজীব্য করেন সার্থকভাবে?
উত্তর : তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ট্র্যাজিক দিকটি ফুটিয়েছেন। এটা আসলে ট্র্যাজেডির প্রতি সহানুভূতি। না, অন্ত্যজদের নিয়ে তারাশঙ্করের আগেও লেখা হয়েছে। তবে পটভূমি আলাদা। তারাশঙ্করের চরিত্রগুলিতে কিছু অতি-নাটকীয়তা আছে। বাউরি, সাঁওতাল, ডোম ইত্যাদি অনেক চরিত্রই অতি-নাটকীয়তার জন্যেই মনে দাগ কাটে।

প্রশ্ন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্রাত্য নরনারীর অন্ধকার জীবনযাপন, অন্ধকার মনস্তত্ত্ব কি সার্থক প্রতিফলিত? তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলি অপেক্ষা মানিকের চরিত্রগুলি কি অধিক বাস্তবোচিত?
উত্তর : সাহিত্যে 'ব্রাত্য নরনারী' বলে কিছু নেই। গরিব বা অবহেলিত মানুষজন নিয়ে তিনজনই লিখেছেন। তবে তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই আলাদা। কিন্তু কেউই অসার্থক নন।

প্রশ্ন : তারাশঙ্গর, বিভূতিভূষণ বা মানিকের কোনো সার্থক উত্তরাধিকার বাংলা সাহিত্যে আছে? আপনি কোনো প্রভাব টের পান? নিজস্ব লেখালেখিতে?
উত্তর : একালের বাংলা সাহিত্যে এই তিন প্রধানের প্রভাব অবশ্যই আছে। তবে গদ্যশৈলীতে আরও বেশি ঝকঝকে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁদের প্রভাবও কম নয়। ... আমার ওপর প্রভাবের কথা আমি কী করে বলব! অন্যেরা বলতে পারেন।

প্রশ্ন : এঁদের কোনো প্রাসঙ্গিকতা এখনও আছে?
উত্তর : অবশ্যই আছে। পাঠকদের কাছে তো বটেই, যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখতে চান, তাঁদেরও অবশ্যপাঠ্য।

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে তিনজনের কারও কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল? কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি?

উত্তর : মানিককে *পরিচয়* পত্রিকার অফিসে মাত্র একবার দেখেছি। কোনো কথা হয়নি। দ্বিতীয়বার দেখি, একটি খাটে, ফুল দিয়ে সাজানো। বিভূতিভূষণকে কখনও দেখিনি। আর তারাশঙ্করকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। একবারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হয়েছিল কী, তখন সাহিত্য অকাদেমি থেকে তাঁর *কবি* উপন্যাসটি সবকটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাকে অনুরোধ করা হয় তার ভূমিকা লিখতে। চিঠি পেয়ে আমি তো স্তম্ভিত! আমার বয়েস তখন তারাশঙ্করের ঠিক অর্ধেক। তিনি ভারতবিখ্যাত লেখক, আর আমি একজন সামান্য বাংলা ভাষার কবি। স্বভাবতই এ ধরনের অনুরোধ-রক্ষা আমার কাছে স্পর্ধার শামিল। তো, আমি চিঠিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। চিঠি পড়ে তিনি প্রবল হাসলেন। বললেন, ওরা বোধহয় চায় ছেলেছোকরারা আমার লেখা কী চোখে দেখে, তা জানতে।... তা তুমি লেখো, তোমার যা-খুশি। সেদিন প্রায় ২/৩ ঘণ্টা নানা কথা হয়েছিল। আমার মতো এক অখ্যাত তরুণকে তিনি হেলাফেলা করেননি।... সেদিন তিনি তাঁর হাতে অসংখ্য পোড়া দাগ দেখিয়েছিলেন। আসলে, সে-সময় তিনি সিগারেট ছাড়তে চাইছিলেন। অভ্যাসবশত, ভুল করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেই, তৎক্ষণাৎ সেটা নিজের হাতে ছেঁকা দিয়ে নেভাতেন! দেখে শিহরিত হয়েছিলাম।

(সাক্ষাৎকার : গৌতম ঘোষদস্তিদার)

ছোটোগল্প প্রসঙ্গ

কবিতার পত্রিকার তুলনায় গল্পের পত্রিকা অনেক কম। তার কারণ এই নয় যে গদ্য রচনা সম্পর্কে তরুণদের আগ্রহ কমে গেছে। গল্পের পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যয়বহুল। কবিতার পত্রিকা যত্রতত্র থেকে বেরোয় বলে অকবিই এখন কবিতা লেখে এবং ছাপায়, অথচ অনেক প্রতিশ্রুতিবান গল্পলেখক আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। কবিতা লেখা একটা ফ্যাশন, গল্প এত লেখা অনেকটা সংগ্রামের মতন। চতুর্দিকে যখন প্রভূতসংখ্যক কবিতা-লেখক দেখি, তখন মনে হয় এদের মধ্যে অধিকাংশই পরিশ্রমবিমুখ। গল্প লিখতে গেলে অন্তত হাতের পরিশ্রম বেশি হয়। কবিতা লেখাও যে একটা কঠিন কাজ, সে-কথা তাঁরা ভুলে যান।

বড়ো বড়ো পত্রপত্রিকাগুলিতে ছোটোগল্পের অনাদর কমে গেছে— এটা একটা সুবিদিত ঘটনা। কিন্তু এ নিয়ে হা-হুতাশ কিংবা রাগারাগি করা নিরর্থক। কাগজ চালিয়ে যাঁরা বাণিজ্য করেন তাঁরা পাঠকদের রুচির প্রতি লক্ষ রাখবেনই! বেশির ভাগ পাঠকেরই যদি ছোটোগল্পের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, তাহলে পত্রপত্রিকাতে ছোটোগল্প কম ছাপা হবে, এটাও তো স্বাভাবিক। লাইব্রেরিতে গিয়ে পাঠকরা বলে, টুকরো টুকরো গল্পের বই দেবেন না, টানা গল্পের বই দিন। পাঠকদের মতিগতি জোর করে ফেরানো যায় না। পাঠকদের ওপর কোনো ধরনের বই জোর করে চাপাতে গেলে তার ফল ভালো হয় না। যেসব দেশ সেরকম চেষ্টা করেছে, সেসব দেশের সাহিত্যেরই প্রায় বারোটা বেজে গেছে।

যেসব পত্রপত্রিকা পাঠকদের নিয়ে বাণিজ্য করে, অনেক লেখকের রাগ থাকে সেই সব পত্রপত্রিকার ওপরে। এইসব পত্রপত্রিকার চলতি নাম এস্টাবলিশমেন্ট। এই এস্টাবলিশমেন্টের বহু অদৃশ্য তরল হাত বহুদিকে ছড়িয়ে আছে। যখন তখন এক একজনকে খপ করে ধরো, অপর পক্ষে, ওইসব লেখকরাও ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কারণ, প্রত্যেক লেখকই চায়, তার লেখা বেশি প্রচারিত কাগজে ছাপা হোক। অনেকের মধ্যে নিজের চিন্তা ছড়িয়ে দেবার বাসনা লেখক কিংবা মহাপুরুষ সকলেরই

পক্ষে স্বাভাবিক। যাই হোক একজন লেখক যখন সেই অদৃশ্য তরল হাতে ধরা পড়ে, অন্যরা তখন খুব দুয়ো দেয়। তারপর তাদের মধ্য থেকে আরও কেউ কেউ ধরা দেবার জন্য এগিয়ে যায়। লিট্‌ল ম্যাগাজিনে যারা এস্টাবলিশমেন্টকে গালাগালি দেয়, তারাই ওইসব বড়ো পত্রিকা থেকে ডাক পেলে এগিয়ে যায় হুড়মুড়িয়ে। সকলের মনে মনে একই ইচ্ছা, কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার করবে না। কারণ বাঙালিরা স্বভাবতই আত্মপ্রবঞ্চক। এ পর্যন্ত এমন একজনকেও দেখিনি, যে ডাক পাওয়া সত্ত্বেও যায়নি। কারুর কারুর দু-এক বছর দেরি হয় মাত্র। আমাদের সমসাময়িক একজন লেখক একবার লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তিনি দেশ *আনন্দবাজার*-এ আর কখনও লিখবেন না। তারপর এই আট দশ বছরে এ-দেশের কিংবা ওই পত্রিকাদ্বয়ের অবস্থা বিশেষ কিছুই বদলায়নি, কিন্তু সেই লেখক ওই পত্রপত্রিকায় লেখক হিসেবে ফিরে এসেছেন। এরকম উদাহরণ অনেক। আমি এতে দোষের কিছু দেখি না। তবে ভণ্ডামি জিনিসটা খারাপ।

ছোটোগল্প জিনিসটা বড়ো বড়ো পত্রপত্রিকা ছেড়ে এখন মূলত ছোটো সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতেই আশ্রয় নিয়েছে। এর জন্য অনেককেই রাগারাগি করতে দেখি এখন। যেন, উপন্যাস জিনিসটা খুব খারাপ আর ছোটোগল্প একটা পবিত্র ব্যাপার। এর মানে আমি বুঝি না। ছোটোগল্প তো সাহিত্যের অনেকগুলি শাখার মধ্যে একটি মাত্র। কোনো সাহিত্যের কোনো একটি শাখা যদি দুর্বল হয়, তাতে এমন কী ক্ষতি? ফরাসি সাহিত্যে নাটকের তুলনায় উপন্যাস দুর্বল, তাতে কী? আমাদের বহুলপ্রচারিত বাংলা পত্রপত্রিকায় নাটক প্রায় ছাপাই হয় না, তার জন্য তো কান্নাকাটি শুনিনি? ঔপন্যাসিকেরা কেন নাটক লিখছেন না, সেরকম দাবিও তোলেন না কেউ। কেন নাটকও কি সাহিত্যের একটা শাখা নয়? নাটক আছে সাহিত্যের আদিকাল থেকে, কবিতার সহোদর সে, সেই তুলনায় ছোটোগল্প তো কালকের ছেলে। নীতিকথা নিশ্চয়ই ছোটোগল্প নয়।

যাই হোক, আমাদের বাংলা সাহিত্যে একসময় ছোটোগল্প রচনায় একটা জোয়ার এসেছিল। বড়ো বড়ো লেখকরা ছোটোগল্প রচনায় সাংঘাতিক দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তারপর জোয়ার অন্যদিকে সরে গেছে। ইচ্ছেমতন সেই জোয়ারকে আবার উলটোদিকে ফেরানো যায় না। বস্তুত, সারা পৃথিবীতেই এখন ছোটোগল্পের সমাদর কম। বহুকাল কোনো একখানি ছোটোগল্পের বই সম্পর্কে কোনো হইচই শোনা যায়নি। অল্প বয়েসে হেমিংওয়ে ছোটোগল্প লিখেই নাম করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ছোটোগল্প আর লিখতেই চাইতেন না। পরিণত জীবনে তাঁকে একটি পত্রিকা থেকে একটি ছোটোগল্প রচনার জন্য দশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব হয়েছিল। সেটা লিখতে লিখতে তিনি সেটাকে একটি বিরাট উপন্যাসে পরিণত করে ফেললেন। সার্ত্র-ও এককালে চমৎকার ছোটোগল্প লিখেছিলেন, ইদানিংকালে তাঁর একটাও নতুন ছোটোগল্পের কথা শুনিনি। কিছু নতুন লেখক নিশ্চয়ই ছোটোগল্প লিখছেন বিদেশে, সকলের খবর রাখি না।

নতুন গদ্যলেখকরা, যাঁরা উপন্যাস লিখতে শুরু করেননি, তাঁরাই ছোটোগল্প দিয়ে চর্চা শুরু করেন। তাঁদের সমস্তখানি মনঃসংযোগ ও নিষ্ঠা ওই একটি ছোটো রচনার মধ্যে পড়ে বলে এক-একটি ছোটোগল্প সাংঘাতিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেইজন্য লিট্‌ল ম্যাগাজিনে ছোটোগল্প পড়তে এখনও খুব আগ্রহ বোধ করি।

বিমল করের 'নতুন রীতি'র পর 'এই দশক'-গোষ্ঠী আলাদাভাবে শুধু ছোটোগল্প নিয়েই একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। গোড়ার দিকে তাদের স্লোগান যত উগ্র ছিল, রচনা তত ধারালো ছিল না। আস্তে আস্তে তাঁরা পরিণতির দিকে এগিয়েছেন। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন শক্তিশালী গল্পকারকে আমরা পেয়েছি। যেমন রমানাথ রায়, বলরাম বসাক, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, অমল চন্দ, কল্যাণ সেন প্রমুখ। এরা কেউ কেউ উপন্যাস লিখেছেন বা লিখতে শুরু করেছেন। তবু ছোটোগল্পের দিকে এখনও এঁদের ঝোঁকটা বেশি রয়ে গেছে।

আন্দোলনের বাইরে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেকের গল্প দেখে চমকে উঠেছি অনেক বার। যেমন সমীর রক্ষিত বা সমরেশ মজুমদারের বেলায়। সুনীল দাশ এখানে-সেখানে ভালো গল্প লেখেন, রাগী গল্প লেখেন সুবিমল মিশ্র। স্নিগ্ধ অথচ বুদ্ধি-উজ্জ্বল গল্প লেখেন ভাস্বতী রায়চৌধুরী এবং বরুণ চৌধুরী। রাধানাথ মণ্ডল নামে একজন সদ্য নতুন লেখকের গল্পও চমকপ্রদ। আরও অনেকের গল্প ভালো লাগে, কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক নামগুলি মনে পড়ে না। দরকারের সময় অনেক কথাই ভুলে যাই যে!

যতদিন বাংলায় লিট্‌ল ম্যাগাজিন থাকবে, ততদিন ছোটোগল্পও লেখা হতে থাকবে। এটাই যা আশার কথা।

আমার মতে

ছোটোগল্পের একটা সংকটসময় যাচ্ছে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে। এই নিয়ে আক্ষেপ ও আলাপ-আলোচনাও চলছে বেশ কয়েক বছর। সদ্য তরুণ যাঁরা লেখা শুরু করছেন তাঁদের মধ্যেও গল্পলেখকের চেয়ে কবির সংখ্যা বহুগুণ বেশি। এর কারণ কী? অথচ বাংলা সাহিত্য ছোটোগল্পকে নিয়ে খুব উঁচু গর্ব করতে পারে। রবীন্দ্র-পরবর্তী লেখকরা ছোটোগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের পর্দায় তুলে এনেছেন। ঠিক মহাযুদ্ধ-পরবর্তী লেখকবৃন্দ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু প্রমুখ ছোটোগল্পের জন্যই বেশি বিখ্যাত। তারপর ছোটোগল্পের গৌরবের দিন যেন হঠাৎ অন্তর্হিত হতে শুরু করল আর সদর্পে আবির্ভাব হল উপন্যাসের। যা ঠিক উপন্যাসও নয়, দেড়শো-দুশো পাতার কাহিনিগ্রন্থ। মুখের ভাষার মতো সাহিত্যও কোনো নিয়মের নিগড়ে থাকতে চায় না। এখনকার সাহিত্য কেন আগেকার মতো নয় এরকম হা-হুতাশ অর্থহীন। এখন যা লেখা হচ্ছে হয়তো সেরকম লেখাই বাংলা সাহিত্যের এইসময়কার নিয়তিতে ছিল। এ কথাটাই খুব সোজাসুজি বলেছিলেন টি এস এলিয়ট, 'এভরি জেনারেশান গেটস দা লিটারেচার ইট ডিসার্ভস'!

সাহিত্যে এক এক সময় একদিকে জোয়ার আসে। সেইদিক থেকে সারা পৃথিবীতেই এখন ছোটোগল্পের এলাকায় একটা ভাটার টান এসেছে মনে হয়। এই শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্তই যেন ছিল ছোটোগল্পের স্বর্ণযুগ। তারপর মল্লযুদ্ধে, নিছক শারীরিক শক্তিতেই উপন্যাস হারিয়ে দিয়েছে ছোটোগল্পকে। অনেক লেখক ছোটোগল্পে একদম হাত না ছুঁইয়েই সরাসরি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। হেমিংওয়ে ছিলেন ছোটোগল্পের মাস্টার, কিন্তু শেষ জীবনে আর ছোটোগল্প লিখলেন কটা? তার জীবনীতে পড়েছি, একবার একটি পত্রিকা তাঁকে দশ হাজার ডলার পারিশ্রমিকে একটি ছোটোগল্প লিখে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু লিখতে লিখতে হেমিংওয়ে সেটিকে একটি পঁচাত্তর হাজার ডলার দামি উপন্যাসে পরিণত করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছু অত্যাশ্চর্য ছোটোগল্প লিখেছিলেন,

তারপর ভুলে ছিলেন এই শাখাটির কথা। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি আবার তিনটি গল্প লিখলেন বটে, কিন্তু তাতে ছোটোগল্পের চরিত্রলক্ষণ নেই, আগেকার সেই কবিত্বময় লাবণ্যও অনুপস্থিত।

বাংলা সাহিত্যে এই জোয়ারভাটার ব্যাপারটি গত তিন-চার দশকে বেশ স্পষ্ট অনুভব করা গেছে। একসময় কবিতার খুবই হেনস্থা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর আর কারুর কবিতা পড়ার দরকার নেই, এরকম কথা অনেকে প্রকাশ্যে বলেছেন। অনেক কবিই তখন প্রকাশক পেতেন না। অথচ ছোটোগল্পের জন্য প্রকাশকের অভাব নেই। মানিক-তারাশঙ্কর-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার যখন তরুণ লেখক, তখনই তাঁদের পরপর ছোটোগল্পের বই বেরুচ্ছে। এখন আবার স্রোত ঘুরে গেছে। এখন দৈন্যদশা অনেকটা ঘুচেছে কবিতার, আর ছোটোগল্প কোণঠাসা হয়ে আশ্রয় নিয়েছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনে।

অথচ হিন্দি ও মারাঠি ভাষায় ছোটোগল্পের প্রতি উৎসাহ এখনো প্রবল। একটাও উপন্যাস লেখেননি, অথচ ছ-সাতখানা ছোটোগল্পের বই লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন এক মারাঠি লেখিকার সঙ্গে আলাপ হল সেদিন। হিন্দি ভাষাতেও এমন দু-একজন লেখকের কথা শুনেছি। বাংলায় এরকমটি যেন এখন আর ভাবাই যায় না। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, খুব কম বাংলা উপন্যাসই মহৎ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে, অধিকাংশই ছোটোগল্পকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো করা। সেই তুলনায় খাঁটি ছোটোগল্পে বাংলাভাষা যথেষ্ট ধনী। এখনও ছোটোখাটো পত্রপত্রিকায় কোনো কোনো নতুন লেখকের ছোটোগল্পের ঔজ্জ্বল্য আমাকে মুগ্ধ ও চমকিত করে। যদিও, হায় তার যথেষ্ট সমাদর নেই। কে না জানে, লেখক চায় আদর, তাতে তার অহংকারে সুড়সুড়ি লাগে, আরও তেজ আসে তার লেখায়। আর আদর না পেলে, লেখক হয়ে যায় তিক্ত, বিরক্ত ও তেঁড়েটে, সে যাকে তাকে গালাগালি করতে শুরু করে তখন। তাতে তার সৃষ্টিক্ষমতা আরও নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা ট্র্যাজেডি। অনবরত অনাদর পেয়েও নিছক অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যসাধনা করে যাওয়ার ধারণা স্কুলপাঠ্য রচনায় মানায়। যে যা পারে, সে তাই লেখে। তাদের মধ্যে কেউ ভবিষ্যৎকালেও টিকে থাকে কেউ থাকে না। সাধনা-ফাধনা বাজে কথা।

ছোটোগল্পের সাম্প্রতিক অনাদরের কারণ খুঁজতে গেলে একটা চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারণগুলি হাত ধরাধরি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে। বৃহৎ পত্রপত্রিকাগুলিতে উপন্যাসেরই আধিপত্য, পাঠকের রুচিও ঘুরে গেছে সেইদিকে, ফলে প্রকাশকরাও ছোটোগল্পের চেয়ে উপন্যাস ছাপতে বেশি আগ্রহী। ছোটোগল্পের বই ছাপা হলেও তার বিজ্ঞাপন খুব মলিন। অনেক সময় ছোটোগল্পের বইকে একটা উপন্যাসের ছদ্মবেশ দেওয়ারও চেষ্টা হয়। সূচিপত্রে আলাদা গল্পের নাম উল্লেখও থাকে না। হালকা উপন্যাসের রমরমার প্রতিবাদে ছোটোগল্প কয়েকবার বিভিন্ন আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছে।

ক্রিয়ার চেয়ে প্রতিক্রিয়া অনেকসময় তীব্র হয়। উপন্যাসে যেহেতু কাহিনির প্রাধান্য, তাই নতুন ছোটোগল্পে কাহিনিকে একেবারেই বাদ দেওয়ার চেষ্টা হল। ফলে কাহিনিখাদক পাঠকরা ঝাঁক বেঁধে দূরে সরে গেলেন। পাঠক-প্রিয় নয় বলে সেইসব নতুন আঙ্গিকের ছোটোগল্পও বড়ো বড়ো পত্রপত্রিকা বা প্রকাশকদের আকৃষ্ট করল না। এখন এ যা দাঁড়িয়েছে, ছোটোগল্প যেন শুধু নতুন লেখকদের হাত পাকানোর মাধ্যম। একটু স্বীকৃতি পেলেই তাঁরা উপন্যাসের অথবা উপন্যাসোপম জগতে চলে যান। কোনো নামজাদা সম্পাদক একজন লেখকের কাছে উপন্যাস চাইলেন, আর সেই লেখক বললেন, না আমি উপন্যাস লিখব না, ছোটোগল্পই লিখব—এরকম ঘটনা ইদানীংকালে একবারও ঘটেছে বলে শুনিনি।

ছোটোগল্পে কোনো কাহিনি থাকবে না, এটাও খুব একটা সঠিক ইস্তাহার নয়। কাহিনি অর্থাৎ প্লট সম্পর্কে ধারণা অনেক বদলে গেছে। ছোটোগল্পের মধ্যগগনে কাহিনির উল্লম্ফন আর শেষে একটা চমক—এ নিয়ে যাঁরা লিখতে চান লিখুন। কাহিনিকে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করার চেষ্টাও হয়েছে অনেকবার। একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে একলা হাঁটছে— এ নিয়েও গল্প লিখতে পারেন যে-কেউ। কিন্তু সব গল্পই এরকম হতে পারে না।

উপন্যাস বা কবিতার মতনই ছোটোগল্প যে সাহিত্যের আলাদা একটা শাখা, পাঠকের এই চেতনাই আস্তে আস্তে অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে। ছোটোগল্পের মধ্যে শুধু কাহিনির জটিলতার রস বা কবিতার শব্দঝংকার আশা করা উচিত নয়। ছোটোগল্প মানুষের জীবনের টুকরো অংশ বা অনুভূতির গদ্যরূপ, এই বিষয়ে বিশুদ্ধ আলোচনার এবং পাঠকদের সচেতন করার কাজ তেমন কিছু হয়নি। এখন শুরু করলে মন্দ হয় না। আমার তো মনে হয়, বাঙালি জীবন উপন্যাসের চেয়ে ছোটোগল্পের পক্ষেই বেশি উপযুক্ত। কোনোরকম আপস নয়, ছোটোগল্পকে দাঁড়াতে হবে পূর্ণ সম্মান নিয়ে। উপন্যাস না লিখে যিনি শুধু ছোটোগল্প লিখলেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাকেও সম্যক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা উচিত। বাংলা সাহিত্যের জন্য অনেকগুলি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ছোটোগল্পের জন্য একটাও নেই। রবীন্দ্র-পুরস্কার কমিটি বা সাহিত্য অকাদেমি বহুকাল যাবৎ ছোটোগল্প সংগ্রহকে পাত্তা দেননি।

বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র

আমি প্রথম *দন কিহোতে (Don Quixote)* পড়ি কিশোর বয়েসে। পুরো উপন্যাসটি নয়, কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বলাই বাহুল্য, তাতে উপন্যাসটির জটিল আঙ্গিক অনেক সরল করা হয়েছিল। আমি তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি, আমি পড়েছি একটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি হিসেবে। কৈশোর তো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়ারই বয়েস। কিন্তু আরও অন্যান্য অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়া সত্ত্বেও দন কিহোতে চরিত্রটি আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে যায়। তখন আমরা *রামায়ণ* ও *মহাভারত* পড়ি, সংক্ষিপ্ত আকারে *ইলিয়াড* এবং *ওডিসি*-ও পড়া হয়ে যায়, রাজস্থানের বীরপুরুষদের কাহিনি আমাদের মুগ্ধ করে। তবু বহু গুণান্বিত সব নায়কদের বদলে আমার কাছে রোল মডেল হয়ে ওঠে ওই দন কিহোতে। তার কারণ বোধহয়, রিয়েলিজম-এর চেয়ে ফ্যান্টাসির প্রতি বেশি আকর্ষণ। রিয়েলিজম কিছুদিনের মধ্যেই মলিন হয়ে যায়, আর ফ্যান্টাসি বহুরূপীর মতন অনবরত নিজেকে বদলায়।

সেই বয়েসে আমি নির্জন কোনো জায়গায় কল্পনায় নাইট সাজতাম, হাতে একটা লম্বা লাঠিই বর্শা, আর ঘোড়ার অভাবে মুখ দিয়ে ঘোড়া ছোটানোর শব্দ করলেই হয়। উইন্ডমিল আমাদের এদিকে নেই, কিন্তু কোনো পরিত্যক্ত কারখানা কিংবা মাঠের মধ্যে এক গুচ্ছ বড়ো বড়ো গাছকে অনায়াসেই কোনো দুর্গ হিসেবে কল্পনা করে নেওয়া যায়, এমনকি আকাশের মেঘেও দুর্গ দেখা যায় সেই বয়েসে।

অল্প বয়েসে যেসব ক্লাসিক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়েছি, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মূল গ্রন্থগুলি পড়ে নেওয়ার ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। চার্লস ল্যাম-এর টেলস ফ্রম শেকসপিয়র পড়ার পরই তো শেকসপিয়রের মূল রচনা একে একে পড়তে শুরু করি। কিন্তু *দন কিহোতে* আমার মনে দাগ কেটে রাখলেও সেরভান্তেস (Cervantes)-এর মূল গ্রন্থটি আমি অনেক দিন সংগ্রহ করতে পারিনি। তা ছাড়া ব্রিটিশ কলোনির মানুষ হিসেবে আমাদের ইংরেজি বই-ই পড়তে হয়েছে বেশি, ইংল্যান্ডের ইতিহাস বা ইংরেজি সাহিত্যের

ইতিহাস জানতে হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে। দেশ স্বাধীন হবার পরেও ইংরেজির প্রভাব হয়েছে আরও ব্যাপক। ইউরোপের অন্যান্য প্রধান ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল যৎসামান্য। একসময়ে ইংরেজির প্রভাবকে অস্বীকার করার জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ ফরাসি ভাষার চর্চা শুরু করেন, শিক্ষিত সমাজে ফরাসি জানা অনেকটা ফ্যাশনেব্‌ল হয়ে দাঁড়ায়। এঁদের লেখালেখির ফলে ফরাসি সাহিত্যের দ্বার আমাদের কাছে কিছুটা উন্মোচিত হয়। এমনকি মূল ফরাসি না জেনেও রাসিন, মলিয়ের, ভিক্তর হুগো, বদলেয়ার, র‍্যাঁবো প্রমুখের নাম কফি হাউসের তরুণ লেখকদের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে, কিন্তু স্প্যানিশ সাহিত্য এদিকে প্রায় কিছুই পৌঁছয়নি। সারা বিশ্বের তৃতীয় প্রধান ভাষা হওয়া সত্ত্বেও স্প্যানিশ সাহিত্যের প্রভাব ভারতে প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। স্প্যানিশ সাহিত্য প্রাচ্যে আসেনি, বরং বেশি ছড়িয়েছে আরও পশ্চিমে, ব্রাজিল-বর্জিত সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায়।

সেরভান্তেসের সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ইংরেজি অনুবাদে আমার হাতে আসে আমার তিরিশ বছর বয়েসে। সেসময় আমি আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে বই সংগ্রহ করা যেমন সহজ, পড়াশোনা করার সময়ও যথেষ্ট। সেই অসাধারণ গ্রন্থের উপক্রমণিকা (Prologue) এবং কয়েকটি অধ্যায় পড়তে পড়তেই আমার দারুণ আফসোস হয়, কেন এই লেখা আমি আগে পড়িনি! তাহলে হয়তো জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই অন্যরকম হয়ে যেতে পারত।

অবশ্য ততদিনে আধুনিক কালের কিছু কিছু স্প্যানিশ কবি আমাদের কাছে পরিচিত। লোরকা এবং নেরুদা সারা বিশ্বেই তরুণ কবিদের কাছে আদর্শ। লোরকার মৃত্যু-স্মরণে আমি একটি কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি বা লেখকদের রচনা পাঠের একটা ঝোঁক থাকেই। সেই সূত্রে জেনেছি হিমেনেথকে। হিমেনেথ যখন ওই পুরস্কার পান, তখন একজন সমালোচক লিখেছিলেন যে এই নোবেল পুরস্কার শুধু হিমেনেথের নয়, আসলে এ পুরস্কার মিলিতভাবে তিনজনের, হিমেনেথ, আনতোনিয় মাচাদো এবং লোরকার, কেন না শেষোক্ত দুজন তখন বেঁচে ছিলেন না, নইলে তাঁদের দুজনের ওই পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্য ছিল। তখন আমি মাচাদো-র কবিতাও খুঁজে খুঁজে পড়েছি। কিন্তু এর আগের কয়েক শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। *দন কিহোতে*-র অন্যতম অনুবাদক জে. এম. কোহেন তাঁর ভূমিকাতেও বলেছেন যে, মধ্যযুগীয় স্প্যানিশ সাহিত্যের অনেক ঐশ্বর্য থাকলেও অন্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে খুবই কম, অনুবাদ করা কঠিন বলেই। একমাত্র সেরভান্তেস-এর বইটিই যেন সমগ্র স্প্যানিশ সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে এই মহাগ্রন্থ সমান জনপ্রিয়।

লেখকের পুরো নাম মিগেল দে সেরভান্তেস সাভেদ্রা (Miguel De Cervantes Saavedra), বইটির নাম *দ্য আডভেঞ্চারস অফ দন কিহোতে*। বইটি দুটি খণ্ডে ভাগ

করা, প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৬০৫ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ পায় লেখকের মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৬১৫ সালে। উপক্রমণিকাতে লেখক একটি উক্তি করেছেন। যা একই সঙ্গে মজার এবং রহস্যময়। তিনি বলছেন, কোনো ব্যক্তির একটি কুরূপ এবং অবোধ সন্তান আছে, কিন্তু সে পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে ছেলেটির কোনো দোষই দেখতে পায় না, বরং সে যা-কিছুই করে তাই-ই মনে করে প্রতিভা ও সৌন্দর্যের লক্ষণ, আর বন্ধুদের কাছে ছেলের গুণপনা করে বেড়ায়। তেমনই, যদিও সবার মনে হতে পারে যে আমি এই কাহিনির জনক, আসলে আমি এর পালক পিতা, তবু একালের রীতিনীতি মেনে, প্রায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার এই সন্তানটির দোষত্রুটি বা অজ্ঞতা ক্ষমা করার অনুরোধ জানাব না। আপনারা, হে পাঠক, স্বাধীনভাবে এর সমালোচনা করতে পারেন। রহস্যটি হচ্ছে, একজন লেখক তাঁর গ্রন্থকাহিনির পালক পিতা হল কী করে? উপন্যাসটির দুটি খণ্ডেই এই রহস্যটি রয়ে গেছে।

উপক্রমণিকায় সেরভান্তেস আরও জানিয়েছেন যে, গ্রন্থটি রচিত হয়েছে এক জেলখানার দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে। এটা অবশ্য সত্য। সেরভান্তেসের জীবন বেশ ঘটনাবহুল। তিনি জন্মেছেন মাদ্রিদ থেকে কিছুটা দূরে আলকালা দে এনারেস (Alcala de Henares) নামে একটা ছোট্ট শহরে ১৫৪৭ সালে। তাঁর জীবৎকালটাকে বলা যায় একই সঙ্গে স্পেনের স্বর্ণযুগ এবং সেই স্বর্ণযুগ থেকে পতনের কাল। নতুন এক মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখান থেকে আসছে সোনা আর রুপো, আরও প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য পাবার সম্ভাবনার নানান কাহিনিতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা হামলা চালাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকায় আজটেকদের রাজ্যে। শুধু সম্পদ নয়, নতুন মহাদেশ থেকে ইউরোপে আসছে ভুট্টা, টম্যাটো, তামাক এবং চকোলেটের মতন নতুন দ্রব্য। আবার এই সময়েই ইউরোপের অনেকখানি অংশ জুড়ে চলে যুদ্ধবিগ্রহ, তুর্কিরা আক্রমণ করে বারবার, নিজেদের মধ্যে চলেছে ধর্মযুদ্ধ। মার্টিন লুথার এসে ক্রিশ্চিয়ান জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন, পোপের একাধিপত্য অস্বীকার করে এবং গির্জার সংস্কারের দাবিতে মাথাচাড়া দিল প্রোটেস্টান্টিজম। স্পেন গভীরভাবে ক্যাথলিক, ওদিকে ইংল্যান্ড মেনে নিয়েছে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম। ইংল্যান্ডকে শিক্ষা দেবার জন্য যুদ্ধাভিযানে প্রবৃত্ত হল স্পেন, তার আর্মাডা নামে নৌবাহিনী তখন অপরাজেয় হিসেবে জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেই আর্মাডার ভরাডুবি হল।

যুদ্ধবিগ্রহের ফলে স্পেনের অভ্যন্তরে দরিদ্র মানুষরা হল দরিদ্রতর, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্যবৃদ্ধি আঘাত হানল মধ্যবিত্তদেরও, জমি হারিয়ে ভূমিহীন কৃষকরা এসে ভিড় করতে লাগল শহরে। সামাজিক পরিবেশ অশান্ত ও উদ্বেল।

সেরভান্তেস বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। সম্ভবত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগও তিনি পাননি, তার বদলে যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে। তিনি

ঘোর ক্যাথলিক এবং দেশপ্রেমী, তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত পান তাঁর বাঁ হাতে। সেজন্য তিনি সেনাপতি দন হুয়ানের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পান এবং আবার ফিরে যান যুদ্ধক্ষেত্রে।

একবার দেশে ফেরার সময়ে বন্দি হন জলদস্যুদের হাতে। টানা পাঁচ বছর তাঁকে কাটাতে হয় আলজিরিয়ায় মুসলমানদের গারদে। কয়েকবার পালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্রত্যেকবার ধরা পড়ার পর তাঁকে নির্যাতনও সইতে হয় যথেষ্ট। ১৫৮০ সালে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করা হয় তাঁকে।

এই বন্দিদশায় সেরভান্তেস তাঁর মহাগ্রন্থটি শুরু করতে পারেননি। সম্ভবত সেখানে লেখা-পড়া করার সুযোগও ছিল না। তবে এই কারাবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী রচনায় অবশ্যই কাজে লেগেছিল। এরপর বেশ কয়েক বছর তাঁকে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়। একসময় ট্যাক্স কালেক্টরের চাকরি নিতেও বাধ্য হন, কিছুদিন আন্দালুসিয়া অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীও হয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধে করতে পারেননি। স্পেনে তখন সব জিনিসপত্রেরই দাম ঊর্ধ্বমুখী, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে পড়ছে। তখনও স্বপ্নের হাতছানি দিচ্ছে নব-আবিষ্কৃত মহাদেশ, সেখানে সর্বত্রই যেন সোনা ছড়িয়ে আছে। সেরভান্তেসেরও খুব ইচ্ছে হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দিয়ে সেখানেই স্থায়ী হওয়া। তিনি গোয়াতেমালা (Guatemala) রাজ্যে একটি চাকরির জন্য অনেক দরবার করেছিলেন সরকারের কাছে। যদি তাঁর সেই আবেদন গ্রাহ্য হত, যদি তিনি চলে যেতেন দক্ষিণ আমেরিকায়, তাহলে হয়তো তিনি দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতেন, কিন্তু তারপরেও কি তিনি ওই মহাগ্রন্থ রচনা করতেন ? তাঁর আর্থিক সাফল্যে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারত বিশ্বসাহিত্যের।

সেরভান্তেস গোয়াতেমালায় চাকরি তো পেলেনই না, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তিনি সেভিলের (Sevilla) রাজকীয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। সেখানেই শুরু হল *দন কিহোতে*-র কাহিনি রচনা। তিনি এর আগেও কিছু নাটক ও কবিতা লিখেছেন, কিন্তু এই রচনার সঙ্গে আর কোনো কিছুই তুলনীয় নয়। এবং দন কিহোতে নামে এক দিব্যোন্মাদ নাইটের এই অভিযান-কাহিনি মধ্যযুগের অন্যান্য সব অভিযান-কাহিনিকেই একেবারে নস্যাৎ করে দেয়। এই রচনার স্বাদ একেবারে অভিনব। এই নাইটের চরিত্র একই সঙ্গে কমিক এবং ট্র্যাজিক, বিশ্বসাহিত্যে এর আর কোনো তুলনা নেই।

সেরভান্তেস যখন এই উপন্যাসটি রচনা করেন, তখনও ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাস ঠিকমতন দানা বাঁধেনি। পরবর্তীকালে ইংরেজি উপন্যাস অনেক উচ্চস্তরে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু সেই লেখকরা কেউই ফ্যান্টাসি কিংবা পরাবাস্তবতার (abstraction) দিকে ঝোঁকেননি। ইংরেজি উপন্যাস বড়ো বেশি বাস্তব, যার চূড়ান্ত নিদর্শন চার্লস ডিকেন্সের রচনাগুলি। ফ্যান্টাসি বা অবাস্তব কল্পনা ইংরেজদের চরিত্রেই নেই। তারা সবসময় নিপুণভাবে

হিসেব কষে, এবং তাদের সেই হিসেব অঙ্কের মতন নির্ভুল হয়। এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে কলম্বাস যেমন ভারতের সন্ধানে নৌকো ভাসিয়ে ভুল করে পৌঁছে গেলেন সম্পূর্ণ উলটোদিকের আমেরিকায়, ইংরেজদের পক্ষে সেরকম ভুল করা সম্ভবই নয়। ভারত সন্ধানে বেরিয়ে তারা ঠিক ঠিক ভারতেই পৌঁছেছে।

স্পেনের মধ্য স্বর্ণযুগে একপ্রকার উপন্যাসের খুব প্রসার হয়েছিল, সেই প্রকারকে বলে পিকারেস্ক (Picaresque) নভেল। স্প্যানিশ ভাষায় পিকারোস (Picaros) মানে রাসকেল। অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলি ইতরজনের অভিযান-কাহিনি, যার সবকিছুই ঘটে উন্মুক্ত স্থানে এবং অনবরত যাত্রাপথে। সেরভান্তেসের কাহিনিও এই ধারাতেই রচিত, শুরুতেই আমরা দেখতে পাই লা মাঞ্চা (La Mancha) অঞ্চলের এক মধ্যবয়স্ক লোক নিজেকে মনে করে নাইট এবং জীবনের সার্থকতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পথে। কিন্তু পিকারেস্ক উপন্যাস বড়ো বেশি বাস্তবসম্মত। তাতে নানান সামাজিক দুর্নীতি এবং অবক্ষয় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা থাকে। আর সেরভান্তেসের নায়ক কল্পনা আর বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলেন সবসময়, তাই উইন্ডমিলকে মনে করেন দুর্গ, বেশ্যাদের মনে করেন রাজকুমারী, অনেক ধনী, ক্ষমতাশালী মানুষদের মন করেন দুর্বৃত্ত। কোথাও কোথাও থাকে সূক্ষ্ম বিদ্রুপ, আবার তা ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও চলে। সব মিলিয়ে মনে হয় এক উদ্ভট পাগলামির জগৎ। আবার এই পাগলটিকে ভালো না বেসেও পারা যায় না।

এই উপন্যাসের আঙ্গিকটিও বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গেই পালক পিতার প্রশ্নটি আসে। লেখক এক এক জায়গায় বলছেন, মূল কাহিনিটি তাঁর নিজস্ব নয়। একজন আরব লেখক, তাঁর নাম সিদি হামিদ বেনেনগালি (Sidi Hamid Benengali), প্রথম দন কিহোতের জীবনী-উপন্যাস রচনা করেন। সেটির অনুবাদ হয় স্প্যানিশ ভাষায়। সেই অনুবাদ পড়েই সেরভান্তেস এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। সেরভান্তেস এ কথাও জানিয়েছেন, অনুবাদটি সর্বত্র সঠিক হয়নি, আর মূল কাহিনিতেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যভ্রান্তি আছে, তিনি সেগুলি সংশোধন করে দিয়েছেন। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে, তাহলে এই নাইটের চরিত্রটি কি কাল্পনিক নয়, একজন বাস্তব ইতিহাসসম্মত পুরুষ? অনুবাদকের নাম অবশ্য সেরভান্তেস কোথাও জানাননি। তিনি বুঝলেন কী করে যে অনুবাদে ভুল আছে, তিনি কি মূল আরবি গ্রন্থটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন? তিনি আরবি ভাষা জানতেন?

অতি কষ্টে একসময় পাঠক বুঝতে পারে যে এর পুরোটাই সেরভান্তেসের কল্পনা। সিদি হামিদ বেনেনগালি নামে কোনো আরবি লেখক নেই, আরবি ভাষায় দন কিহোতের কোনো জীবনী-উপন্যাস লেখা হয়নি, সুতরাং অনুবাদের প্রশ্নই ওঠে না এবং এই কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সংস্রবই নেই। তবু কেন সেরভান্তেস পাঠকদের এই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, তা রহস্যই থেকে গেছে।

এই উপন্যাসটির আঙ্গিককে কোনো সমালোচক বলেছেন Metafictive। গ্রিক

ভাষায় Meta শব্দটির অর্থ আবার, অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাস, তার মধ্যে আবার উপন্যাস, আবার। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেরভান্তেস নামে একজন লেখকের রচনায় সেরভান্তেস নামে একজন কথকের চরিত্র রয়েছে, তার মধ্যে এসে গেছে বেনেনগালি নামে আর-একটি কাল্পনিক লেখকের কথা এবং আর-একজন নামহীন অনুবাদক। অনেকটা যেন আমাদের *মহাভারত*-এর মতন। *মহাভারত*-এর কাহিনি আমরা পাই সৌতি নামে একজন পেশাদার কথকের বর্ণনায়। সেই সৌতি আবার সে-কাহিনি শুনেছে বৈশম্পায়ন নামে এক ঋষির মুখে, আবার মূল যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন সঞ্জয়, আবার এই মহাগ্রন্থের লেখকের নাম ব্যাস হলেও তিনি নিজেও একটি চরিত্র, এবং স্বনামে তিনি মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছেন মূল কাহিনির মধ্যে। অনেকটা সেরভান্তেসেরই মতন। তবে সেরভান্তেস নিশ্চয়ই মহাভারত পড়েননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নসম্ভার পৌঁছয়নি পশ্চিমি জগতে।

১৬০৫ সালে প্রকাশিত হয় *দন কিহোতে*-র প্রথম খণ্ড। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায়, প্রথম বছরেই ছাপা হয় ছটি সংস্করণ। অনূদিত হতে থাকে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায়। ইংরেজিতে প্রায় সমসময়েই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন শেলটন (Shelton), তারপর থেকে অন্তত আট-নটি পৃথক অনুবাদভাষ্য বেরিয়েছে ইংরেজিতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপন্যাসটি সমান জনপ্রিয়। পৃথিবীতে এমন কোনো শিক্ষিত মানুষ নেই, যিনি মূল গ্রন্থটি না পড়লেও দন কিহোতে চরিত্রটির কথা জানেন না। পৃথিবীর বহু লেখকের রচনায় এই উপন্যাসের প্রভাব আছে। এককভাবে একটি কাল্পনিক চরিত্রের এরকম জনপ্রিয়তা আর কারও নেই। স্যাঁৎ বভ (Saint-Beauve) বলেছেন, এই গ্রন্থ মানবতার বাইবেল। কবি উনামুনো (Unamuno) ঠিকই বলেছেন, আমাদের লর্ড D Q ফ্রান্‌ৎস কাফকা (Frantz Kafka)-র আগেই একজন কাফকান। কারণ, কাফকা যাকে বলেছেন অবিনশ্বর, এঁর পাগলামি এসেছে এই বিশ্বাস থেকে।

উপন্যাসটির সার্থকতা দেখে প্রলোভিত হয়ে একজন অসৎ লেখক তাড়াতাড়ি এই কাহিনির একটি দ্বিতীয় খণ্ড লিখে বাজারে ছেড়ে দেয়। সে যুগেও এরকম কারবার হত। আমাদের দেশে *রামায়ণ-মহাভারত*-এ, এমনকি কালিদাসের কাব্যেও অনেক লেখক যুগ যুগ ধরে নিজেদের কিছু কিছু রচনা জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ নিজেদের নাম জাহির করেননি, খ্যাতির অংশ চাননি, বরং তাঁদের নাম জানাই যায় না, শুধু ভাষা ব্যবহারের কিছু কিছু তফাত দেখে আলাদা আলাদা লেখকের স্পর্শ চিহ্নিত করা যায়। সেরভান্তেসের লেখার যিনি নকল করেছেন তাঁর নাম অবশ্য জানা যায়, আলোনসো ফের্নান্দেস দে আভেইয়ান্দা (Alonzo Fernández de Avellanda)। বলাই বাহুল্য এই লেখকের রচনা খুব দুর্বল, শুধু তাই নয়, এর মধ্যে সেরভান্তেস সম্পর্কে নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপ আছে, তাঁকে বলা হয়েছে এক খিটখিটে বুড়ো, বাঁ হাত ভাঙা, তাঁর বন্ধুটন্ধু কেউ নেই।

ক্রোধে, ক্ষোভে জ্বলে উঠে সেরভান্তেস নিজেই আবার লিখতে লাগলেন দ্বিতীয় খণ্ডে নতুন অভিযান-কাহিনি। মজার ব্যাপার এই, বর্ণনায় মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে দন কিহোতে তাঁর জীবনকাহিনি নিয়ে সেরভান্তেসের লেখা বইটি পড়েছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের নকল জীবনীটিও তাঁর জানা আছে। আরও কিছু কিছু চরিত্র সেরভান্তেস ও আভেইয়ান্দা, দুজনের লেখার কথাই জানে। প্রথম পাঠের সময় একসময় সন্দেহ হয় যে এটাও সেরভান্তেসের এটা নতুন আঙ্গিকের কৌশল নয় তো? আভেইয়ান্দা নামে সত্যিই কি কেউ আছে, নাকি সেও প্রথম ভাগের সেই আরব লেখকের মতন কাল্পনিক? সে সন্দেহ অবশ্য অমূলক, ওই নামের একজন লেখক সত্যিই সেরভান্তেসের খ্যাতির ভাগ নিতে চেয়েছিল, বইও প্রকাশ করেছিল। আভেইয়ান্দার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য, তিনি ওই বাজে বইটি লিখে না ছাপালে সেরভান্তেস তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডটি হয়তো লিখতেনই না। দ্বিতীয় খণ্ডটির সাহিত্যগুণ আরও বেশি।

মৃত্যুর এক বছর আগে সেরভান্তেস ১৬১৫ সালে প্রকাশ করেন দ্বিতীয় খণ্ড। আমৃত্যু তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি।

শেকসপিয়র আর সেরভান্তেসের মৃত্যু হয় একই দিনে। এর মধ্যে কোনো তাৎপর্য খোঁজার দরকার নেই, এমনই কাকতালীয় ঘটনা। নিশ্চয়ই এঁরা কেউ কারও রচনা কিংবা অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু আমরা এ যুগে এই দুজনেরই রচনাতে এখনও মুগ্ধ, একই দিনে এই দুই দিকপালের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার কথা জানলে এক বিচিত্র অনুভূতি হয়ই!

বহু যুগের ওপারে

কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে বাধ্য হয়েছিলুম। তখন মনে হয়েছিল, সাধারণ গল্প-উপন্যাসের বদলে কিছু কঠিন বই এই সুযোগে পড়ে ফেলা যাক। সারাদিন শুয়ে থাকতে বাধ্য, না পড়ে তো উপায় নেই!

প্রথমে ধরলুম রবার্ট গ্রেভ্সের *আই, ক্লডিয়াস*। দশ-বারো বছর আগে এই বইটি পড়তে শুরু করে ষাট-সত্তর পাতার পর আর ধৈর্য রাখতে পারিনি। এবার শেষ করা গেল।

কবি রবার্ট গ্রেভ্স প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপটেন হয়েছিলেন, যুদ্ধশেষে ইংরেজির অধ্যাপক, তারপর বেশ কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে বাংলায় যা বোঝায় তাঁর লেখা তার থেকে একেবারেই আলাদা। বলা যায়, তিনি ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করেছেন। এ কাজ বড়ো শক্ত।

জুলিয়াস সিজার খুন হয়েছেন ব্রুটাসের হাতে, তারপর মার্ক অ্যান্টনি ও অকটাভিয়াস কিছুদিন মিলেমিশে থাকার পর আবার যুদ্ধ। নবাব খুব জখমের পর শেষপর্যন্ত সম্রাট হলেন অগাস্টাস (আগে যাঁর নাম ছিল অকটাভিয়ান)। সেই বংশেরই সন্তান ক্লডিয়াস, জন্ম থেকেই পঙ্গু এবং তোতলা, চেহারায় ও ব্যবহারে রাজকুমার নামের অযোগ্য। কিন্তু এই শারীরিকভাবে অক্ষম ছেলেটির মস্তিষ্কটি কিন্তু খুব সাফ, মেধা ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ লেখাপড়ার চর্চা ও ইতিহাসের উত্থানপতনের পর্যবেক্ষণ করাই যার কাজ। রোমান সম্রাটদের চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব হল নিজেদের উত্তরাধিকারীদের খুঁজে খুঁজে খুন করা। প্রাপ্তবয়স্করা তো যখন তখন মরতে পারেই, বালিকা ও শিশুদেরও নিষ্কৃতি নেই। রোমানদের মধ্যে এক-বিবাহ চালু থাকলেও পত্নী বদল যখন তখন। এইসব খুনোখুনি ও লাম্পট্যের কাহিনি বর্ণনা করেছেন এক কবি, অথচ কোথাও একটুও রগরগে ভাব নেই, অতি ধীর স্থিরভাবে একটির পর একটি মাসের ইতিহাস বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি, তার মধ্যে এই সবই যেন অতি সাধারণ ঘটনা। ক্লডিয়াসের জীবনেও ঝুঁকি এসেছে অনেকবার, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তাঁর প্রধান অস্ত্র হল আরও বেশি পঙ্গু, আরও বেশি তোতলা ও বোকা সেজে থাকা। রাজপরিবারের এক অকিঞ্চিৎকর সদস্য। যার প্রতি কেউ মনোযোগ দেয় না। অথচ,

ইতিহাসের যে-কোনো সাধারণ পাঠকমাত্রই জানে যে অত্যাচারী সম্রাট ক্যালিগুলার অল্পস্থায়ী রাজত্বের পর রোমের সম্রাট হয়েছিলেন ক্লডিয়াস নামে একজন। কিন্তু এই বইটির শেষ পৃষ্ঠার আগে পর্যন্ত বোঝা যায় না যে এত বড়ো দুঃসাহসী, হঠকারী, বীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে থেকে এই শারীরিকভাবে অক্ষম এবং দুর্বল ক্লডিয়াস, নিজের প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যে-কোনো ষড়যন্ত্রে পর্যন্ত অংশ নেয়নি, সে কী করে অত বড়ো রাজত্বের সম্রাট হবে। খুদে খুদে অক্ষরের চারশো পৃষ্ঠার বইটিতে সম্পূর্ণ ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই যে পাঠকদের আগ্রহকে ধরে রাখা, এ এক সাংঘাতিক কৃতিত্ব।

আমি এই বইটির কথা লিখলুম এই জন্য যে, বাঙালি পাঠকরা যদি এইরকম বই পড়ে, তাহলে ক্রমশ এক জাতের পাঠক তৈরি হবে। তখন বাংলাতেও এইরকম উচ্চাঙ্গের ইতিহাস-নির্ভর বই লেখা হতে পারবে।

দ্বিতীয় বইটি যেমনই চমকপ্রদ, তেমনই মজার। এটি একটি চিঠির সংকলন। একজনই সব চিঠি লিখেছেন। বইটির নাম *দা লেটার্স অফ দা ইয়াংগার প্লিনি*। প্লিনি নামে আর-একজন ছিলেন, যাঁর ভাগনে এবং দত্তকপুত্র এই ছোটো প্লিনি। ইনিও রোমান, পেশায় আইনজীবী। ইনি নানা লোককে চিঠি লিখতেন এবং নিজেই ঠিক করে গিয়েছিলেন, চিঠিগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করে যাবেন— তখনকার দিনে প্রকাশ বলতে যা বোঝাত আর কী! এই প্লিনির সময় হচ্ছে সম্রাট ক্লডিয়াসের আমলের কিছুদিন পরেই, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী। অর্থাৎ দুটি বইতে ধারাবাহিকতা আছে।

প্লিনির বইখানিকে পত্র-সাহিত্যের আদি দৃষ্টান্ত বলা যায়। কী গুছিয়ে, যত্ন করে লেখা! পড়তে পড়তে এটাই প্রথমে মনে হয় যে, তাহলে তো এই দুহাজার বছরে মানুষের মনের গঠনের বিশেষ কোনো পরিবর্তনই হয়নি। প্লিনি স্বচক্ষে ভিসুভিয়াসের অগ্নি উদ্‌গিরণের দৃশ্য দেখেছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক তথ্যে বইখানি সমৃদ্ধ। আমি শুধু একালের পাঠকদের কৌতুকের জন্য একটা চিঠির উল্লেখ করছি।

প্লিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখছেন, এ বছর কবিরা খুব সংখ্যায় বেড়েছে। এই এপ্রিল মাসে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও কবিতা পাঠের আসর থাকে। সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হচ্ছে, তাতে আমি খুশি এবং নতুন নতুন প্রতিভাও দেখা দিচ্ছে। কিন্তু শ্রোতারা বড়োই অমনোযোগী। অনেকেই এসে এক জায়গায় জড়ো হয় বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে গল্প করে...। অনেকেই ঠিক সময়ে আসে না... কবিতা পাঠায় মাঝখানে কিংবা শেষের দিকে গটগটিয়ে ঢোকে। বেশিক্ষণ বসে থাকবার ধৈর্যও নেই অনেকের, কেউ কেউ শেষ হবার আগেই উঠে চলে যায়, কেউ সরে পড়ে চুপিচুপি, কেউ কেউ বা নির্লজ্জের মতন সামনে দিয়েই বেরিয়ে যায়...। অথচ লোকে বলে সম্রাট ক্লডিয়াসের আমলে লোকের কবিতা ও সাহিত্য পাঠের প্রতি কত আগ্রহ ছিল... নিজেরাই কবিদের কত প্রশ্ন করত, বাহবা দিত...।

মনে হয় না, একালেরই কোনো কবি সম্মেলনের বর্ণনা, হুবহু!

মাসিক *প্রগতি*/জুন ১৯৮১

দুটি উপন্যাস : দুই মেরু

হিন্দি লেখকদের মধ্যে অনেকেই পদবি বর্জন করেন। প্রথাটি ভালো। পদবি নিয়েই তো যত জাতপাতের ঝামেলা। হিন্দিতে কেউ কেউ কোনো ছদ্মনামের আড়ালে আসল নামটি চাপা দিয়ে রাখেন। যেমন প্রেমচাঁদ। বাংলায় এই প্রথা নেই। রবীন্দ্রনাথ একসময় শখ করে ভানুসিংহ হয়েছিলেন, তা মাত্রই কিছুদিনের জন্য। যেমন প্রমথ চৌধুরী হয়েছিলেন বীরবল, কিন্তু তাঁর আসল নাম চাপা থাকেনি। বাংলায় এরকম শখের ছদ্মনামের লম্বা তালিকা করা যায় বটে, তবে খুব সম্ভবত বনফুল-ই তাঁর সব রচনা ছদ্মনামেই লিখেছেন। হয়তো তাঁর বিহারের প্রবাসজীবন তাঁকে এই ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিল।

হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত লেখক কমলেশ্বরের পদবি কী, তা তাঁর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার অধিকাংশই জানে না। তিনি নিজেও কি সবসময় মনে রাখেন? এ বিষয়ে একটা মজার ঘটনা তিনি আমাকে বলেছিলেন এক এয়ারপোর্টে বসে, আমরা দুজনে সেবার একত্রে চিন সফরে গিয়েছিলাম। তার কিছুদিন আগে, কমলেশ্বর কোনো এক বিদেশি বিমানবন্দরে একা বসেছিলেন পরবর্তী ফ্লাইটের অপেক্ষায়। হঠাৎ একসময় মাইকে ঘোষণা শুনলেন, মিস্টার সাকসেনা, আপনি অবিলম্বে এসে অমুক কাউন্টারে দেখা করুন! তিনি আমল দিলেন না, কাকে না কাকে ডাকছে, তিনি কাগজ পড়ায় মন দিলেন। আরও কয়েকবার সেই একই ঘোষণা শোনার পর তাঁর খেয়াল হল, পাসপোর্টে বা টিকিটে তো শুধু কমলেশ্বর রাখলে চলে না, পদবি লিখতেই হয়, তবে কি এই সাকসেনা তিনি নিজে? হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন নির্দিষ্ট কাউন্টারের দিকে।

কমলেশ্বর যেমন জনপ্রিয়, তেমনই বহুপ্রসূ লেখক। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা উনিশ। তার মধ্যে স্থান পেয়েছে সাড়ে তিনশো ছোটোগল্প। উপন্যাস লিখেছেন পনেরোটি। অন্যান্য-বিষয়ক গ্রন্থসংখ্যা পঁচিশ। দূরদর্শনে এবং চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান অনতিক্রমণীয়। বহু জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের তিনি স্রষ্টা এবং একশোটি হিন্দি চলচ্চিত্রের তিনি কাহিনিকার অথবা চিত্রনাট্যকার।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন, যথেষ্ট পরিণত বয়সে, তাঁর *কিতনে পাকিস্তান* উপন্যাসের জন্য। এই উপন্যাস তাঁর অন্যান্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা। ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এই উপন্যাসটি লেখার সময় আগাগোড়া তাঁর মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছিল, এটা যেন তাঁর প্রথম লেখা!

এরকম অনুভূতি তখনই হতে পারে, যখন কোনো অভিজ্ঞ লেখক চেনা পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ কোনো নতুন আঙ্গিকে কিছু রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। এবং বস্তুতই এ উপন্যাস এক নতুন আঙ্গিকে লেখা, এতে কাহিনির ধারাবাহিকতা নেই, অনেকটা জাদুবাস্তবতার নিরিখে স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী নিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনো নায়ক বা মহানায়ক নেই, লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী মহাকাল বা সময়ই এ আখ্যানে নায়ক, মহানায়ক বা খলনায়ক।

বলাই বাহুল্য, *কিতনে পাকিস্তান* নিছক পাকিস্তান সৃষ্টি কিংবা পাকিস্তান সম্পর্কিত কাহিনি নয়। যাকে আমরা সভ্যতা বলি, তার অনেকখানিই যে অসভ্যতা, হিংসা, ক্রোধ, যুদ্ধের বর্বরতা, অন্ধ কুসংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাসের নামে নরহত্যা, নারী নির্যাতন, নারীত্বের চরম অপমান ইত্যাদি চলে আসছে, মানুষ যখন দু'পায়ে ভর দিয়ে, শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটতে শেখে, তখন থেকেই। বুড়ো আঙুলের ব্যবহার শিখে মানুষ যখন থেকে বাসস্থান গড়তে শিখেছে, তখন থেকেই আবার বুড়ো আঙুলের ব্যবহার শিখে অস্ত্রধারণ করে উন্মত্ত হত্যালীলাতেও মেতে উঠেছে। মানুষেরই সৃষ্টি করা দেবতা ও দানবরাও এই ব্যাপারে কেউ কারও থেকে কম নয়। আবার সেই আদিকাল থেকেই এক প্রতিবাদী শক্তিও কাজ করে চলেছে। শত অত্যাচার সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, এমনকি দেবতাদেরও বিরুদ্ধে। এঁরাই মনুষ্য জাতিকে দিয়েছে মানবতার সন্ধান।

অনেক দেশেরই পুরাকাহিনিতে আছে যে, মানুষকে অধিক শক্তিমান হতে দেখে আকাশের দেবতারা শঙ্কিত হয়ে কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী মানুষকে দমন করতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

যেমন, সুমেরু সভ্যতার এক সম্রাট গিলগামেস ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি পীড়ার সঙ্গে যুঝব, যাতনা সইব, যেভাবেই হোক, মৃত্যুকে আমি পরাস্ত করব, আমি মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ওষধি খুঁজে নিয়ে আসব।'

এই ঘোষণায় দেবতাদের মধ্যে মহা কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। মানুষের এই স্পর্ধা দেবতাদের কাছে অসহ্য। দেবতারা সবাই অমর, আর মানুষকে পদানত করে রাখার জন্য দেবতাদের প্রধান অস্ত্রই হল, মানুষের অবধারিত মৃত্যুদণ্ড! সুতরাং মৃত্যুকে জয় করার অভিলাষী গিলগামেসকে শেষ করে দেবার সবরকম চেষ্টা শুরু করলেন তাঁরা।

তবু মানুষের সেই অমরত্বের সাধনা আজও চলছে। সাম্প্রতিককালে প্রাক্তন ভারতবর্ষের

দুটি খণ্ড, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে পারস্পরিক অসূয়া, অবিশ্বাস এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে চরম নির্বুদ্ধিতায়, তার খণ্ড খণ্ড চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসে এমন দেশভাগ, অকারণ যুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ জীবনের বিপর্যয় আরও বহুবার, বহু দেশে ঘটেছে। আবার একটা শুভশুক্তিও নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে।

এই বর্ণনায় যেমন আছে অনেক মর্মন্তুদ দৃশ্য ও ঘটনাবলি, তেমনই আছে প্রেম ও মানুষের পাশে মানুষেরই মতন দাঁড়াবার জন্য ব্যাকুলতা। বহু শ্রুতকীর্তি সন্ত, পরিব্রাজক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও লেখকেরা জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করেছেন এই উপাখ্যানমালায়, তাঁরা কথাও বলেছেন।

বহু স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে দুটি দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানান দুঃসময়ের ইঙ্গিত দিয়ে ঝড়জল, বজ্রবিদ্যুৎ, কালবৈশাখী শুরু হয়। সেইরকমই এক দুর্যোগের দিনে এক কৃশকায় ব্যক্তি একজন লেখকের কাছে এসে সামান্য একটা জিনিস প্রার্থনা করল। তাঁর চোখের জল।

লেখক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমার চোখের জল নিয়ে আপনার কী হবে?

বৃদ্ধ বললেন, আমি মানুষের পবিত্র চোখের জল অঞ্জলি ভরে নিয়ে যাই। সেই চোখের জল অধ্যয়ন করি, তার সন্তাপ, দুঃখ, যাতনা এবং পীড়ার উষ্ণতাগুলো চেনার চেষ্টা করি...।

এই গবেষণার ফল কী হয়? যা-কিছু উত্তর পাওয়া যায়, তাও কেউ শোনে না। মানতেও চায় না। তবু সেই বৃদ্ধ যুগ যুগ ধরে জমা করে যাচ্ছেন বহু মানুষের চোখের জল। তৈরি হয়েছে এক অশ্রুসাগর।

কাহিনির একেবারে শেষে আমরা দেখতে পাই সন্ত কবীরকে। ততদিনে ভারতের পোখরানে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ হয়ে গেছে। আর পাকিস্তানও তার দেখাদেখি একই রকম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে চগাইয়ের পার্বত্য এলাকায়।

অন্ধ কবীর কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলেছেন পোখরানের দিকে। পূর্বোক্ত লেখক বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকাতেই কবির তাঁর প্রশ্ন অনুমান করে বললেন, কিছু উন্মাদ লোক জুটেছে যারা পোখরানে শক্তিশালী পীঠ স্থাপন করতে চাইছে। বিস্ফোরণের বিষাক্ত ছাই বিভূতির মতন বিলোতে চাইছে... তুমি কাগজে দেখনি... এসব সেই ধর্মান্ধ উন্মাদের মুখাবয়ব, যারা বছর কয়েক আগে সোমনাথ থেকে রথযাত্রায় বেরিয়েছিল... তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল...

কিন্তু তুমি তো, মানে আমি বলতে চাইছি...

চোখে দেখি না, তাই তো?... কিন্তু দৃষ্টিহীন বলেই আমি সবকিছু পরিষ্কার দেখে ফেলি...

তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে? তুমি একা কী করতে পারবে? মানে, আমি বলতে চাইছি, তোমার ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী?

ওখানে গিয়ে আমি গাছ লাগাব।

গাছ?

হ্যাঁ। বোধিবৃক্ষ... আমার এই ঝুলিতে তারই চারা আছে। বোধিবৃক্ষের শিকড় নীলকণ্ঠের মতো সমস্ত বিষ টেনে নেয়... প্রথম বোধিবৃক্ষটা পুঁতব পোখরানে, তারপর সীমান্ত পেরিয়ে অন্য গাছটা পুঁতব চগাইয়ের পার্বত্য এলাকায়...

উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে সন্ত কবীরের সেই একক পদযাত্রায়।

ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সার্থক রচনাগুলি বাংলায় অনুবাদ হয় কম, এরকম অভিযোগ আছে অনেকের, সুখের বিষয়, কমলেশ্বরের এই উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদ এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। অনুবাদক কালীপদ দাস হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষাতেই দক্ষ, তিনি হিন্দিতে মৌলিক গল্প লিখে পুরস্কার পেয়েছেন, আবার হিন্দি থেকে বাংলাতেও অনুবাদ করেছেন একাধিক গ্রন্থ এবং দীর্ঘকাল সম্পাদনা করছেন মাসিক অনুবাদ পত্রিকা।

দ্বিতীয় বইটিও একটি অনুবাদ।

আমরা বেশির ভাগই ফরাসি, জার্মান ও রুশ সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ পড়ি। পৃথিবীতে আরও কত ভাষা আছে, কোথাও মহৎ কিছু রচিত হলেও ইংরেজি অনুবাদের দাক্ষিণ্য না পেলে তা আমাদের গোচরে আসে না।

সেইজন্যই চিনের মতো এমন বিশাল ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ কিংবা জাপানের মতো বাণিজ্য-শিল্প ও সংস্কৃতিতে এত উন্নত দেশের সাহিত্যসম্ভার সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। মধ্যপ্রাচ্য এবং আরব দেশগুলির সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞই বলা যায়।

তবে অকস্মাৎ এই দেশগুলির কোনো একজন লেখক নোবেল পুরস্কৃত হলে তাঁর লেখা পাঠ করার একটা ঝোঁক আসে। এই কারণেই আমরা সম্প্রতি চিনা উপন্যাস *সোল মাউন্টেন* পড়েছি। চিনের বিশাল সাহিত্য-ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে কোনো রচনাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নিতে একশো বছরের বেশি লেগে গেল। সে তুলনায় স্কান্ডিনেভিয়ার ছোটো ছোটো দেশগুলিতে নোবেল পুরস্কারের সংখ্যা অনেক বেশি। এই হচ্ছে নোবেল পুরস্কারের বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠির নমুনা!

ইদানিং নোবেল পুরস্কার কমিটির ঝোঁক হয়েছে, যেসব দেশের কেউ কখনও সাহিত্যের পুরস্কার পায়নি, সেদিকে নজর দিয়ে পুরস্কারযোগ্য কাউকে খুঁজে বার করা। সেই নিরিখেই একবার নির্বাচিত হয়েছেন এক ইজিপশিয়ান লেখক। ইরান কিংবা টার্কি সাহিত্য-শিল্পে যথেষ্ট উন্নত হলেও এখনও পর্যন্ত অবহেলিত। ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুরস্কার পেয়েছেন প্রায় গোড়ার দিকে, তিরানব্বই বছর আগে। আবার কবে কোন্ ভারতীয়

লেখক পাবেন, তা নিয়ে অনেকের উৎকণ্ঠার অবধি নেই। প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির অনেক লেখকের ভক্তরাই মনে করেন, পুরস্কার অবিলম্বে ভারতে আসা উচিত। এর মধ্যে পেয়েছেন ভি এস নইপল, তিনি ইংরেজিতে লেখেন এবং ভারতীয় বংশোদ্ভুত হলেও তাঁর পাসপোর্ট ভারতীয় নয় এবং তিনি স্বয়ং বার বার বলেছেন, তিনি ভারতীয় নন, তাঁর কোনো দেশ নেই। তবু এ দেশের অত্যুৎসাহীরা নইপলের পুরস্কারপ্রাপ্তিকে ভারতেরই গর্ব বলে প্রচার করতে চান ।

সে যাই হোক, নইপলের নামের সঙ্গে কিছুটা ভারতীয় সংস্রব জড়িয়ে আছে, তাই। যত দূর মনে পড়ে, আর-একজন ভারতীয়কে নোবেল পুরস্কার পেতে গেলে আরও অন্তত বছর দশেক অপেক্ষা করতে হবে। অন্য দেশ ঘুরে ঘুরে আসতে হবে তো!

অনেক সময়, ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কোনো দেশের কোনো লেখক নোবেল পুরস্কার পেলে তাঁর বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ সংগ্রহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দৈবাৎ সেরকম কোনো লেখক আগে থেকেই পরিচিত হলে তাঁর পাঠকদের বেশ শ্লাঘা বোধ হয়। অনেকটা সেই কারণেই অরহান পামুক-এর *স্নো* নামের উপন্যাসটি নিয়ে এবার লিখছি।

এ বছর ব্রিটিশ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার ওই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পেয়েছেন। পিন্টার তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি লিখেছেন বহু বছর আগে, এতদিন তাঁকে গ্রাহ্য করা হয়নি। সম্প্রতি তিনি ইরাক প্রসঙ্গে আমেরিকান এবং ইংরেজ সরকারকেও যুদ্ধবাজ বলে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করায় সংবাদের শিরোনামে এসেছেন। পুরস্কারের জন্য তাঁর নির্বাচন অনেকটা সেই কারণেই হতে পারে। পামুকের নাম সংক্ষিপ্ত তালিকায় উচ্চস্থানে ছিল। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই তুরস্কের লেখক অরহান পামুকের ভাগ্যে নোবেল পুরস্কারের শিকে ছিঁড়তে পারে। তখন আমরা উল্লাসের সঙ্গে বলতে পারব, আমরা তো আগেই বলেছিলাম!

আধুনিককালে তুরস্ক দেশটি আধা এশীয়, আধা ইউরোপীয়। ইস্তাম্বুল নামে শহরটি (যার আগে নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল, এককালে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর এবং খ্রিস্টীয় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র) কিছুটা এশিয়া মহাদেশে, কিছুটা ইউরোপে, মাঝখানে একটা সেতু। সেই সেতু পারাপার করতে করতে আমার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প মনে পড়ছিল। সেই গল্পের এক গ্রাম্য নায়ক হাঁটতে হাঁটতে একটা গাছতলায় এসে জানতে পারল, সেখান থেকে পশ্চিমবাংলার অন্য একটি জেলা শুরু হচ্ছে। সে একেবারে অভিভূত, তার দু-পাশে দুই জেলা! যদিও একটা রাজ্যে দুটি জেলার মাঝখানে কোনো বিভেদরেখা থাকে না, কিছুই থাকে না, তবু এই চিন্তাটাই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আর আমি সেতু দিয়ে পারাপার করছি দুটি মহাদেশ! রোমাঞ্চ হয়েছিল ঠিকই।

পামুকের সমর্থক পশ্চিম দেশীয়, অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও পত্রপত্রিকা। কারণ, পামুক যে বিষয় নিয়ে মূলত লেখেন, তা এখন ওইসব দেশে, যাকে

বলে, হট সাবজেক্ট। ইসলামিক মৌলবাদ!

কিলিমাঞ্জারো পাহাড়শিখরে তুষার যেমন বিস্ময়কর, তুরস্ক দেশে মৌলবাদের এই উত্থানও তেমনই আশ্চর্যজনক।

আরবের অন্যান্য দেশগুলি থেকে তুরস্ক অনেক ব্যাপারেই পৃথক। কিছু কিছু দেশ যখন মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এসে সে দেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন সারা বিশ্বের কাছে, সামাজিক ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটান। অতি সত্বর সে দেশে এসে যায় আধুনিকতা।

বিস্তৃতভাবে সে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই এখানে। শুধু একটি তথ্য জানাতে চাই।

আমি ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম দশ-বারো বছর আগে। তখনই এই তথ্যটি জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম। তুরস্কের জনসংখ্যার শতকরা আটানব্বই ভাগই মুসলমান, তবু সেই রাষ্ট্রটি ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। মাত্র দুই শতাংশ মানুষের জন্য এই উদারতা? সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আধুনিক, ইউরোপীয় ধাঁচে জীবন যাপন করেন বটে, ধর্মাচরণে তাঁরা মুসলমান এবং অন্য ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি দেখেছি, হজযাত্রার সময়, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে এসে প্যান্ট-কোট ছেড়ে, গায়ে চাদর জড়িয়ে মক্কা যাত্রা করছেন।

তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতার জাজ্বল্যমান প্রতীক হল হেগিয়া সোফিয়া। এই বিশাল আকারের ক্যাথিড্রালটি তৈরি হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের আমলে, পাঁচশো বছর ধরে সেটি খ্রিস্টানদের পবিত্র প্রার্থনার স্থান হিসেবে চালু ছিল, বলা হত যে, রোমের ভ্যাটিকানের পরেই গুরুত্বে এই সোফিয়ার স্থান ছিল দ্বিতীয়। যেমন বিশাল আকার, তেমনই অপূর্ব এর স্থাপত্য। পাঁচশো বছর পর বাইজেন্টাইন শক্তির অভ্যুদয় হয়। একসময় মুসলমানরা তুরস্কের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্যাথিড্রালও দখল করে নেয়। চারপাশে চারটি মিনার নির্মাণ করে এই ক্যাথিড্রাল পরিণত হয় একটি মসজিদে। এক হাজার বছর ধরে মুসলমানরা সোফিয়াকে তাঁদের ধর্মাচরণের জন্য ব্যবহার করেছেন। খ্রিস্টান আমলে দেয়ালে দেয়ালে যত ফ্রেস্কো ছিল, তা নষ্ট করা হয়নি, শুধু চুনকাম করে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ মসজিদে মনুষ্য কিংবা পশুপক্ষী, যে-কোনো দেহ অবয়বের চিত্র নিষিদ্ধ।

কামাল আতাতুর্ক এসে সোফিয়াকে আবার মুক্ত করে দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হেগিয়া সোফিয়া এর পর থেকে মুসলমান এবং খ্রিস্টান বা যে-কোনো ধর্মাবলম্বীরই প্রার্থনাস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। এমনকি শুধু দর্শনার্থীদের সেখানে থাকবে প্রবেশের অবাধ অধিকার। সব ধর্মেরই পাশাপাশি সহাবস্থানের ব্যবস্থা। আমি সেই অবস্থাতেই দেখেছি, তখন খুব সাবধানে চুনকাম সরিয়ে সরিয়ে দেয়ালের ঐতিহাসিক চিত্রগুলি পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে।

আমাদের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতন বর্বর কাণ্ডের পর আমার ওই হেগিয়া সোফিয়ার কথা মনে পড়েছিল। রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিক বিতর্ক বেশি দূর গড়াবার আগেই সেই স্থানকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রার্থনাস্থান হিসেবে কি ঘোষণা করা যেত না! কিংবা ওই স্থানে এক বিশাল হাসপাতাল গড়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেই কি তা যথোপযুক্ত হত না! কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের দেশেও তো একজন কামাল আতাতুর্কের প্রয়োজন। হায়!

আমাকে আর-একবার হায় বলতে হচ্ছে, তার কারণ খোদ তুরস্কেও এখন কামাল আতাতুর্কের সেইসব সংস্কারই আক্রান্ত। মৌলবাদের উত্থান হয়েছে, সেই শক্তি দেশ ও সমাজকে আবার পিছনের দিকে টেনে নিতে চাইছে। পামুকের উপন্যাসের বিষয়বস্তুও তাই, একেবারে সাম্প্রতিক সমস্যা।

তুরস্কে যেসব বুদ্ধিজীবী কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষ ঘোষিতভাবে নাস্তিক তাঁদের প্রাণ আজ বিপন্ন। মৌলবাদীরা শুধু হুমকি দিয়েই নিরস্ত নয়, এদিকে-ওদিকে চোরাগোপ্তা গুপ্তহত্যাও শুরু হয়ে গেছে। যাঁরা ইসলামে বিশ্বাসী কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও উদার মনোভাবসম্পন্ন, তাঁদের বিপদও কম নয়।

স্নো নামের এই উপন্যাসে আছে অবিরাম তুষারপাতের বর্ণনা। তারই মধ্যে একজন কবি এসে পৌঁছলেন কারস্ নামে একটি ছোট্ট শহরে। কবির নাম করিম আলাকুসোজলু, (দ্বিতীয় অংশটির উচ্চারণ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই) তবে তিনি শুধু 'কা' নামে লেখেন, সে নামেই পরিচিত। বিদেশিদের পক্ষেও এই নাম উচ্চারণ করা সুবিধেজনক। লেখক আমাদের প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন, কবির বয়েস বেয়াল্লিশ, সাধারণ তুর্কিদের চেয়েও লম্বা, একবারও বিবাহ করেননি। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বারো বছর জার্মানিতে পলাতক জীবনযাপন করতে হয়। যদিও রাজনীতিতে তাঁর তেমন মন নেই, কবিতাই তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে থাকে।

দেশে ফিরে তিনি কারস্ নামে ছোট্ট শহরটিতে যাচ্ছেন অনেকটা সাংবাদিকতার অছিলায়। আঙ্কারার একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ওই ছোটো শহরটির নির্বাচন কভার করবেন, আসল উদ্দেশ্য একটি অন্তর্তদন্ত, ওই শহরে অল্পসময়ের মধ্যে পরপর ছটি তরুণী মেয়ে আত্মহত্যা করেছে কেন?

আত্মহত্যার কারণ হিসেবে যা বলা হচ্ছে, তা খুবই অকিঞ্চিৎকর।

কামাল আতাতুর্কের আমল থেকেই ও দেশের মেয়েদের পোশাকের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে রাখা আর বাধ্যতামূলক নয়। একটি ছোট্ট নাটিকাও দেখানো হত সব মঞ্চে। একটি মেয়ে একদিন প্রকাশ্য রাস্তায় তার মাথার আচ্ছাদন বস্ত্রটি খুলে ফেলে দেয়। এ ব্যাপারে সে কোনো অনুশাসন আর মানতে রাজি নয়, সে মাথায় বাতাস লাগাবে। কিছু লোক তাকে ঘিরে ধরে আপত্তি জানাতে থাকে, উত্তপ্ত কথাবার্তার

পর কিছু মাস্তান যখন তার ওপর জোর করতে আসে, তখন কয়েকজন সৈনিক এসে তাকে উদ্ধার করে। অন্তর্নিহিত বার্তাটি এই যে, মেয়েদের এই পোশাকের স্বাধীনতা অবশ্যমান্য। যদি কেউ কোনো নারীর ওপর জোরাজুরি করতে আসে, তখন রাষ্ট্রশক্তি এসে দাঁড়াবে তার পাশে।

কিন্তু এখন পাশার দান উলটে গেছে। মৌলবাদীরা নতুন করে ফতোয়া দিয়েছে, মেয়েদের মাথা কালো কাপড়ে ঢেকে রাখতেই হবে। এ ব্যাপারে মেয়েদের স্বাধীনতার প্রশ্নই নেই। এদিকে সরকারি নির্দেশ আছে যে স্কুল-কলেজে মেয়েদের ওভাবে মাথা ঢেকে আসা নিষিদ্ধ। যেসব মেয়ে তবু মাথা ঢেকে আসতে শুরু করেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাদের ক্লাসরুমে ঢুকতে দিচ্ছেন না, তারা ফিরে যাচ্ছে। এবং তারাই আত্মহত্যা করতে শুরু করেছে।

সত্যিই কি এই কারণ? ধর্মীয় প্রথায় মাথা ঢেকে রাখতেই হবে, এই বিশ্বাসের জোরেই তারা মৃত্যুবরণ করছে? নাকি, মৌলবাদীদের ভয়ে?

অশ্রান্ত তুষারপাতের মধ্যে আমাদের কবিটি ঘুরছেন শহরের পথে পথে, দেখা করছেন অনেক মানুষের সঙ্গে। তাতেই এই ছোটো শহরটির মধ্যে ফুটে উঠছে সমস্ত দেশের চিত্র। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামির পুনরুত্থান, রাজনৈতিক রেষারেষি, অনিশ্চয়তা ও সবসময় একটা চাপা আতঙ্কের পরিবেশ। কবি বুঝতে পারেন, তিনি নিজেও ঠিক নিরাপদ নন, তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন জেগেছে, তাঁর মতন যাঁরা পশ্চিমি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদেরও অনেকেই অবিশ্বাস করে। মৌলবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে পুলিশি ব্যবস্থার বাড়াবাড়িও পুলিশ-রাষ্ট্রের ইঙ্গিত দেয়।

এরই মধ্যে কবির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর প্রাক্তন, রূপসী প্রেমিকার। আইপেক নামে এই তরুণীটির একবার বিয়ে ভেঙে গেছে। এখন সে থাকে তার বাবার সঙ্গে, এবং তার সঙ্গলোভী অন্য পুরুষদেরও অভাব নেই। কবির সঙ্গে আইপেক দেশান্তরে গিয়ে ঘর বাঁধবার পরিকল্পনা করলেও শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হল না, দেশের এরকম থমথমে অবস্থার কারণেই।

উপন্যাসটির মধ্যে বেশ কয়েকটি খুনের বিবরণ আছে। কখনও কেক-বিস্কুটের দোকানে, কখনও মঞ্চের ওপর নাটকের মাঝখানে। খুনগুলি এমনই ঠাণ্ডা মাথায় সংঘটিত যে শিহরনের বদলে বিবমিষা জাগায়। ধর্মীয় সংস্কার মানুষকে এমনই অন্ধ করে দেয়, নাকি অনেকে অন্ধ হতেই চায়? খোলামেলা চোখে জগৎকে দেখতেই তারা ভয় পায়?

উপন্যাসটি সুলিখিত অবশ্যই, কিন্তু ধর্ম, ঈশ্বর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে এত বেশি কচকচি আমার রুচিকর লাগে না। এ কাহিনিতে কোনো চরিত্রই, পরিবেশের কারণে, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতেই যেন জানে না। তুমি কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মান? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো কোনো পাঠকের মনে আসতে পারে, মানি কি না

মানি, তাতে তোমার কী আসে যায়? তোমাকে বলব কেন? কিন্তু এমন উত্তর বর্তমান তুরস্কে দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়, সেটাই ট্র্যাজেডি!

কাহিনির মধ্যে উল্লেখ আছে, অনেক দিন না-লেখার পর, এই ছোটো শহরের বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে কবির কাছে ফিরে এসেছে কবিতা, দ্রুত তিনি নোটবুকে কবিতার লাইন টুকে রেখেছেন। সব মিলিয়ে লিখেছেন উনিশটি কবিতা। কিন্তু কবিতাগুলি এই গ্রন্থে দেওয়া নেই। থাকলে ভালো হত।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

চিনে ভাষায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে একশো বছরে মাত্র একবার, তাও বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে। ঐতিহ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ চিনা সাহিত্যের প্রতি নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষিত হতে লেগে গেল একশো বছর। তার পরের বছর পেলেন পর্তুগালের এক ঔপন্যাসিক। পর্তুগাল অনেকদিন ইউরোপে খানিকটা ব্রাত্য ছিল। বহুকাল পরে নোবেল কমিটির সম্ভবত মনে পড়ে গেল যে পর্তুগালকে একেবারে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমাদের (?) নইপলের নামে কিঞ্চিৎ ভারতীয়ত্ব থাকলেও তিনি নিজেকে কখনও ভারতীয় বলেন না। তিনি কার্যত ইংরেজি সাহিত্যের লোক এবং খয়েরি সাহেব। তবু তাঁকে ভারতের আপনজন বলে দাবি করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে এখানে। নোবেল কমিটির মনোভাব যা বোঝা যাচ্ছে, বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচার নয়, তাঁরা এখন দেশ ধরে ধরে পুরস্কার বিতরণ করতে চান। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো ভারতীয় লেখকের এই পুরস্কারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম, কেন-না, আরও অনেক দেশ বাকি রয়ে গেছে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলির ইংরেজি অনুবাদ সহজেই পাওয়া যায়। সেগুলি পড়ে আমরা আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারি। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের না হলেও বাংলা সাহিত্যের। নিজের ভাষার সাহিত্য নিয়ে গর্ব বোধ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মোহ বিচার করাও প্রয়োজনীয়। বিভূতিভূষণ-মানিক-তারাশঙ্কর-সতীনাথ ভাদুড়ির বিশেষ কিছু কিছু রচনা এবং জীবনানন্দ দাশের কাব্য (একালেও সমরেশ বসু-মহাশ্বেতা-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি) অনেক নোবেল-পুরস্কৃত গ্রন্থের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং কোনো কোনোটি আরও কয়েক ধাপ উন্নীত, এ কথা বলতে দ্বিধা নেই। নোবেল পুরস্কার পাক বা না পাক, বাংলা সাহিত্যের যে উচ্চমান বজায় আছে, এই উপলব্ধিই আমাদের কাছে আনন্দের বিষয়। টাকার অঙ্ক ছাড়া, নোবেল কমিটির বিচারকে তেমন গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

পর্তুগালের পুরস্কৃত উপন্যাসটি বিষয়ে এবারে আলোচনা করব। ইউরোপীয় ভাষাগুলির সুবিধে এই যে, বিখ্যাত গ্রন্থগুলি দ্রুত অনুবাদ হয়ে যায় ইংরেজিতে, লেখকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন অনুবাদক, যাঁর মাতৃভাষা ইংরেজি। কিন্তু প্রাচ্য দেশ ও আফ্রিকার লেখকদের পক্ষে সে সুযোগ পাওয়া কঠিন বা সময়সাধ্য। Soul Mountain নামে চিনা উপন্যাসটির লেখক Gao Xingjian সাতচল্লিশ বছর বয়েসে ১৯৮৭ সালে একটি ফেলোশিপ পেয়ে জার্মানিতে আসেন, তখনই ঠিক করে ফেলেছিলেন, তিনি আর দেশে ফিরবেন না। তারপর থেকে তিনি ফরাসি দেশেই থাকেন এবং ফরাসি নাগরিকত্বও পেয়ে গেছেন। বহু ইউরোপীয় লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। নোবেল পুরস্কারে মনোনয়নের জন্য অন্য কোনো নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের সুপারিশ লাগে। গাও সেসব সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি কমিউনিস্ট দেশ ত্যাগ করে গেছেন এবং উপন্যাসটির মধ্যে কমিউনিস্ট চিনের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তির্যক উক্তি আছে, তার জন্যও কিছু সুবিধে হয়ে থাকতে পারে। আমি উপন্যাসটির মধ্যে মহৎ কিছু পাইনি, বরং মাঝে মাঝেই অকারণ যৌন বর্ণনা লেখকের আঙ্গিকগত ত্রুটি বলেই মনে হয়েছে।

পর্তুগিজ উপন্যাসটির নাম অন্ধত্ব বা Blindness, লেখকের নাম হোজে সারামাগো (Jose Saramago), পর্তুগালের সাহিত্য সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে পোর্তুগালের একসময় বেশি দুর্নাম ছিল। ভারত থেকে ইংরেজরা একসময় স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেও তখনকার পর্তুগালের স্বৈরাচারী শাসক সালাজার তাদের কলোনিগুলি ছাড়তে চায়নি, আমরা যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিয়েছি। নানা কারণে আমরা পর্তুগালের সাহিত্যের প্রতি কখনও মনোযোগ দিইনি, তবে ইদানিং বঞ্চিত, দুঃখ ভারাক্রান্ত অকালমৃত কবি ফেরনান্দো পেসোয়া-র কবিতা সম্পর্কে নানা দেশেই অনেকে আকৃষ্ট হয়েছেন, এমনকি ফরাসি দেশ-প্রবাসিনী শ্রীমতী প্রীতি সান্যাল নাম্নী এক বাঙালি মহিলা তাঁকে নিয়ে গবেষণা এবং তাঁর কবিতা অনুবাদে ব্যাপৃত আছেন।

অন্ধত্ব উপন্যাসটির লেখকের বয়েস এখন আশির উর্ধ্বে, তিনি পুরোপুরি লেখকবৃত্তি শুরু করেছেন বেশি বয়েসে। তাঁর এই উপন্যাসটি ৩০৯ পৃষ্ঠার। পাঠ শুরু করার পরই বোঝা যায়, এটি একটি প্রতীকী উপন্যাস। প্রতীকী না রূপক, তাও স্পষ্টভাবে বলা যায় না। যদিও বর্ণনাভঙ্গি খুবই বাস্তবসম্মত এবং ন্যারেটিভ স্টাইল মেনে। কাহিনির চুম্বকটি এরকম।

পর্তুগালের কোনো এক শহরে (শহরের নাম নেই। বস্তুত গোটা উপন্যাসটিতে একটি নামও নেই, বহু চরিত্র আছে, কিন্তু সবাই নামহীন) কোনো এক রাস্তার মোড়ে ট্রাফিকের লালবাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। ব্যস্ত রাস্তা, এইসব সময় গাড়ির চালকরা সবুজ আলো দেখার জন্য অধীর হয়ে থাকে, লালের পর হলুদ হতে হতেই গর্জন শুরু করে সব গাড়ির ইঞ্জিন। হলুদ থেকে সবুজ হল, তবু সামনের গাড়িটা নড়ে

না। পেছনের গাড়িগুলির চালকরা অধৈর্য হয়ে হর্ন দিতে লাগল, একটু পরেই জানা গেল, স্তব্ধ গাড়িটির চালক হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে। সে লোকটি দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে চিৎকার করছে, আমি অন্ধ, আমি অন্ধ, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যিই সে অন্ধ। সাধারণত অন্ধরা সবকিছুই কালো দেখে। এ লোকটির চোখের সামনে শুধু সাদা। ভিড় জমে যাবার পর একজন লোক আগ বাড়িয়ে এসে অন্ধ চালকটিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইল। লোকটি পরোপকারী, সে সত্যিই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে পৌঁছে গেল লোকটির বাড়ির ঠিকানায়, তাকে পৌঁছে দিল ফ্ল্যাটে তারপর বিদায় নিয়ে গাড়িটি চুরি করে পালাল।

লোকটির স্ত্রী একটু পরে ফিরে স্বামীর এই অবস্থা দেখে স্তম্ভিত। লোকটির ধারণা, এটা সাময়িক কোনো স্নায়ুর অসুখ, ডাক্তার দেখলে ঠিক হয়ে যাবে। তখনই স্ত্রীটি স্বামীকে নিয়ে গেল এক চোখের ডাক্তারের চেম্বারে, ট্যাক্সি করে। চেম্বারে আরও কয়েকজন চক্ষুরোগী অপেক্ষা করছে। তারা কেউই অন্ধ নয়, অন্য অসুবিধে নিয়ে এসেছে। যেমন একটি কিশোরের চক্ষু ট্যারা। সঙ্গে তার মা। এক বৃদ্ধের একটা চোখ ঢাকা, একজন তরুণীর চোখে সানগ্লাস। আরও দুজন লোক, যাদের চোখ স্বাভাবিকেরই মতন। এই লোকটিকে পরীক্ষা করে ডাক্তার কোনো রোগের চিহ্নই খুঁজে পেলেন না। সাদা রঙের অন্ধত্বের কথা তিনি কখনও শোনেননি। ওষুধ না দিয়ে তিনি আন্দাজে কয়েকটি পরীক্ষা করাতে বললেন।

এরপর চেম্বারের অপেক্ষমাণ ব্যক্তিরা কে কোথায় গেল তার বর্ণনা আছে। ডাক্তার ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। স্ত্রীকে বললেন, এই অদ্ভুত চক্ষু দেখার কথা, আর-একজন ডাক্তারবন্ধুর কাছেও টেলিফোন করে পরামর্শ চাইলেন। রাত জেগে পড়তে লাগলেন চক্ষুরোগ-বিষয়ক নানারকম বই, এবং, একসময় তিনিও অন্ধ হয়ে গেলেন। এর মধ্যে তাঁর চেম্বারে যারা এসেছিল, তারা বিকেল-সন্ধেয় যাদের যাদের চিনেছে, সবাই অন্ধ হয়ে গেছে, এমনকী সেই সহৃদয় গাড়িচোরটি পর্যন্ত।

পরদিনই জানা গেল, শহরে অনেক লোক অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সবার লক্ষণ একই রকম। এটা একটা মহামারির মতন, তাই সরকার সংক্রমণের ভয়ে এদের সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল একটি বিশাল ফাঁকা বাড়িতে। ছোঁয়াছুঁয়িও করতে হচ্ছে না। একজন অন্ধকে যে দেখবে, সেই অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ডাক্তারের স্ত্রী। কিন্তু ডাক্তারকেই যখন গাড়িতে তোলা হয়, সেই মহিলাও অন্ধ হবার ভান করে উঠে পড়লেন, কারণ স্বামীকে তিনি ছেড়ে দিতে চান না।

এরপর আরও শত শত লোককে এনে ভরা হতে লাগল সেই জেলখানার মতন বাড়িতে। তাদের হাত-পা বাঁধা হচ্ছে না বটে, কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হল, বাড়ির বাইরে কেউ এক পা বাড়াবে না, তাহলেই গুলি করে মেরে ফেলা হবে। তাদের কোনো চিকিৎসার

ব্যবস্থা হবে না, ধোপা-নাপিত-মেথররা ও বাড়ির মধ্যে ঢুকবে না, কিছু কিছু খাবার দরজার বাইরে রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হবে! অন্ধরাই সেই খাবার নিয়ে গিয়ে ভাগ করে খাবে, খাবারের পাত্রগুলি প্রতিবার পুড়িয়ে ফেলতে হবে। একজন দুজন তবু বাইরে যাবার চেষ্টা করে গুলি খেয়ে মারা গেল, সে মৃতদেহগুলিও ওখানেই পড়ে থাকবে, বাইরের কেউ ছোঁবে না। ভেতরের অন্ধরা যদি লাশপচা গন্ধ সহ্য করতে না পারে, তবে তাদের ব্যবস্থা করতে হবে ভেতরের উঠোনে পুঁতে ফেলার।

আগেই বলা হয়েছে যে, কোনো চরিত্রেরই নাম নেই। তাদের শনাক্ত করা হচ্ছে এইভাবে, প্রথম অন্ধ, তার বউ, গাড়িচোর, চোখের ডাক্তার, সানগ্লাস পরা মেয়েটি, ট্যারা ছেলেটি, ওষুধের দোকানের কর্মচারী ইত্যাদি। একমাত্র চক্ষুষ্মতী ডাক্তারের স্ত্রী, তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টিতেই সবকিছু বর্ণিত হচ্ছে। অন্যদের ক্রোধ বা ঈর্ষার কারণ হতে পারে ভেবে তিনিও সেজে আছেন অন্ধ। অন্ধদের সংখ্যা যত বাড়ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা। এর মধ্যে এসে পড়ল একদল সমাজবিরোধী, গুণ্ডাজাতীয় ব্যক্তি, তাদের একজনের কাছে আছে গুলিভরতি রিভলভার। তারা তাদের চরিত্র অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিল, সামনের দিকের ঘরটা দখল করে নিয়ে খাবারের পাত্রগুলি তারাই তুলে নিতে লাগল আগে। তারপর ঘোষণা করে দিল যে, তারা যদি খাবারের ভাগ পেতে চায়, তাহলে যার সঙ্গে সোনাদানা, টাকাপয়সা যা আছে সব দিয়ে দিতে হবে। নইলে খাবার পাবে না। তারা ভেবেছে, এ অন্ধত্ব নিশ্চয়ই সেরে যাবে একসময়। তখন ওইসব কাজে লাগবে। গুণ্ডাদের কথায় প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। সবাই বাঁচতে চায় এবং বাঁচার জন্য খাদ্য চাই।

সবাই সব দিয়ে দিল। দিন তিনেক পর গুণ্ডারা বলল, আরও চাই। কারুর কাছেই আর কিছু নেই। কিন্তু গুণ্ডাদের তো স্বভাবই অন্যদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া। তারা সে স্বভাব পালটাবে কী করে। শান্তশিষ্টভাবে বসে থাকা কিন্তু ভাগ্যের জন্য হা-হুতাশ করা তাদের পোষায় না। সুতরাং টাকাপয়সা সোনাদানা না পেয়ে তারা দাবি করল, এক একটি ঘরের মেয়েদের পাঠাতে হবে তাদের কাছে। কেউ আপত্তি করলেই খাওয়া বন্ধ। সানগ্লাস পরা মেয়েটি ছাড়া আর সব নারীর সঙ্গেই রয়েছে তাদের স্বামী। স্বামীরা এই প্রস্তাব কী ভাবে গ্রহণ করবে? যতই নৈতিক আপত্তি থাক, সামনে ঝুলছে অনাহার। স্বামীদের প্রাথমিক আপত্তি ক্রমশ দুর্বল হতে হতে রূপান্তরিত হল সম্মতিতে। মেয়েদের দিক থেকেও, না খেয়ে মরব তবু ইজ্জত দেব না— এই ধরনের চিন্তা বেশিক্ষণ টিকল না। কারণ শুধু নিজেদের নয়, পরোক্ষভাবে তারা তাদের স্বামীদের মৃত্যুর জন্যও দায়ী হবে। আমাদের পরিচিত প্রথম দিকের অন্ধদের ঘরের সবকটি নারীকেই, ডাক্তারের স্ত্রী সমেত, যেতে হল সেই হিংস্র পুরুষদের কাছে। চতুর্দিকে পুরীষ ও পেচ্ছাপ, নোংরা, দুর্গন্ধ, তার মধ্যেই শুরু হল বীভৎস যৌনলীলা। ডাক্তারের স্ত্রী দেখতে পায়, সে রিভলবারটা

কেড়ে নেবার কথা চিন্তা করেছিল, পারেনি, মানুষ খুন করাটাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু প্রথমবার অত্যাচারিত হবার পর সে বিসর্জন দিল তার কোমলতা, তার কাছে একটা ছোটো কং াচি ছিল,তা দিয়ে সে খুন করল দলের সর্দারটিকে। তারপর শুরু হল, মারামারি, হুলুস্থুল!

এই রচনায় বাক্যগুলির গঠনও অন্যরকম, কোনো বিরতি নেই, একটানা, বর্ণনা ও সংলাপও পৃথক নয়, প্যারাগ্রাফও প্রায় নেই বলতে গেলে। পাঠ করা কষ্টকর, তাছাড়া অন্ধ-কারাগারের ঘটনাবলিতে একঘেয়েমি এসে যায়। তা ছাড়াও একটা প্রশ্ন জেগে থাকে, এই কাহিনির নির্গলিতার্থ কী? এটা কীসের প্রতীক বা রূপক? লেখক তার কোনো ইঙ্গিত দেননি, এবং সেটাই স্বাভাবিক। এই পৃথিবীর যাবতীয় লোভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতার মূলে রয়েছে অন্ধত্ব? এটা কি খুব উচ্চাঙ্গের চিন্তা বলা যায়? এরকম চিন্তা কি পূর্বকথিত বা বহুকথিত নয়?

লেখক এ কাহিনি শেষ করবেন কী করে? সব কাহিনির পরিণতিরই একটা ঔচিত্যবোধ থাকে। একটা কিছু দারুণ চমক দিয়ে পরিণতি টানা রহস্য-রোমাঞ্চকর কাহিনিতে চলতে পারে। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধর্ম তা নয়। এই উপন্যাসের সম্ভাব্য পরিণতি আমি একটা সাদা কাগজে লিখে রাখলাম, পরে মিলিয়ে দেখব বলে।

একসময় সেই অন্ধ-কারাগারে আগুন লেগে গেল। বাইরে বেরুলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। তার চেয়ে আগুনে পুড়ে মরা কি কাম্য হতে পারে? আগুনের আঁচ একেবারে নিশ্চিত, আর প্রহরীদের বুলেট একটু দূরে আর দল বেঁধে গেলে কেউ কেউ রক্ষা পেতেও পারে। অন্ধের দল হুড়মুড়িয়ে চলে এল বাইরে, কিন্তু কেউ গুলি চালাল না। এর মধ্যে প্রহরীরাও সবাই অন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তাতেও শুধু অন্ধ লোক, সারা দেশই অন্ধ হয়ে গেছে। কলকারখানা বন্ধ, হাসপাতাল অচল, জল কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত, পথভরতি আবর্জনা। দোকানপাট লুঠ হয়ে গেছে। ডাক্তারের স্ত্রীর পরিচালনায় ছোটো দলটি ঘুরতে লাগল শহরের পথে পথে, খাদ্যের সন্ধানে। আশ্রয়ের সন্ধানে। এক-একজনের বাড়িতে এসে দেখা গেল, সেখানে ঢুকে বসে আছে অন্ধ পরিবার। সবাই অন্ধ। শেষপর্যন্ত ডাক্তারের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছনো গেল। সামান্য কিছু পচা-ধচা খাবার সংগ্রহ করা গিয়েছিল, তা ছাড়া ফ্রিজে ছিল কিছু পুরনো খাবার, জল নেই, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হল। এর মধ্যে আবার চার্চে গিয়ে ডাক্তারের স্ত্রী দেখল, কে বা কারা চার্চের মধ্যে সন্তদের মূর্তিগুলিতে (রোমান ক্যাথলিক চার্চ) কাপড় বেঁধে দিয়েছে। দিব্যমূর্তিগুলোও অন্ধ।

যাই হোক, যখন আর এক তিলও খাবার রইল না, বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই, দেশে সরকারের অস্তিত্ব আছে কি না তাও বোঝার উপায় নেই, চতুর্দিকে অন্ধদের হাহাকার, তখন ডাক্তারপত্নী বলল, এখন একমাত্র শেষ উপায় শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়া, সেখানে তবু মাঠে শাকসবজি বা গাছপালা থাকবে, কিংবা গোরু-শুয়োর-মুরগিও থাকতে

পারে। এই নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখনই ঘটল ভোজবাজি। প্রথম যে-লোকটি অন্ধ হয়েছিল—সে চেঁচিয়ে উঠল, আমি দেখতে পাচ্ছি! তার পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। তারপর আর-একজন। সে বাড়ির অত তালাতেও শোনা গেল চিৎকার, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি। পথে পথে জনতার মধ্যেও সেই এক কথা। একটা ঘুমন্ত পুরী জেগে ওঠার মতন। এক অন্ধদেশের মধ্যে যেমন হঠাৎ এসেছিল অন্ধত্ব, তেমনই হঠাৎ ফিরে এসেছে দৃষ্টিশক্তি।

এবং শেষ পরিচ্ছেদ? আমার সাদা কাগজের লেখার সঙ্গে মিলে গেছে। সবাই যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগল, তখনই অন্ধদের দেশে একমাত্র চক্ষুষ্মতী, ডাক্তারের স্ত্রী অন্ধ হয়ে গেলেন, সাদা অন্ধত্ব।

কিন্তু গ্রন্থটি শেষ করার পর আমার অনেকক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করার ইচ্ছে হল না। কোনো মহৎ সাহিত্যপাঠের স্বাদও পাওয়া গেল না।

ব্লাইন্ডনেস। হোজে সারামাগো। দি হারভিল প্রেস, লন্ডন

সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংরেজি বই : গাঁজাখুরির চূড়ান্ত

একদল লোক ইদানিং ধুয়ো তুলেছে, বাংলা সাহিত্যে এখন উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখা হচ্ছে না, যা-কিছু পাঠযোগ্য সবই ইংরেজিতে। এঁরা মনোযোগী পাঠন নন, এঁদের মতামতের মূল্য না দিলেও চলে, তবু পত্রপত্রিকায় এঁদের ঢক্কানিনাদে মাঝে মাঝে কান পাতা দায় হয়। অনেকে সার্থক রচনা মানে ধরে নেন চাঞ্চল্যকর রচনা। অনেক চাঞ্চল্যকর রচনাই কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জলে ভেজা বিস্কুটের মতন কাদা হয়ে যায়। বুকার প্রাইজ, পুলিত্‌জার প্রাইজকেও অনেকে মনে করেন মাপকাঠির চূড়ান্ত। চার-পাঁচ বছর আগের বুকার পুরস্কার পাওয়া বইয়ের কথা ক-জন মনে রাখে! সাহেবদের দেশে শেল্‌ফ লাইফ বলে একটা কথা আছে। দোকানের শেল্‌ফে নতুন ঝকঝকে বই বড়োজোর ছয়মাস এক বছরের মধ্যে মলিন হয়ে যায়, চাহিদাও থাকে না, অন্য বইয়ের মলাট সেখানে আলো করে থাকে। কিন্তু শেল্‌ফ থেকে স্থানচ্যুত হলেও পাঠকের মনে কোনো চিহ্ন রেখে যাবে না? ইংরিজি ভাষায় সেরকম কোনো স্মরণীয় বই বেরিয়েছে দু-দশ বছরে?

কিছু ভারতীয় তথা বাঙালি লেখক ইংরেজি ভাষায় লিখে পশ্চিমে বেশ সুনাম পাচ্ছেন, বড়ো আনন্দের কথা। তবে সেইসব বই নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে এ-দেশের ইংরেজ-নবিশরা মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন এখন থেকে বাংলা-হিন্দি-মালয়ালম-গুজরাতি ইত্যাদি ভাষায় আর কিছু লেখার দরকার নেই, সবাই মিলে এখন ইংরিজিতে লিখলেই হয়! সলমন রুশদি তো কিছুদিন আগে বলেই ফেলেছেন যে ভারতের কোনো রাজ্যের ভাষাতেই আলোচনার যোগ্য কিছু লেখা হয় না, যা-কিছু আহামরি সব ইংরেজিতে! এই ভদ্রলোকটি নাম করেছেন, নিছক হুজুগে, কোনো ভারতীয় ভাষাই পড়তে পারেন না, কিছু না পড়েই একটা মন্তব্য করে ফেললেন! কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু না জেনেও যে ব্যক্তি সে বিষয়ে মন্তব্য করে, তাকে যেন কী বলে?

আমাদের একটা সুবিধে এই, আমরা যেমন বাংলা বই পড়ি, তেমনই কিছু কিছু ইংরেজি বইটইও তো পড়ে থাকি মাঝেমধ্যে। জাপানি বা চিনের সাহিত্যের খোঁজখবর

রাখি না, কারণ ওঁরা আছেন আমাদের মাথার পেছন দিকে। আমাদের মুখ পশ্চিমে ফেরানো। সুতরাং ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন জাতির সাহেবরা কী সব লিখছেন, তার খোঁজখবর তো খানিকটা রাখতেই হয়। ভারতীয় বা পাকিস্তানি লেখকদের ইংরেজিতে সাড়াজাগানো বইও হাতে এসেই যায়। সলমন রুশদির রচনায় চটকদারি ছাড়া যে কোনো সারবস্তু নেই, তা আমাদের জানা হয়ে গেছে, কিন্তু সেই বেচারি ভদ্রলোক জানেন না, এম টি বাসদেবন নায়ার বা জয় গোস্বামী কতখানি ক্ষমতাসম্পন্ন! রাজকমল ঝা নামে এক ব্যক্তি *নীল রঙের সুজনি* নামে একখানা ইংরেজি নভেল লিখেছেন। সেটা পড়তে পড়তে ক্রমশ আমার বিস্ময় বাড়তে লাগল। অবৈধ সম্পর্ক-টম্পর্ক থাকলেই সাহিত্য হয়? কিংবা সাহিত্যের সংজ্ঞাই বোধহয় বদলে গেছে, এখন জীবনবোধের গভীরতার বদলে, মানবিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের বদলে উত্তেজক বা অভিনব বিষয় টেনে আনাই আসল? এ উপন্যাসের চেয়ে অভিজিৎ তরফদারের *মহাজাগতিক* মনে অনেক বেশি দাগ কাটে।

গত বছর আমাকে বেশ কয়েক মাস বিদেশে কাটাতে হয়েছে। দেশে থাকার সময় নানা কাজ ও অকাজের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে কবিতার বই ও নিজের লেখার জন্য প্রয়োজনীয় বই ছাড়া শখ করে গল্প-উপন্যাস তেমন পড়ার সময় পাই না। নিজেরই দোষে আমি খানিকটা ইতিহাসের চক্রে জড়িয়ে পড়েছি, কিছু লিখতে গেলেই বিবর্ণ, হলুদ রঙের পৃষ্ঠার ছেঁড়াখোঁড়া ইতিহাসের বই ঘাঁটতে হয়। সে যাই হোক, প্রবাস বাসকালে মনে হল, অবসর সময়ে পশ্চিমি সাহিত্য কিছুটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তাও বেশি কিছু পড়তে পারিনি, চুপচাপ বসে বই পড়ার চেয়ে এদিক-সেদিকে ভ্রমণের আকর্ষণ ছিল বেশি। সত্যি কথা বলতে কী, মার্কেজ এবং মিলান কুন্দেরার দু-তিনখানি করে বই আগে পড়া ছিল, বাকি অপঠিত বইগুলি পড়ে যে বিমল আনন্দ পেয়েছি, হাল-আমলের লেখকদের কিছু বই পড়ে তার বিপরীত অনুভূতিই হয়েছে। তাতে আমার একটা খটকা লাগল। এই যে ভারতীয় লেখকরা ইংরেজি গ্রন্থজগতে হঠাৎ দু-এক দশকের মধ্যে অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছেন, সে কি তাঁদের প্রতিভার জোরে বা কলমের শক্তিতে, নাকি সাহেবদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন লোকরা লেখালেখির জগতে আর আসছেন না? প্রতিযোগিতাহীন ফাঁকা মাঠ?

বাঙালিদের নামে আগে আত্মম্ভরিতার দুর্নাম ছিল, এখন কি সেই স্থান নিয়েছে হ্যাংলামি? সে যে আরও খারাপ! ঝুম্পা লাহিড়িকে বাঙালি লেখিকা হিসেবে দাবি করা হ্যাংলামি ও হীনম্মন্যতা ছাড়া আর কী? প্রথম এরকম একটি উল্লেখ দেখে বিরক্তিতে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। সে মেয়েটির বাবা-মা বহুকাল প্রবাসী, ঝুম্পা জন্মেছেও পশ্চিমে, পড়াশোনো করেছে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায়, ইংরেজি ছাড়া এক বর্ণ কখনও বাংলা লেখেনি, তবু তার ছোটোগল্পগুলিকে বাংলা ছোটোগল্প ধারার অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়। বরং তাঁকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখিকা বলাই সঙ্গত।

অরুন্ধতী রায়ই বা কেন বাঙালি হবে? দুশ্চরিত্র পিতার কাছ থেকে অরুন্ধতী পদবি ছাড়া আর কিছুই পাননি, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর কোনোই যোগাযোগ নেই, তিনি পারতপক্ষে পশ্চিমবাংলাতেই আসতে চান না, তবু তাঁকে বাঙালি বলে দাবি করতে হবে? *দা ইংলিশ পেশেন্ট*-এর লেখক মাইকেল ওনানভাতজে (অথবা অন্য কিছু উচ্চারণ) *অনিলের ভূত* নামে উপন্যাস লিখেছেন বলে তো শ্রীলঙ্কার মানুষ তাঁকে শ্রীলঙ্কার লেখক মনে করেন না।

ঝুম্পা লাহিড়ির পুলিত্‌জার পুরস্কার পাওয়া একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ইংল্যান্ডে বুকার পুরস্কার যে-কোনো জাতের লেখকের ইংরেজি মৌলিক গ্রন্থের জন্য উন্মুক্ত, কিন্তু আমেরিকানরা অত উদার নয়। পুলিত্‌জার পুরস্কার শুধু আমেরিকান লেখকদের জন্যই সংরক্ষিত এবং আমেরিকার জীবনযাত্রা চিত্রিত হয়েছে, এমন গল্প-উপন্যাসই পুরস্কারের জন্য বিবেচ্য হবার যোগ্য। ঝুম্পা হয়তো আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোনো গল্পই আমেরিকার দর্পণ নয়। ও দেশে থাকার সময় তাঁর গল্পের বইটি পড়ে ফেললাম। এই তরুণী লেখিকাটির ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর সব গল্পের চরিত্রই বাঙালি, পটভূমিকা কখনও কলকাতা, কখনও পুরী কিংবা বোস্টন। সহজ, সাবলীল ভাষা, তাঁর প্রধান কৃতিত্ব অতি সূক্ষ্ম, খুঁটিনাটির বর্ণনা। বঁটি বা নারকেল কুরনির নিখুঁত বর্ণনা ইংরেজি ভাষায় এই প্রথম লেখা হল। ঝুম্পার কয়েকটি ছোটোগল্প খুবই সার্থক, কিন্তু এই গ্রন্থের সবগুলি নয়। প্রথম গল্পটি, নামগল্পটি, পিরজাদার গল্পটি (বইটি এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই বলে গল্পগুলির শিরোনাম দিতে পারছি না), এরকম আরও কয়েকটি। কিন্তু বুড়ি পরিচারিকার গল্প, কলকাতায় বিয়ে-না-হওয়া দুঃস্থ মেয়েটির গল্প সেন্টিমেন্টাল ও কাঁচা।

বিদেশের অনেক উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকাতেও এমন কিছু কিছু গল্প পড়ি, *দেশ* পত্রিকায় বাংলা ভাষায় সেরকম গল্প জমা দিলে মনোনয়ন পেত কি না সন্দেহ আছে। *দেশ* পত্রিকায় ওসবের তুলনায় অনেক সার্থক ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছে। এখনও হয়।

ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় লেখকদের মধ্যে অমিতাভ ঘোষের লেখাই আমার বেশি পছন্দ হয়। আমি যখনই অন্য ভাষার বই পড়ি, যেটি ভালো লাগে, সেটি সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করি, বাংলা ভাষায় সেরকম বই লেখা সম্ভব কি না। বাংলা ভাষায় ন্যারেটিভ স্টাইলের মোহ কাটিয়ে ওঠা যায়নি, তা আমি নতমস্তকে স্বীকার করি। প্রকৃত পরাবাস্তব কাহিনি এখনও বাংলায় লেখা হয়নি। কিন্তু ইংরেজিতে অনেক বইই পড়ি, যা বাংলাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। যেমন, বিক্রম শেঠের *সোনালি দ্বার* কিংবা *সুযোগ্য পাত্র* যতই প্রচারের ঢক্কানিনাদ পেয়ে থাকুক, কালোত্তীর্ণ হবার চিহ্ন নেই। অমিতাভ ঘোষের সব লেখাই বুদ্ধিদীপ্ত এবং চিত্তাকর্ষক, তার মধ্যে বিশেষত একটি গ্রন্থ, *ইন অ্যান অ্যানটিক ল্যান্ড* (এখানে অ্যানটিক শব্দটির এমনই বিশেষ অর্থ যে সঠিক বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়)

উড়ে সাহেবি ভাষায় বলতে ইচ্ছে করেছিল, 'হ্যাট্স অফ'! শুধু পটভূমিকা বা গবেষণার জন্যই নয়, দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। এরকম একটি কাহিনি কেউ বাংলা ভাষায় লিখলে বাংলা সাহিত্য সেই লেখকের জন্য গর্ব বোধ করত।

অমিতাভ-র শেষতম উপন্যাস *দা গ্রাস প্যালেস* একেবারে অন্যরকম। অমিতাভ এত বড়ো আকারের উপন্যাস আগে কখনও লেখেননি, আর কোনো লেখায় কালসীমা এত বিস্তীর্ণ নয়, তিন পুরুষের কাহিনিও লেখেননি। বর্মা দেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, কিছুটা পাশ্চাত্যেও ছড়ানো ঢিলেঢালা কাহিনি, ঐতিহাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য কোথাও কোথাও মনে হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বিস্ময়ের সঙ্গে উপন্যাসটি পড়তে পড়তেও শেষ করা হল না, থেমে যেতে হল মাঝপথে।

এবারে মূল প্রসঙ্গে আসি।

প্রবাসে থাকার সময় একদিন দেখি, *নিউ ইয়র্ক টাইম্স*-এর মতন পত্রিকায় একটি গ্রন্থের প্রকাশ সম্পর্কে চার কলম ছাপা হয়েছে। একটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাসের প্রকাশ উপলক্ষ্যে প্রকাশক ও গ্রন্থ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, যা ছাপা বইয়ের ইতিহাসে আগে কখনও হয়নি। লর্ড বায়রনের কবিতাপুস্তক প্রকাশের দিনে বাড়ির মহিলারা মাথার ওপর ওড়না টেনে লাইন দিয়ে কিনতে গিয়েছিল, কিন্তু সে কাব্যগ্রন্থ ছাপা হয়েছিল মাত্র দশ হাজার কপি। আর এই ব্রিটিশ লেখিকার বইটির আমেরিকান সংস্করণই প্রথম মুদ্রণ হয়েছে সাড়ে তিন কোটি কপি (না কি পঁয়ত্রিশ লক্ষ? পঁয়ত্রিশ মিলিয়ানই মনে হচ্ছে! পঁয়ত্রিশ লক্ষ হলেও তা বিশ্ব রেকর্ড!), বিশেষ বিশেষ দোকানের সামনে বাচ্চারা (অভিভাবক সমেত) লাইন দিয়ে আছে আগের রাত থেকে।

পুস্তক প্রকাশনার জগতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টেলিভিশনের জন্য বই পড়ার অভ্যেস কমে যাচ্ছে, এটা একটা সর্বজনীন ধারণা। ছোট ছেলেমেয়েদের এখন আবার কম্পিউটারের নেশায় ধরেছে, ইন্টারনেট সার্ফিং এবং নানারকম বৈদ্যুতিন খেলা তো আছেই, তাতেও অনেক সময় চলে যায়। হঠাৎ একখানা ছাপা বই পড়ার জন্য কিশোর-কিশোরী পড়ুয়াদের এমন অদম্য উৎসাহের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রথম প্রকাশের সময়ই বইটি সংগ্রহ করতে হবে, যেজন্য আগের রাত জেগে লাইনে দাঁড়ানো। কী এমন বই?

লেখিকার নাম জে কে রাউলিং। আমি আগে কখনও শুনিনি। মধ্যবয়সিনী ইংরেজ, বিবাহবিচ্ছিন্না, একটি সন্তানকে নিয়ে চার বছর আগেও থাকতেন ইংল্যান্ডের এক ছোটো শহরে, আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পত্রপত্রিকায় টুকিটাকি লিখেছেন আগে, একটি কিশোর উপন্যাস রচনা করে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরেছেন প্রকাশকের দরজায়-দরজায়। হঠাৎ এক প্রকাশকের মনোনয়ন, ছাপা হয়ে বেরুবার পরই অসম্ভব জনপ্রিয়তা। একই ধারাবাহিক কাহিনি নিয়ে চার বছরে প্রকাশিত হয়েছে চারটি খণ্ড, আগেই বলেছি, বিক্রির হিসেবে

সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে, এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বের সব লেখক-লেখিকার মধ্যে ধনীতমা। বইয়ের রয়ালটি নেন নিজস্ব শর্তে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এই কাহিনি নিয়ে সিনেমা বানাবে, সেজন্যও শ্রীমতী রাউলিং নির্দিষ্ট অর্থ না নিয়ে লভ্যাংশের বখরা দাবি করেছেন। সিনেমার চরিত্র নির্বাচনেও তাঁর মতামত গ্রাহ্য করতে হবে। মাত্র চার বছরে এতখানি সার্থকতা যেন রূপকথা।

আমেরিকায় যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করি, তারা এইসব সস্তা জনপ্রিয় বই ছুঁয়েও দেখে না। আমার পুত্রও অবজ্ঞায় নাক কুঁচকেছিল। কিন্তু আমার অন্তত একটি খণ্ড পড়ে দেখার দারুণ আগ্রহ। ছাপা বইয়ের এই ডামাডোলের বাজারে একখানা বই কী করে এমন ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলল, তা জানতে হবে না? শুধু আমেরিকায়-বিলেতে নয়, চিন দেশেরও অল্পবয়েসি পড়ুয়ারা এই বই সংগ্রহের জন্য রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়েছে, সে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে, ভারতে অবশ্য সেরকম কিছু ঘটেনি।

আমেরিকায় সে বই সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না, আমি তো আর লাইনে দাঁড়াতে পারি না! দেশে ফেরার কিছুদিন পর হাতে এসে গেল চারটি খণ্ডই, ব্রিটিশ সংস্করণ, প্রথম তিন খণ্ড একই আকারের, সওয়া দুশো পৃষ্ঠার মতন, কাগজ-পৃষ্ঠ সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। চতুর্থ খণ্ডটি অনেক গাবদা এবং শক্ত মলাটের। চারটি খণ্ডই এক নামের, বড়ো বড়ো হরফে লেখা হ্যারি পটার, তার তলায় প্রতিটি খণ্ডেরই একটি করে উপন্যাস। যেমন, প্রথম খণ্ডটি। হ্যারি পটার এবং দার্শনিকের পাথর, চতুর্থ খণ্ডটি হ্যারি পটার এবং আগুনের পানপাত্র।

সব খণ্ডেরই নায়ক হ্যারি পটার নামে একটি বালক। কাহিনির শুরুতে তার বয়স এগারো বছর। হ্যারি যেমন একটি অতি সাধারণ নাম, এ ছেলেটির চেহারাও অতি সাধারণ, রোগাপটকা, দুর্বল, চোখে চশমা। ছেলেটি অনাথ, তার এক বছর বয়সে বাবা-মা দুজনেই খুন হন, মাসির বাড়িতে অতি অযত্নে, অনাদরে সে প্রতিপালিত। মাসি, মেসো সবসময় তাকে দুর দুর ছাই ছাই করে, মাসির ছেলেটি অত্যধিক প্রশ্রয়ে যেমন নাদুসনুদুস তেমনই খারাপ স্বভাব। বেচারা হ্যারিকে শুতে দেওয়া হয় সিঁড়ির নীচে অন্ধকার জায়গায়, তার স্কুলের সহপাঠীরাও তাকে নিগ্রহ করে খুব। এরকম একটি অতি সাধারণ দুঃখী ছেলের আবেগ-জবজবে কাহিনি তো অনেক লেখা হয়েছে, তাহলে এর বৈশিষ্ট্য কী?

আসলে হ্যারি একটি অসাধারণ ছেলে, তার একটি গোপন জীবন আছে। তার কপালে একটি তারা-আকৃতি জড়ুল, সেটি কখনও জ্বলজ্বল করে, আবার এক এক সময় তাতে খুব ব্যথাও হয়। এই জড়ুলটিই তার অসাধারণত্বের চাবিকাঠি, সে রহস্য অবশ্য ভাঙা হয়েছে আস্তে আস্তে।

এখনকার ছেলেমেয়েরা রাজপুত্র-রাজকন্যা আর দৈত্যদানোর রূপকথা পড়তে চায় না। রূপকথার বদলে এল গ্রহান্তরের আজব কাহিনি। ভিন্ন গ্রহ থেকে যে কতরকম হিংস্র, অত্যাচারী প্রাণী এই পৃথিবীতে সেইসব গল্পে হানা দেয়, তার ইয়ত্তা নেই। কারও

মুখ মোষের মতন, কারও কুমিরের মতন। এমনকি মানুষের চেয়েও অনেক শক্তিশালী বাঁদর কিংবা ইঁদুরও এসে গেছে অ্যানিমেটেড ফিল্‌মে, কমিক্‌সে। ঐতিহাসিক বীরপুরষদের জায়গা নিয়ে নিল সুপারম্যন, ব্যাটমান, স্পাইডারম্যান, ফ্যানটম ইত্যাদি। এগুলো ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে এসেছে, তাই পাঠকরা আরও নতুনত্ব চায়। ঠিক সেই জায়গা খুঁজে বার করেছেন শ্রীমতী রাউলিং। অলৌকিক এক জগৎ, যেখানে প্রভুত্ব করে পিশাচসিদ্ধ ও ডাইনিরা। তবে ইংরেজিতে উইজার্ড বা উইচ বলতে যা বোঝায়, বাংলায় জাদুকর ডাইনি ঠিক এক নয়। যেমন আমাদের বাংলায় ওদের ডাইনিং ঝাঁটা অন্যরকম, সে ঝাঁটার লম্বা একটা ডাণ্ডা থাকে, যার ওপর চড়ে আকাশে ওড়া যায়।

এই কাহিনিতে দেখা যায়, মনুষ্য তথা দুরকম প্রাণী আছে। একদল উইজার্ড আছে যারা সভ্যসমাজের মধ্যেই ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকে, বাইরে থেকে দেখলে চেনা যায় না, কিন্তু আছে একটা অন্ধকার, অতিলৌকিক জগৎ যারা সাধারণ মানুষ, চাকরি-বাকরি করে, খায়, বংশবৃদ্ধি করে, তারা একেবারেই পাঁচপেঁচি, এই অলৌকিক সম্প্রদায় তাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না, অবজ্ঞার সঙ্গে তাদের নাম দিয়েছে মাগ্‌ল! হ্যারির মাসি-মেসোরা যেমন মাগ্‌ল। উইজার্ড-উইচরাও সাধারণ মানুষের মতন সেজে থাকে, শহরে কিংবা গ্রামে-গঞ্জের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে, কেউ চিনতে পারে না, মাঝে মাঝে চলে যায় গোপন জীবনে। এরা ইচ্ছেমতন রূপ পরিবর্তন করতেও পারে, যেমন গল্পের শুরুতেই এক মধ্যবিত্ত পাড়ায় একটা বেড়ালকে বসে থাকতে দেখা যায়, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যালি ক্যাট, সে কিন্তু আসলে বেড়াল নয়, এক মধ্যবয়স্কা অধ্যাপিকা, বেড়াল সেজে একটা বাড়ির দিকে নজর রাখছেন।

যেসব অবাস্তব, উদ্ভট ব্যাপারকে আমরা বলি গাঁজাখুরি কিংবা গল্পের গোরু গাছে চড়ে, শ্রীমতী রাউলিং-এর উদ্দাম কল্পনা তারও অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। এখানে লন্ডনের আকাশ থেকে নেমে আসে এক মোটরবাইক-আরোহী, প্যাঁচারা চিঠি মুখে নিয়ে যায়, জাদুকরদের উৎসবের অঙ্গ হাজার হাজার উল্কাপাত, সাপ এক চোখ টিপে কথা বলে, হ্যারির একখানা চিঠি তার মেসোমশাই ছিঁড়ে ফেললে ছেঁড়া টুকরোগুলো ফায়ারপ্লেস থেকে উঠে আসে, মাসি-মেসো কোনো হোটেলে আশ্রয় নিলে সেই একই চিঠি একশো খানা এসে পৌঁছয় হোটেলের ডেস্কে ইত্যাদি এবং আরও উদ্ভটতরগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য। এবং এসব কোনো দূর অতীতে কিংবা নির্জন দ্বীপে ঘটছে না, ঘটছে বর্তমান কালের ইংল্যান্ডে, তাই মনে হতে পারে যে বাস্তবতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে রয়েছে একটা রহস্যময় জগৎ।

গল্প জমাবার জন্য লেখিকা অনেকগুলি অস্ত্র নিক্ষেপ করে যাচ্ছেন। তার মধ্যে ভালো আর মন্দের লড়াই তো থাকবেই। সেই লড়াইতে কে হারে কে জেতে, তা নিয়ে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলই এইসব কাহিনির প্রাণ। উইজার্ডদের মধ্যেও একদল আছে ভালো, তারা পৃথিবীর ক্ষতি করে না, মানুষ মারে না, নিজেদের খেয়ালে থাকে। আবার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও

আছে, আর এক দুর্ধর্ষ উইজার্ড, সে যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই ক্ষমতালোভী, সে সমগ্র উইজার্ড সমাজকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চায় বলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সে এমনই ভয়ংকর যে অন্য অনেক উইজার্ড ভয়ে তার নামই উচ্চারণ করে না, তার প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, ইউ-নো-হু। আমাদের তো সে ভয় নেই, আমরা বলে দিতে পারি, তার নাম ভল্‌ডমোরট, সেই বদমাশটাই খুন করেছে হ্যারির বাবা ও মাকে, তখন হ্যারি এক বছরের শিশু, সে কিন্তু তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও শিশুটিকে শেষ করতে পারেনি। সেইজন্যই উইজার্ড সমাজে হ্যারি এক বিস্ময়-বালক। মাসির বাড়ি থেকে লাথিঝাঁটা খেয়ে পালিত হলেও তাকে নিয়ে গবেষণা হবে একদিন, সে আরও অসাধ্য সাধন করবে।

এই উইজার্ডদের রীতিমতন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে পাশাপাশি ডিগ্রিধারী উইজার্ড হয়। হ্যারিকেও একসময় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। যেমন লন্ডন থেকে ছেলেমেয়েরা ট্রেনে চেপে বোর্ডিং স্কুলে যায়, সেইরকম হ্যারিকেও তার মেসোমশাই পৌঁছে দিতে এল, তফাতের মধ্যে এই, ট্রেনটিও জাদু ট্রেন, সেটা ছাড়বে পৌনে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে, সেরকম প্ল্যাটফর্ম স্টেশনে নেই, এবং ট্রেনটি অন্যদের চোখে অদৃশ্য। যেমন বোর্ডিং স্কুলে ছেলেমেয়েদের নতুন বন্ধুত্ব হয়, কারও কারও সঙ্গে ঝগড়া, যেমন শিক্ষকদের অনেককেই প্রিয় মনে হয় আবার গোড়া থেকেই দু-একজন অপছন্দের, খেলার সময় হয় দলাদলি, এখানেও তেমন সব। শুধু শিক্ষাক্রমটি জাদুর এবং অনবরত অলৌকিক কাণ্ড ঘটে চলেছে।

কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের টানটান উত্তেজনায় রাখার জন্য দু-চার পাতা অন্তর অন্তরই একেবারে ঘটনার ঘনঘটা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্রাফ্‌ট, এবং পাশেই রয়েছে ভয়াবহ প্রাণীতে ভরা এক নিষিদ্ধ অরণ্য, প্রাসাদের মধ্যে সুড়ঙ্গে রয়েছে এক গোপন প্রকোষ্ঠ, যেটি পাহারা দিচ্ছে তিনটি মাথাওয়ালা একটি কুকুর, শেষের দিকে দুটি মাথাওয়ালা একজন মানুষকেও দেখা গেছে। হ্যাগরিড নামে একজন দৈত্যাকার কিন্তু নরম প্রকৃতির মানুষ এখানকার পাহারাদার, সে হ্যারিদের বন্ধু, সে কোথা থেকে একটা ড্রাগনের ডিম জোগাড় করে আনে, সেই ডিম ফুটে ড্রাগনের বাচ্চা বেরোয়, সেটা দ্রুত বড়ো হতেও থাকে। যেহেতু উইজার্ডদের সমাজে ড্রাগন পোষা গত চারশো বছর ধরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তাই গোপনে সেই ড্রাগনটাকে নরওয়ে পাচার করে দেওয়া হয় আকাশপথে। হ্যারিকে কেউ একটা চাদর পাঠিয়ে দেয়, সেই চাদরটা মুড়ি দিলেই সে অদৃশ্য। একে তো সে যখন-তখন আকাশে উড়তে পারে, তার ওপর আবার অদৃশ্য, সুতরাং নানান অভিযানে সে অগ্রণী। এমন একটা আয়না সে আবিষ্কার করে, যাতে শুধু মৃত ব্যক্তিদের দেখা যায়, এমনকি তার বাবা-মাকেও। শেষপর্যন্ত দার্শনিকের পাথরটি হস্তগত করার জন্য সেই শয়তান ভল্‌ডমোরটের সঙ্গে বাচ্চা হ্যারির লড়াই। দার্শনিকের পাথর বস্তুটা কী? নিকোলাস ফ্লামেল নামে একজন দার্শনিকের বয়স ছশো পঁয়ষট্টি বছর,

(তাঁর স্ত্রীর বয়েস ছশো আটান্ন), স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিন্তে বাস করছেন ডেভন-এর এক গ্রামে, তাঁর একটি পাথর আছে, সেটি যে-কোনো ধাতুতে ছোঁয়ালেই তা সোনা হয়ে যাবে, আর কোনো পানীয়তে ছোঁয়ালে তা এমনই গুণসম্পন্ন হয়ে যাবে, যা পান করলেই অমরত্ব। এহেন মূল্যবান পাথরখানি বুড়ো-বুড়ি নিজেদের কাছে না রেখে ভালো উইজার্ডদের কাছে রেখেছেন কঠিন পাহারায়। সেটা করায়ত্ত করার জন্য শয়তান উইজার্ড ভল্‌ডমোরট উঠেপড়ে লাগবেই। তার আবার এখন শরীর নেই। শুধু মাথা, সেই মাথাটা অন্য একজনের মুণ্ডুর পেছন দিকে জোড়া। সমস্ত রকম সাংঘাতিক বাধা পেরিয়ে সে-ই আগে পৌঁছে যায় পাথরটির কাছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুসরণকারী হ্যারির কাছে তার যে পরাজয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। সেখানেই প্রথম খণ্ডেরও শেষ। ভলড্‌মোরট কিন্তু মরল না, সে পালাল, অর্থাৎ লড়াই চালু রয়ে গেল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ওই জাদু বিদ্যালয়েই হ্যারি এক এক বছরের পাঠ ও নিত্যনতুন বিপদ ও সংগ্রামের কাহিনি। বাস্তবতা ও যুক্তি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নির্দ্বিধায় এরকম পরপর গাঁজাখুরি ঘটনা সাজিয়ে যাওয়াতেই লেখিকার কৃতিত্ব। কারোকে যদি বলা হয়, তুমি অনবরত কথা বলে যাও, কিন্তু সব মিথ্যে কথা বলতে হবে, তাহলে কজন পারবে? শ্রীমতী রাউলিং সেটাই পেরেছেন।

এত জাদু, উইচক্রাফ্‌ট, ডাকিনীবিদ্যার মধ্যে ভারতীয়দের উল্লেখ থাকবে না? আছে। এক বিকট লম্বা সাপের নাম নাগিনী, সে আবার মানুষের মতন কথা বলে। পদ্মা আর পার্বতী নামের দুটি মেয়েকেও নাচতে দেখা যায় চতুর্থ খণ্ডে। কিন্তু মিথ্যে কথা বানাবারও তো একটা সীমা আছে। চতুর্থ খণ্ডে এসে মনে হল, লেখিকার দম ফুরিয়ে এসেছে, আর জমছে না, গাঁজাখুরি ঘটনাগুলিও একই রকম হয়ে আসছে।

অন্য খণ্ডগুলি সওয়া দুশো পৃষ্ঠার, চতুর্থ খণ্ডটি ছশো ছত্রিশ পাতা হল কেন? যত দূর মনে হয়, এর মধ্যে একটা চতুর বাণিজ্যিক হিসেব আছে। হ্যারির কাহিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছে বলেই চতুর্থ খণ্ডটি মোটা করে অনেকখানি দাম বাড়ানো হয়েছে। যাতে অনেক বেশি টাকা তুলে নেওয়া যায়, এটাই প্রকাশকদের উদ্দেশ্য। জনপ্রিয়তা আবার হুহু করে নেমে যেতে পারে, এ আশঙ্কাও বোধহয় রয়েছে প্রকাশক ও লেখিকার। সে আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়। শেষ খণ্ডটির কাহিনি আর টানে না, বেশ বিরক্তিকর, আমি চেষ্টা করেও শেষ করতে পারিনি।

প্রকাশনার ইতিহাসে যতই ইতিহাস সৃষ্টি করুক, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ বই একটা হুজুগের অবসান হিসেবে পর্যবসিত হবে। একেবারে কোনো সারবস্তু না থাকলে সে বই যতই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হোক, তা পাঠকদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, সেই লেখক বা লেখিকা সম্পর্কেও পাঠকদের শ্রদ্ধা থাকে না।

হ্যারি পটার সিরিজ— জে.কে. রাউলিং

নেতাজির সার্থক জীবনী-উপন্যাস

বিশ্বাস পাতিল একজন বিশিষ্ট মারাঠি লেখক। জন্ম ১৯৫৯ সালে এক ছোটো গ্রামের কৃষক পরিবারে, বর্তমানে তিনি একজন আই এ এস অফিসার। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র ৩৩ বছর বয়সে।

বাঙালি পাঠকদের কাছে তাঁর বিশেষ পরিচিতি নেই। বাঙালি পাঠকরা ইংরেজি ফরাসি-জার্মান সাহিত্যপাঠে আগ্রহী, কিন্তু অন্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে কোনো জ্ঞান তো নেই-ই, ঔৎসুক্যও নেই। ভারতের যেখানেই আমি যাই, এই অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়। এর সত্যতা আমি মেনে নিই নতমস্তকে। প্রায় ভাষাতেই বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু সাম্প্রতিক রচনাও অনূদিত হয় নিয়মিতভাবে, কিন্তু বাংলায় সে রেওয়াজ নেই। যদি-বা কিছু কিছু অনুবাদ হয় সাহিত্য অকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে, সেগুলির পাঠকসংখ্যা তেমন কিছু নয়। এর থেকেও খারাপ কথা, বহু আধাশিক্ষিত বাঙালি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র নিয়ে গর্বে এমনই মাতোয়ারা হয়ে থাকে যে, তারা মনে করে, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাতেই তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয় না। এমন কথা তারা প্রকাশ্যে বলতেও দ্বিধা করে না। এইসব বাঙালিরা কিন্তু নিজেরাই এখন রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়ে না মন দিয়ে। অন্য ভাষা যে কত এগিয়ে গেছে, সেইসব ভাষার বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টির মান না জেনেই কোনো মন্তব্য করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেইজন্যই ইদানিং দেশের নানান জায়গায় এই ধরনের আত্মম্ভরী বাঙালিদের সম্পর্কে নানান বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য শুনতে পাওয়া যায়।

বিশ্বাস পাতিলের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম মহানায়ক। বলাই বাহুল্য এটি উত্তমকুমার বিষয়ক নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে একজন সত্যিকারের মহানায়ক আছেন, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন অবলম্বনে এই উপন্যাস। বাংলায় সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে অনেক বীরপূজা, আবেগ-উচ্ছ্বাসের গ্রন্থ আছে বটে কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাসভিত্তিক এবং বিশ্লেষণমূলক জীবনী আজও লিখিত হয়নি। সেই কাজটি করলেন

এই মারাঠি লেখক। যদিও উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা, কিন্তু তথ্যশুদ্ধির জন্য তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন, গিয়েছেন জাপান, জার্মানি, ইংল্যান্ড, বার্মা এবং অবশ্যই কলকাতায়। অনেক গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানায় অবহেলায় পড়ে থাকা দলিল দস্তাবেজের ধুলো ঘেঁটেছেন। অনেক তথ্য আছে জার্মান, জাপানি, ফরাসি এবং বাংলা ভাষায়, একজন মারাঠি লেখকের পক্ষে এই সবকটি ভাষা আয়ত্ত করা সহজ নয়, সুতরাং শ্রীপাতিল অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধবদের। এজন্য সময়ও লেগেছে অনেক।

পরাধীন ভারতের রাজনীতিতে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেকটাই আড়াল করে রাখা হয়েছে বর্তমানকালে। জাতীয় নেতার আসন থেকে সরিয়ে তাঁকে করার চেষ্টা হয়েছে বাংলার নেতা। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অর্থব্যয়ে রিচার্ড অ্যাটেনবরো যে *গান্ধি* নামে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন,যার পটভূমিকা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন, সেখানে সুভাষচন্দ্রের কোনো উপস্থিতিই নেই। সে রকম ফিল্‌মও অনায়াসে সেন্সরের ছাড়পত্র পায়, বাঙালিরাও প্রতিবাদ করে না। বাঙালিরা এখনও আবেগ গদো-গদো হয়ে ছবি পুজো করতে ব্যস্ত।

মহানায়ক বইটি আমি পড়েছি ইংরিজি অনুবাদে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬২৪, ছবিটবি নেই, একেবারে ঠাসা। অন্য যে-কোনো বইয়ের সঙ্গে এই ধরনের বইয়ের একটি প্রধান তফাত, এর অনেক ঘটনাই তো আমাদের আগে থেকে জানা। তবু যদি কান ধরে টেনে নিয়ে যাবার মতন, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমাদের মনোযোগ সমান থাকে, তবে সেটাই প্রমাণ করে লেখকের রচনার মুনশিয়ানার। সুভাষচন্দ্রের জীবনের যে-কয়েকটি কঠিন অংশ আছে, তার মধ্যে অন্যতম, বলতে গেলে প্রধান, মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তাঁর জটিল সম্পর্ক। অহিংসার আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা গান্ধিজি প্রকৃতই মহাত্মা, কিন্তু কখনো কখনো বেরিয়ে এসেছে এক নিষ্ঠুর রাজনৈতিক খেলোয়াড়। ত্রিপুরী কংগ্রেস উপলক্ষ্যে গান্ধিজির সুভাষ-বিরোধী ভূমিকা একেবারেই একদেশদর্শী, কিছুতেই তার ওপর নৈতিক প্রলেপ দেওয়া যায় না।

অনেকগুলি পৃষ্ঠা ধরে শ্রীপাতিল এই অধ্যায়টি নিপুণ বিশ্লেষণের সঙ্গে রচনা করেছেন। গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের সম্পর্কটা যেন ভালোবাসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাখেলা। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষ্যে গান্ধিজি প্রকাশ্যেই সুভাষের বিরোধিতা করেছেন, পট্টভি সীতারামাইয়ার পক্ষে তিনি ফতোয়া জারি করেছিলেন। তবু সুভাষের এমনই জনপ্রিয়তা, গান্ধিজি তো বটেই, সর্দার বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারি, কৃপালনি প্রমুখের বিরোধিতা এবং নেহরুর তুষ্ণীভাব সত্ত্বেও সেই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন সুভাষ। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর গান্ধিজির বিবৃতি মোটেই কোনো মহাত্মার উপযোগী নয়, তা শুধু পক্ষপাতদুষ্ট নয়, ব্যঙ্গবিদ্রুপে ভরা। তিনি বলেছিলেন, ‘পট্টভির পরাজয় আমার ব্যক্তিগত পরাজয়,

পট্টভির নয়।... যাই হোক, সুভাষবাবু তো দেশের শত্রু নন, তিনিও অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন।' এখানে 'দেশের শত্রু' কথাটি উচ্চারণ করাই রুচিসম্মত নয়। তাহলেও গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয়নি, গুরুশিষ্যের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক থেকেই গিয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফলের ঠিক পরেই সুভাষ যখন দেখা করতে গেলেন গান্ধিজির সঙ্গে, তখন তাঁদের বাক্যালাপে কোনো তিক্ততা ছিল না। বরং সুভাষের খুব মাথার যন্ত্রণা হলে গান্ধিজি নিজের হাতে মলম তৈরি করে সুভাষের কপালে মাখিয়ে দিয়েছিলেন এবং সকৌতুকে বলেছিলেন, আমার ওষুধে তো দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক নেতারই উপকার হয় দেখেছি, কিন্তু সুভাষ, তুমি এমন শক্ত ধাতুতে গড়া, আমার ওষুধে তোমার কোনো কাজ হবে কি না জানি না!

এরপরেও অবশ্য দ্বিতীয়বার সুভাষের কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসা গান্ধিজিই অসহ করে তুলেছিলেন, যার ফলে কংগ্রেস থেকে বিদায়ও নিতে হয় সুভাষচন্দ্রকে।

পশ্চাদ্‌বীক্ষণে মনে হয়, গান্ধিজি এবং সুভাষচন্দ্র দুজনেই ভুল করেছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত ঠিক যুক্তিসম্মত ছিল না। গুরুতর কোনো পরিস্থিতি ছাড়া পরপর দুবার কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণের প্রথা ছিল না এবং ভোটাভুটিরও প্রয়োজন হত না। তবু সুভাষচন্দ্র জেদ ধরেছিলেন অধিকাংশ নেতাদের মতামতের বিরুদ্ধে, এমনকি বাংলার কংগ্রেসিরাও তাঁর পক্ষে ছিলেন না। অপর পক্ষে পট্টভির পক্ষ নেওয়াটাও গান্ধিজির পক্ষে মোটেই সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। এই নির্বাচনে তৃতীয় প্রার্থী ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধিজি দুজনেই যদি আবুল কালামের প্রার্থীপদ সমর্থন করতেন, তাহলে দেশের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হত। মুসলিম লিগ তখন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, পাকিস্তান ও দেশবিভাগের দাবি সরব হচ্ছে দিন দিন, ধর্ম-উদাসীন এবং ইসলামের নির্দিষ্ট আচরণবিধি না মেনেও ব্যারিস্টার জিন্নাসাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠেছেন। কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর প্রধান অভিযোগ, কংগ্রেস হিন্দুদের পার্টি। সেখানে মুসলমানদের স্বার্থ দেখা হয় না। এইরকম অবস্থায় আবুল কালাম আজাদের মতন একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি হলে দেশভাগের প্রসঙ্গ অনেকটাই নৈতিক যুক্তি হারাতে পারত। গান্ধিজি কিংবা সুভাষচন্দ্র কেউই এ দিকটা চিন্তা করেননি এবং সেই দুজনের উগ্র আমিত্ব দেখে আবুল কালাম আজাদ নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা তফাত থাকা স্বাভাবিক। কংগ্রেসের নেতা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়ক, তাঁর এই দুটি পরিচয় যেন একেবারে ভিন্ন। ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক সময় ভিন্ন মতাবলম্বীরা শ্লেষের সঙ্গে তাঁকে অভিহিত করতেন 'বাঙালিবাবু'! আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়ককে সে-কথা বলা যায়নি। সেখানে তিনি প্রাদেশিকতার অনেক ঊর্ধ্বে এবং কঠোরভাবে

ধর্মনিরপেক্ষ।

বহু বাঙালির তিনি প্রাণপুরুষ এবং বাঙালিদের এই দুর্বলতাও আছে যে তাদের আদর্শ পুরুষকে ইন্দ্রিয়জয়ীও হতে হবে, নারীসঙ্গ অকল্পনীয়, এমনকি আইনসংগত বিবাহও নিষিদ্ধ। মদ্যপান ও ধূমপানের প্রশ্নই ওঠে না। অন্য অনেকের কাছে মানুষটির কর্মদক্ষতাই প্রধানভাবে বিবেচ্য। সুভাষচন্দ্র যে এমিলি শেঙ্কেল নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং একটি কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তা তাঁর বাঙালি অনুগামীরা মানতেই চায়নি। বিশ্বাস পাতিল সুভাষচন্দ্রের গভীর অনুরাগী হিসেবেই এই উপন্যাসটি লিখেছেন কিন্তু তিনি এমিলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের কথা বিশদভাবেই লিখেছেন এবং ধূমপান ও মদ্যপানের কথাও বাদ দেননি। বার্লিনে জার্মানরা তাঁকে যথেষ্ট খাতিরযত্ন করলেও হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা না করে এগারো মাস বসিয়ে রেখেছিলেন, সেইসময় তাঁর মানসিক উদ্বেগ ও অনুশোচনার ভাব প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, সেইসময় তাঁর মদ্যপান ও ধূমপানের প্রতি ঝোঁক খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। বিদেশি জীবনীকাররা তা খোলাখুলি লিখেছেন। শ্রীপাতিল অবশ্য একটা অন্য যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, সেইসময় সুভাষচন্দ্র অরল্যান্ডো মাৎসোট্টা নাম নিয়ে এক ইতালিয়ান বনেদি ব্যক্তি সেজে থাকতেন এবং সেরকম চরিত্রকে মানানসই করার জন্যই তিনি প্রকাশ্যে ওয়াইন খেতেন ও সিগারেট টানতেন। (কোনো কোনো বিদেশি জীবনীকার সিগারেটের বদলে চুরুটের কথা উল্লেখ করেছেন।)

সুভাষচন্দ্র গোপনে দেশত্যাগ করে প্রথমে যেতে চেয়েছিলেন রাশিয়ায়, সে দেশে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে তিনি উপস্থিত হন জার্মানিতে। নেতা নাতসি হিটলারের শরণার্থী হয়ে অভিযোগে অনেকে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে স্টালিনও হাত মিলিয়েছিলেন হিটলারের সঙ্গে, সেই সূত্রে হিটলার বামপন্থীদের কাছেও বর্জনীয় ছিল না। সেই অধ্যায়টি অনেকেই এখন চিরতরে চাপা দিয়ে রাখতে চান। কিন্তু ইতিহাস তো মুছে ফেলা যায় না। 'আমার শত্রুর যে শত্রু, সে আমার বন্ধু' এই রণনীতিও সুপরিচিত এবং সুভাষচন্দ্র এটাই গ্রহণ করেছিলেন। তবে, এই উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে সুভাষচন্দ্র হিটলারকে ঘোরতর অপছন্দ করতেন, জার্মানদের সামনেই হিটলার সম্পর্কে অনেক ঘৃণাসূচক কটূক্তি করেছেন এবং শেষপর্যন্ত হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়েও হিটলারের মুখে মুখে তর্ক করেছেন, এই অংশগুলি কতটা উপন্যাস আর কতটা বাস্তব, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বাঙালিদের আর-একটা দুর্বলতা, তাঁদের প্রিয় নেতার ভাবজগতে অমরত্বও যথেষ্ট নয়, তাঁকে সশরীরে অমর হতে হবে। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হতেই পারে না। অবশ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে আসতে পারলে হয়তো দেশবিভাগ এড়ানো যেত, কিংবা স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে এতটা

অবহেলিত হতে পারত না, বাংলার এই সন্তান দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিরোধীপক্ষের নেতা যাই হোন না কেন, অবস্থান করতেন দাপটের সঙ্গে, এই প্রিয় চিন্তা অনেকের মনে থাকতেই পারে, কিন্তু মৃত্যু যে একেবারে অমোঘ, সেখানে পাশার দান কিছুতেই ওলটানো যায় না। বহু বছর ধরে অনেকেই তাঁর মৃত্যুর বাস্তবতা মানতেই চায়নি। কোনো এক সাধুর সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য আছে বলে যেমন বারবার গুজব রটেছে, তেমনই রাশিয়ানরা তাঁকে বন্দি করে রেখেছে সাইবেরিয়ায় কিংবা জাপানিরা কিংবা ইংরেজরা—এইরকম গুজবও রটেছে। এখন একশো আট বছর বয়সে তাঁর পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বলে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা নিয়ে চলছে নানান উদ্ভট গবেষণা।

নেতাজি শেষ বিমানযাত্রা করেছিলেন যে বন্দর থেকে, তার নাম অনেক জায়গায় লেখা হয়েছে তাইহাকু, এই উপন্যাসে তাইপে-র সেই বিমানবন্দরের নাম মুৎসুয়ামা। লেখক বিমান দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, নিদারুণ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় নেতাজিকে নিয়ে যাওয়া হয় সামরিক হাসপাতালে। তাঁর অগ্নিক্ষত শতকরা ৯৫ ভাগ, এরকম অবস্থায় কোনো চিকিৎসাই কাজে লাগে না, তবু জাপানি ডাক্তাররা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। রাত এগারোটার পর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। তাঁর সঙ্গী হাবিবুর রহমান বেঁচে যান।

উপন্যাসটি এখানেই শেষ হয়েছে, নেতাজির অন্তিম দিনটি সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতাই রাখা হয়নি। এই অংশটির বর্ণনার সঙ্গে লিয়োনার্ড গর্ডন রচিত *ব্রাদার্স এগেনস্ট দা রাজ* গ্রন্থের বর্ণনার বেশ মিল আছে। বাঙালিরা অবশ্য নেতাজির এমন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কথা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়, একটা কিছু রহস্য চাই-ই চাই। কতগুলি তদন্ত কমিশন যে গঠিত হয়েছিল তার ঠিক নেই। ষাট বছর পরে এখনও এক তদন্ত কমিশন কাজ করে চলেছে, এবং তার মেয়াদ বাড়াবার জন্যও দাবি জানানো হচ্ছে।

অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা জানতে পেরে অ্যাডলফ হিটলার বার্লিনের ব্যাঙ্কারে তার সহধর্মিণীর সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। অনেকে তা মানতে চায়নি। এই মৃত্যু নিয়েও একটা রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা হয়। কেউ বলল, হিটলার পালিয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকায়, কেউ বলল, সে জার্মানিতেই রয়েছে ছদ্মবেশে। তাই নিয়ে তৈরি হল অনেক গল্প। রহস্য সমাধানের জন্য বসানো হল তদন্ত কমিশন। সেই কমিশনের সদস্যরা রহস্য সমাধানের জন্য অনেক দেশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। কোন্ কোন্ দেশে এবং কখন? লোকে বিদ্রুপের সঙ্গে বলাবলি করতে লাগল। কমিশন-সদস্যরা গ্রীষ্মের সময় যায় ঠাণ্ডার দেশ সুইজারল্যান্ডে, আর শীতকালে যায় গরম দেশ ব্রাজিলে।

বলাই বাহুল্য, শেষপর্যন্ত সেই কমিশনও একটি অশ্বডিম্ব প্রসব করেছিল।

একটি সাহিত্যগ্রন্থ, একটি ইতিহাস

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতার পর খণ্ডিত বাংলায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন কংগ্রেস দলের প্রফুল্ল ঘোষ। তিনি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন, এখনকার অনেকে তাঁর নামই জানে না। অমন ঐতিহাসিক সময়ে একটি রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হবার সম্মান পেয়েও তিনি অল্পকালের মধ্যেই কেন অপসারিত হন, তা আমি জানি না। প্রফুল্ল ঘোষের বক্তৃতা কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁর পরবর্তী দীর্ঘকালের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি বেশ কয়েকবার। তিনি অশুদ্ধ এবং ইংরেজি-মিশ্রিত বাংলা বলতেন। এরপর প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং স্থায়িত্বে রেকর্ড সৃষ্টিকারী জ্যোতি বসু, এইসব মুখ্যমন্ত্রীদের যোগ্যতা কিংবা তুলনামূলকভাবে গুণাগুণের বিচারের মধ্যে না গিয়ে শুধু একটি বিষয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, এঁদের সকলেরই বাংলা ভাষা দুর্বল। এঁদের অন্য দিকের ব্যস্ততার জন্য, বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষ সংস্পর্শ ছিল না। অন্য দিকের ব্যস্ততা বোধহয় সঠিক কারণ নয়, কেন-না সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রীতি জন্মায় কৈশোরে।

নতুন শতাব্দীতে এসে বাংলার যিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তিনি আদ্যোপান্ত সংস্কৃতি জগতেরই মানুষ। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এঁকে মেঠো বক্তৃতা দিতেই হয়, কিন্তু বিদ্বজ্জন সমাবেশে সেই একই ভাষা ব্যবহার করেন না, ভিন্ন পরিবেশে তাঁর বক্তব্যে সাবলীলভাবে এসে যায় ক্লাসিক থেকে আধুনিক সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, সুচিত্রা মিত্রের পাশে বসে নীচু গলায় গেয়ে উঠতে পারেন রবীন্দ্রসংগীত, সমকালের বিশ্ব চলচ্চিত্র, নাটক ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রশাসনকে সংবেদনশীল হবার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বতন কোনো মুখ্যমন্ত্রী কখনও সংবেদনশীল শব্দটি ব্যবহার করেননি। এই শব্দটি তাঁদের ভোকাবুলারিতে নেই। সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে দক্ষ প্রশাসক বা রাজনৈতিক তাত্ত্বিক হওয়া যায় না, অনেকে এখন বলেন বটে, কিন্তু তা অজ্ঞতাপ্রসূত। মহাকবি নামে প্রসিদ্ধ গ্যোয়েটে

কিছুদিন ছিলেন একটি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তা ছাড়া নেপোলিয়ান থেকে চার্চিল (ইনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন), মাও সে তুং এবং হো চি মিন, লেওপোল্ড সেংঘর, হাভেল, এরকম অনেক নামই করা যায়। স্বয়ং কার্ল মার্কসের সাহিত্যপ্রীতি সুবিদিত। তাঁর নিত্যপাঠ্য ছিলেন শেকসপিয়র। সাহিত্য-শিল্পের রস যারা পায় না, তাদের কল্পনার জগৎও বেশি বিস্তৃত হতে পারে না।

বঙ্গের এই প্রথম সাহিত্যপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজে একজন লেখকও হন, তাহলে তাঁর রচনাগুলি সম্পর্কে আমাদের বেশি আগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কবিতা ও নাটক (কয়েকটি মৌলিক, একটি ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার গল্প অবলম্বনে) লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন মার্কেজের গল্প ও মায়াকভস্কির কবিতা, জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাফ্‌কা, মায়াকভস্কি, মার্কেজ, জীবনানন্দ, মানিকের নাম একসময় পাশাপাশি রাখা যেত না, এককালের কমিউনিস্টদের সাহিত্যরুচিতে শুচিবাই ছিল, তাতে তাঁরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছেন। কাফ্‌কা ছিলেন তাঁর নিজের জন্মদেশে অস্পৃশ্য, যেমন এদেশের অনেকের কাছে জীবনানন্দ দাশ, 'অবক্ষয়' নামে একটা শব্দ খুব চালু হয়েছিল ভুল অর্থে। এই তালিকা দেখেই বোঝা যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাহিত্যরুচি অনেক উদার এবং প্রকৃত রসভোক্তার।

পুড়ে যায় জীবন নশ্বর নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কিত বইখানি সদ্য বেরিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন বলেই যে বইটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তার যেমন মানে নেই, আবার একজন ব্যস্ত রাজনৈতিক কর্মী এবং দীর্ঘদিন মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্বে থেকেও যে একজন এমন বই লেখার সময় পান, সে-কথাটাও মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং কমিউনিস্ট লেখক হিসেবেই পরিচিত, সেইজন্যই তাঁর সম্পর্কে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বেশি বেশি উৎসাহ, এ কথাও বলা যাবে না। কারণ তিনি আগের বইটি লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে। আমি কমিউনিস্ট নই, তবু আমি আবাল্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত, শুধু পূর্বজীবনের মানিকই নন, তাঁর উত্তরকালের গল্প এবং জীবনের শেষ রচনাটি পর্যন্ত।

একজন লেখকের জীবনী এবং তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণের যে রীতি আছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার ধার ধারেননি। এমন একটি বাক্য তিনি প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখে ফেলেছেন, যা লেখা উচিত ছিল একেবারে শেষে। যেমন 'আমার ধারণা বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠতম লেখক'। এরকম ধারণা কোনো পাঠক বা সমালোচকের হতেই পারে, কিন্তু তা ব্যক্ত করার আগে কারণ ও যুক্তিগুলি উল্লেখের দাবি থাকে। অবশ্য এই ধরনের বিশ্লেষণের ধরাবাঁধা পদ্ধতি, যাকে বলে অ্যাকাডেমিক আলোচনা, তা একঘেয়ে হয়ে গেছে, তার চেয়ে ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা এবং রসগ্রহণের বর্ণনা অনেক টাটকা স্বাদ এনে দেয়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থখনি তেমনই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস

লিখেছেন সাঁইত্রিশটি, ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো, এই গ্রন্থকার তার সবগুলির উল্লেখ না করে নিজের পছন্দমতন বেছে নিয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একজন লেখক যাঁর সমগ্র রচনাবলিতে কোনো বিশেষ তত্ত্ব বা দার্শনিকতা বা মতবাদের ছাপ মারা যায় না। অথচ একটা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ চাপিয়ে দেবার দিকেই আমাদের ঝোঁক। অথচ পৃথিবীর কোনো প্রকৃত লেখকই কোনো বিশেষ তত্ত্বের অনুসারী হতে পারেন না, সবসময়ই বিপরীত কিছু উপাদান থেকে যাবেই। এবং সমস্ত তত্ত্বই আংশিক সত্য। যেমন আর্ট ফর আর্টস সেক তত্ত্বটা একসময় অনেক লাথিঝাঁটা খেয়েছে, কিন্তু এরও আংশিক গুরুত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই, একজন লেখক বা শিল্পীর যতরকম দায়বদ্ধতাই থাকুক, শিল্পসৃষ্টির কাছে প্রাথমিক দায়বদ্ধতা থেকে যাবেই। যার মধ্যে এসে পড়ে ব্যক্তিমানুষের মনের জটিল দ্বন্দ্ব, তা বাদ দিয়ে সমাজ-বাস্তবতাও সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণা : 'যদি বুঝেন লিখিয়া দেশের ও জাতের উপকার করিতে পারিবেন, তবে লিখিবেন, নচেৎ লিখিবেন না', এটা রীতিমতন বিপজ্জনক। দেশের ও জাতের উপকার মানে কী? অনেক লেখক মনে করেন, ধর্মপ্রচারেই দেশের উপকার হয়! বিধবাবিবাহ চালু হওয়া উচিত নয়, এমন বিশ্বাস যদি কোনো লেখকের থাকে, তাতে দেশ ও জাতের কিছু উপকার হতে পারে? প্রত্যেক গল্পের শেষে আশাবাদের লাল সূর্য উঠিয়েও কারও কিছু উপকার হয়েছে কী? সুতরাং উপকার-টুপকার নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভালো। সাহিত্যের রসসৃষ্টি এমনই এক সূক্ষ্ম ব্যাপার যে তা মাথার ওপর কোনো উপকারের বোঝা চাপিয়ে রাখতে পারে না। সার্থক সাহিত্য এক ধরনের আনন্দের স্বাদ দেয়, যার মধ্যে মিশে থাকে সুস্থ মানবতাবোধ। মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতার ইঙ্গিত। তার কাহিনি বিস্তার নানারকম পটভূমিকায় হতে পারে, কিন্তু মানুষগুলি নিছক একরঙা নয়। এবং সব সাহিত্যসৃষ্টিই এক ধরনের উন্নত খেয়াল, লেখক নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারেন না পরবর্তী লেখাটি কী করে তাঁর মাথায় আসে, সুতরাং কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বা মতবাদ অনেকটাই অবান্তর। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় নিয়ে লেখকের বোধ যদি গড়ে ওঠে, তবে তাঁর রচনার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই। দুঃখ, যন্ত্রণা, শোষণ, উৎপীড়ন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এ সবই যেমন বাস্তব, তেমনই এই বাস্তবতাই সব নয়। নিছক বাস্তবতা সাহিত্য সহ্য করে না, আবার বাস্তবতাকে বাদ দেবারও প্রশ্ন ওঠে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জেদি মানুষ, বিজ্ঞানমনস্ক, সংস্কারমুক্ত, ধর্মীয় আচার-বিচারের ঘোর বিরোধী, নির্যাতিত মানুষদের পক্ষপাতী, শ্রেণিভেদ ও সমাজ বদলের সমর্থক, আবার মানুষের অন্তর্লোকের গোলকধাঁধা সম্পর্কে গভীরভাবে কৌতূহলী, নারী-পুরুষের সম্পর্কের চিরকালীন টানাপোড়েন সম্পর্কেও অতি সচেতন। এত সব কিছু সংমিশ্রণের জন্যই তাঁর অধিকাংশ রচনায় রয়ে গেছে রহস্যের উপাদান। যিনি *পদ্মা নদীর*

মাঝি লিখেছেন, *অহিংসা* নামের উপন্যাসটি যে তাঁরই রচনা, যেন বিশ্বাস করা যায় না। অথচ দুটিই মহৎ সৃষ্টি। *জীয়ন্ত* ও *দর্পণ* উপন্যাস যেন তাঁর দুটি সত্তার পরিপূরক। জীবনের শেষ উপন্যাস *হলুদ নদী সবুজ বন*-এ তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, সুন্দরবনের মানুষদের দারিদ্র্য ও কঠিন জীবনযাত্রার পাশাপাশি সচ্ছল উচ্চবিত্তদের বাঘ শিকার ও প্রমোদ কি দুই শ্রেণির সমান্তরাল কাহিনি? এই ধরনের ব্যাপার ঘটে ঠিকই, কিন্তু সমান্তরাল চিত্রণের মধ্যে কি লঘু চালাকির প্রকাশ পায়? কারণ এই দুই শ্রেণির মধ্যে তো স্তরভেদ এমনই গাঢ় যে প্রকৃত কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। তারপর তিনি নিজেই উত্তর খুঁজেছেন, 'সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়!'

একটা বড়ো আফসোসের বিষয় এই যে *পুতুল নাচের ইতিকথা* ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ো আকারের কোনো উপন্যাস লেখেননি বা লেখার সময় পাননি। তাঁর দুর্ধর্ষ প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। 'সরীসৃপ', 'সর্পিল', 'শৈলজ শিলা' গল্পগুলি পাঠের গা ছমছমে অনুভূতি যেমন ভোলা যায় না, তেমনই 'হারানের নাতজামাই' কিংবা 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের একেবারে শেষ দিকে দারিদ্র্য ও রোগযন্ত্রণায় যখন তিনি পর্যুদস্ত, তখনও তিনি তাঁর জেদ ও অভিমান ছাড়েননি, ধারালো অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর কলমটিকে, তখনও প্রতিটি রচনার প্রতিটি বাক্যে রেখে গেছেন তার প্রমাণ।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব এই, একজন কমিউনিস্ট হয়েও কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত এক মহৎ লেখকের পর্যালোচনার সময় শুধুমাত্র একটি দিককেই প্রধান করে তোলেননি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছেন সামগ্রিকভাবে, মুক্ত মনে। তৎকালীন বামপন্থীদের কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণার বিরোধীও ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন, তখন কেউ কেউ বলতেন, শিল্পী-সাহিত্যিকদের দু-চার বছর তুলি-কলম তুলে রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একে মনে করতেন বাতুলতা। (যেমন আরও কিছুদিন পর মাও সে তুং চিনে কালচারাল রেভোলিউশানের নামে এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।) 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নিয়ে তখন খুবই বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল। (মনে পড়ে কমলকুমার মজুমদারের মন্তব্য, একজন কট্টর বামপন্থী কবি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, সোশ্যাল কনটেন্ট না থাকলে উনি এক টিপ নস্যিও নেন না!) মানিকবাবু এই যান্ত্রিকতা মানেননি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ফরমান জারি করে মহৎ রচনা হয় না।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবের দ্বান্দ্বিকতাকেই অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্তব্য, 'মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেই মহান শিল্পী হওয়া যায় না। বিশ্বাস এক, আর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাসকে বিশ্বাস্য করে তোলার দায়ভাগ লেখকের। সেখানেই লেখকের অগ্নিপরীক্ষা, তার সাফল্যের চাবিকাঠি।' এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিভা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন।

শেষ বছরটিতে, অসুস্থ অবস্থায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিতে কিছু দোলাচল প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মে অবিশ্বাস ও রাজনীতিতে বিশ্বাস যেন কিছুটা চিড় খেয়েছিল, সেসবও উদ্ধৃত হয়েছে এখানে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও তাঁর সৃষ্টির মতনই এই দিনলিপির কিছু কিছু অংশও যেন ব্যাখ্যার অতীত। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, সাহিত্যের একজন ছাত্র ও নিবিষ্ট পাঠক হিসেবেই রচনা করেছেন এই বইখানি। সেইজন্যই এই বইখানি বিশেষ আকর্ষণীয়। তাঁর ভাষা একেবারে সাহিত্যের ভেতরের মানুষদের মতন, মন্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই, তবে কোথাও কোথাও হুড়োহুড়ি আছে। উপন্যাসের কাহিনির সারসংক্ষেপ করতে যাবার একটা বিপদ আছে, ব্যস্তভাবে বলার চেষ্টা করলে অনেক বিখ্যাত উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত গল্পটি অতি সাধারণ মনে হতে পারে। যেমন *অহিংসা* উপন্যাসের কাহিনির চেয়ে চরিত্রগুলির জটিলতাই বেশি আলোচ্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী-অংশ আর-একটু থাকলে ভালো হত।

দ্বিতীয়টি ইতিহাসের বই।

আমাদের দেশটার দুটি নাম। ইন্ডিয়া এবং ভারত। আর-একটিনাম ছিল হিন্দুস্তান, দেশভাগের পর পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই নামটির আর বিশেষ প্রচলন নেই। যদিও হিন্দুস্তান অর্থ হিন্দুদের দেশ নয়।

এই নামগুলির উৎপত্তি হল কীভাবে?

প্রথম নামটি বিদেশিদের দেওয়া। এক দেশের নাম অন্য দেশের মানুষ দেয়, এমনও ঘটে।

ভৌগোলিকভাবে এই দেশটির এমন একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, যা পৃথিবীর খুব কম দেশেরই আছে। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে হিন্দুকুশ, সফেদ কো, সুলেমান, ব্রাহুই, পাব, কিরথর ও অন্যান্য পর্বতমালা, পূর্বে পাটকই নাগা, লুসাই এবং চিন শৈলশ্রেণী, এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর। প্রকৃতিই এই দেশটির সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে কিংবা জাতিগতভাবে এই ভৌগোলিক সীমানাটা বহুকাল ছিল না, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যে সবাই ভারতীয়।

যতদূর জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কারিয়ান্ডার স্কাইলাক্স-এর রচনায় প্রথম ইন্ডোই (যার থেকে ইন্ডিয়া) নামটির উল্লেখ দেখা যায়। প্রায় সমসময়েই মিলেটাস- এর হেকাটাইওস এই নামটিই ব্যবহার করেছেন। সিন্ধু বা ইন্ডাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে তাঁরা এই নাম দিয়েছেন। কিন্তু ওই নদীটির নাম এর আগেই সিন্ধু বা ইন্ডাস কে দিল? এর উত্তর আমি কোথাও পাইনি।

পরের শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট প্রথম ডারিয়ুস পাহাড় পেরিয়ে এসে যে জনপদ ও ভূমি দখল করলেন, তারও নাম ইন্ডোই বা ইন্ডিয়া। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের ইতিহাসে এর বিবরণ আছে। কিন্তু মজার কথা এই, প্রথম ডারিয়ুসের নক্‌শ-ই-রুস্তম শিলালিপিতে তাঁর জয় করা যেসব দেশের নামের তালিকা আছে, তার মধ্যে ইন্ডিয়া নেই, আছে হিন্দু নামে দেশের কথা। দুটি নামেরই উৎস সেই সিন্ধুনদ। পারস্যের ভাষায় 'স' উচ্চারণ ছিল না, আর গ্রিকরা 'হ' উচ্চারণে বিমুখ ছিল।

আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় সিন্ধু নদের অববাহিকার নাম ইন্ডোই বলে উল্লিখিত হলেও অন্য একটি অংশের নাম দেওয়া হয়েছিল গঙ্গারিদৈ, (অবিভক্ত বঙ্গের গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থল)। কিন্তু গঙ্গারিদৈ নামটি টেকেনি, সমগ্র অঞ্চলটিই ক্রমশ ইন্ডোই বা ইন্ডিয়া হিসেবে পরিচিত হয়।

বিদেশিরা তো দুটো নাম দিল, এ দেশের মানুষ স্বদেশকে কী নামে ডাকত? দেশ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠতেই অনেকটা সময় লেগেছে। সম্রাট অশোকের সময় জম্বুদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণ অনুসারে পৃথিবীটাকে নটি দ্বীপে ভাগ করা হয়েছে, জম্বুদ্বীপ তার অন্যতম। মৌর্য আমলে জম্বুদ্বীপ নামটা বেশ প্রচলিত থাকলেও পরে তা জনপ্রিয়তা হারায়।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে দেখা যায় 'ভারতবর্ষ' নামের উল্লেখ। এর অধিবাসীদের নাম ভারতী (তখনও ভারতীয় বলা হয়নি) মুসলমানদের আগমনের পর ক্রমশ হিন্দ্ বা হিন্দুস্তান নামটির প্রচলনই বাড়ে। মুঘল বাদশারা নিজেদের হিন্দুস্তানের অধীশ্বরই বলতেন, এ নাম দেশবাচক। জাতিবাচক বা ধর্মবাচক নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রবক্তা কবি ইকবালও আগে গান লিখেছিলেন। সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা...।

চিন দেশ থেকে আগত পরিব্রাজকরাও এ দেশের বিভিন্ন নাম দিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *The Concept of India* বইটিতে এ সবের বিস্তৃত বিবরণ আছে। সাহিত্যের বাইরে মহাকাশ বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে, সুযোগ পেলেই পড়ার চেষ্টা করি, সব বুঝি বা না বুঝি। ব্রতীন্দ্রনাথ কখনও হালকাভাবে জনপ্রিয় হবার ভঙ্গিতে লেখেন না, তাঁর সব রচনাই কঠোরভাবে তথ্যসমৃদ্ধ, তারও একটা আলাদা মৌলিকতার স্বাদ আছে। *বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত* নামেও তাঁর একটি অন্য বাংলা বই আছে।

এই যে চমৎকারভাবে সীমারেখা টানা ইন্ডিয়া বা ভারত নামে দেশ একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতে, সেটা অখণ্ড থাকলে বিশ্বে একটি অতি শক্তিশালী দেশ হতে পারত। কিন্তু সেই অখণ্ডতা বজায় রাখা গেল না কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতাদের অসহিষ্ণুতা ও ভুল সিদ্ধান্তে এবং ব্রিটিশদের চক্রান্তে। দেশবিভাগের কারণগুলি ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সংক্ষিপ্ত ও নিপুণ ব্যাখ্যা করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ।

জিন্নাহ্ কথিত টু নেশান থিয়োরি যে সঠিক ছিল না, তার প্রমাণ মুসলমানদের জন্য আলাদাভাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হবার পরেও তা আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পূর্বতন ভারত এখন তিনটি রাষ্ট্র। আরও ভাঙবে কি না কেউ জানে না। ইতিমধ্যেই এই ভাঙনের ফলে এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও রেষারেষির জন্য আমরা ভৌগোলিক সীমারেখার সুরক্ষায় সদ্ব্যবহার হারিয়েছি। আরও হানাহানি করলে তা বিশ্বের চোখে আমাদের হেয় করবে।

ইতিহাসবিদের নির্মোহ দৃষ্টি থাকলেও এই ভারত বিভাগজনিত হতাশা ও দুঃখবোধ ব্রতীন্দ্রনাথ গোপন করতে পারেননি। এখনও আমাদের এই তিনটি দেশের ঐক্যসাধনের একটি উপায় আছে, ব্রতীন্দ্রনাথের মতে তা একটি কনফেডারেশান গঠন। কিন্তু মাঝে মাঝেই উত্তাপ যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই তিনটি দেশের নেতাদের সেরকম সুবুদ্ধির উদয় হবার আশা অদূরভবিষ্যতে নেই। তবু ব্রতীন্দ্রনাথ একটি ব্যাপারে সান্ত্বনার কথাও বলেছেন। এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আগেও টুকরো টুকরো অনেক রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে একটা ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনও,পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ পৃথক তিনটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও তা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত। এই ভৌগোলিক আখ্যা বদল করা যাবে না। এবং একই সাংস্কৃতিক বাতাবরণ রক্ষা করাই বড়ো কথা।

পুড়ে যায় নশ্বর জীবন— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
দ্য কনসেপ্ট অব অন্ডিয়া—বি. এন. মুখার্জি

জাদুবাস্তবতা ও মার্কেজের গল্প

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লেখকরা আর ছোটোগল্প লেখেন না। ছোটোগল্পের স্বর্ণযুগ যেন ক্ষীয়মাণ। এককালের নবীন লেখকরা প্রথমে ছোটোগল্প লিখে হাত পাকাতেন, তারপর কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করলে শুরু করতেন উপন্যাস। এখন অনেকে শুরুতেই সরাসরি উপন্যাসে চলে আসেন। তার অন্যতম কারণ, সাহিত্য-পত্রিকাগুলির বিলুপ্তি। একসময় লেখকরা পরিচিত হতেন এইসব পত্রিকার মাধ্যমে। এখন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সরাসরি চলে যায় প্রকাশকের কাছে। সালমন রুশদি, বিক্রম শেঠ কিংবা অমিতাভ ঘোষ কখনও ছোটোগল্পের দিকে মনোযোগই দেননি।

বাংলাতেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তার পরবর্তী প্রধান লেখকরা অনেক ছোটোগল্প রচনা করেছেন। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস অঙ্গুলিমেয় কিন্তু হীরকদ্যুতির মতন বিস্ময়কর ছোটোগল্প অজস্র। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখকদের একটি দুটি উপন্যাসের কথাই আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাঁদের অনেক ছোটোগল্পই অবিস্মরণীয়। সত্যিই বাংলায় একসময় ছোটোগল্পের স্বর্ণযুগ ছিল, অনায়াসেই বলা যায়। অনেক বিশ্বমানের ছোটোগল্প রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। কিন্তু আফসোসের কথা এই, এখনও অনেক উচ্চাঙ্গের ছোটোগল্প লেখা হয় বটে, কিন্তু প্রকাশক ও পাঠকমহলে ছোটোগল্পের তেমন সমাদর বা চাহিদা নেই।

এখনকার পৃথিবীতে জীবিত লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ অবশ্য বেশ-কিছু ছোটোগল্প লিখেছেন। মোট সংখ্যা উনচল্লিশ। গল্পগুলি আকর্ষণীয় একটি বিশেষ কারণে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস *নিঃসঙ্গতার এক শতাব্দীর* লেখক হিসেবেই মার্কেজ সর্বশেষ পরিচিত এবং তাঁর নাম শুনলেই মনে পড়ে ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌মের কথা। কিন্তু সেই বিশিষ্ট শিল্প আঙ্গিক মার্কেজের অনেক গল্পেই অনুপস্থিত। এই ছোটোগল্পগুলির রচয়িতা যেন অন্য এক মার্কেজ। বড়জোর তাঁর কয়েকটি গল্পকে বলা যায় ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম আঙ্গিকের আঁতুড় ঘর। অন্যান্য গল্পগুলিতে টানা বর্ণনারীতিই অনুসৃত হয়েছে।

ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম ব্যাপারটা কী? গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই অভিধা চিত্রশিল্প সম্পর্কে প্রথম প্রযোজ্য হয়েছিল। তারপর এটা সাহিত্যের আঙ্গিক হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। আর্জেন্টিনার প্রসিদ্ধ লেখক হর্হে লুইস বর্হেস, জার্মানির গুন্টার গ্রাস কিংবা ইংল্যান্ডের জন ফাউলসের রচনাতেও এই উপাদান পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে নাইজেরিয়ার বেন ওকোরি আর কিউবার আলেহো কারপেনতিয়ের অবশ্যই। তবে মার্কেজই এর প্রধান প্রবক্তা হিসেবে গণ্য। রূপকথা, উপকথায় ফ্যান্টাসি, যার অনেকখানিই অবিশ্বাস্য, তার সঙ্গে আধুনিক জীবনের অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার খুঁটিনাটি মিলিয়ে নেওয়াকেই ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম বলা যেতে পারে সংক্ষেপে। মার্কেজ এই আঙ্গিকটি কী করে আয়ত্ত করলেন, তা বুঝতে গেলে তাঁর জীবনীর কিছু কিছু ঘটনা জানা দরকার।

বাচ্চা বয়েসে মার্কেজ থাকতেন কলম্বিয়ার আরাকাটাকা নামে একটা ছোটো শহরে দাদু ও দিদিমার কাছে। দাদু অবসরপ্রাপ্ত জবরদস্ত এক কর্নেল। মস্তবড়ো বাড়ি, পুরোনো ও রহস্যময়, কেউ কেউ বলে ভূত আছে। দিদিমা ছাড়াও অনেক মাসি-পিসি মিলিয়ে বাড়ি ভরতি অনেক বুড়ি মহিলা, সবাই কুসংস্কারগ্রস্ত ও ভূত-প্রেত-অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী, তাঁরা অনবরত সেইসব গল্প বলতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়ে ছিলেন মার্কেজের দিদিমাই। তাঁর মুখচোখের ভঙ্গি এমন হত গল্প বলার সময়, যেন তিনি ওইসব অলৌকিক ঘটনা একেবারে দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। এইসব গল্পই বালক মার্কেজের মনে দাগ কেটে যায়। পরবর্তীকালে ওইসব চরিত্রও তাঁর গল্প-উপন্যাসে এসে পড়েছে। এরকম তো অনেক লেখকের রচনাতেই তাঁদের বাল্য বয়েসের দেখা চরিত্র ও ঘটনার প্রতিফলন হয়। মার্কেজের জীবনে এর বিশেষত্ব কী?

আইন পাস করে উকিল হবার বদলে মার্কেজ যখন সাংবাদিকতা ও গল্প-উপন্যাসে হাত পাকাচ্ছিলেন, তখনও তিনি নিজস্ব আঙ্গিকটি খুঁজে পাননি। তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিক করে ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার 'মেটামরফসিস' নামে গল্পটি এবং উইলিয়াম ফকনারের রচনা। কাফ্‌কা ও ফকনারের রচনারীতির কোনো মিল নেই। কাফ্‌কার গল্পটি পড়ে মার্কেজ উপলব্ধি করেন যে একেবারে প্রথার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়কেও বাস্তবসম্মত করে লেখা যায়। আর ফকনারের রচনায় অপ্রাকৃতের কোনো স্থান নেই, তিনি তাঁর চেনাশুনো পরিবেশ ও মানুষগুলি নিয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখেছেন।

মার্কেজ এই দুই বিপরীত আঙ্গিককেই মেলাতে চেয়েছেন, সেটাই তো ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম। কিন্তু এই আঙ্গিকও তাঁর কাছে সহজে আসেনি। নিজের লেখায় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ফকনার যেমন একটি কাল্পনিক অঞ্চল তৈরি করে তার মধ্যে তাঁর বাল্যকালের পরিচিত চরিত্রগুলি ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন, মার্কেজও সেইরকম মাকুন্দো নামের একটি অঞ্চল তৈরি করতে চাইছিলেন। তারপর সেই অলৌকিক ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনেই ঘটে।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে দারিদ্র্য ও অস্থির ভুবনের মধ্যে একদিন মার্কেজ তাঁর

স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আলকাপুলশোর দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝপথে তাঁর এক বিস্ময়কর উপলব্ধি হল। বিদ্যুৎচমকের মতন তিনি যেন তাঁর নতুন উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের প্রতিটি লাইন দেখতে পেলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর দিদিমার মুখ। তাঁর উপলব্ধি হল যে কল্পিত নগরীতে দিদিমার মুখে শোনা গল্পগুলি শুধু ব্যবহার করলে তা কৃত্রিম হতে বাধ্য। দিদিমা যখন গল্প বলতেন, তখন তাঁর যে মুখের ভাব, লেখককে সেটাই ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ লেখককেও ওইসব অলৌকিক ও ভূতপ্রেতের গল্প সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই লিখতে হবে! বেড়াতে যাওয়া হল না। গাড়ি ঘুরিয়ে মার্কেজ ফিরে এলেন বাড়িতে। নিজের ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে। সংসার কী করে চলবে, না চলবে তার তোয়াক্কা না করে লিখতে বসলেন। প্রায় এক বছর পর সমাপ্ত হল তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস *নিঃসঙ্গতার এক শতাব্দী*।

ছোটোগল্পগুলি লেখার মাঝে মাঝে মার্কেজ বেশ-কিছু চলচ্চিত্র ও টিভি ফিল্‌মের চিত্রনাট্যও লিখেছেন। তখন তিনি ইন্‌গমার বার্গমানের চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না জানা যায় না। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে বার্গমানের ছবিতে ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম প্রত্যক্ষভাবে ফুটে আছে। *দা সেভেন্‌থ সিল*, *ওয়াইল্‌ড স্ট্রবেরিজ* কিংবা *ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার* ছবিগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে মার্কেজের কিছু কিছু ছোটগল্পে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের প্রভাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। একসময় তিনিও হেমিংওয়ের মতন প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টার্সে কাটিয়েছেন কিছুদিন। তাঁর 'বিমানে এক ঘুমন্ত রূপসী' গল্পটি একেবারে হেমিংওয়ের ঘরানার গল্প। মার্কেজও বোধহয় এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, খোঁজাখুঁজি করছেন নিজস্ব স্টাইল। 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' গল্পটি তিনি এগারোবার লিখেছেন ও ছিঁড়েছেন।

বাংলায় এই গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন অমিতাভ রায়। দিল্লিপ্রবাসী এই লেখক অনেকদিন ধরেই মার্কেজ অনুবাদে প্রবৃত্ত রয়েছেন। আগেও তাঁর অনুবাদে মার্কেজের বাংলা গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এবারে গল্পসমগ্র। তাঁর অনুবাদ সাবলীল এবং সরসপাঠ্য।

প্রেমচন্দ : আধা আত্মজীবনী

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বেশ-কিছু মহৎ ও কালজয়ী লেখক আছেন। তাঁরা কিন্তু অনেকেই সর্বভারতীয় লেখক নন। ভারতের প্রধান ভাষাগুলি এতই দৃঢ় এবং সুবিস্তৃত যে, সেই ভাষার অনেক লেখক স্ব-ভাষাতেই সীমাবদ্ধ। যেমন, শরৎচন্দ্র একজন ভারতীয় লেখক, কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীকে কি তা বলা যায়? একালের এন টি বাসুদেব নায়ার একজন অতি শক্তিশালী লেখক, কিন্তু কেরলের বাইরে তার পাঠকপরিচিতি খুব বেশি নয়, খুব বেশি সংখ্যক বাঙালি পাঠকও কি তাঁর লেখা পাঠ করেছেন? ভারতের বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের কোনো সংজ্ঞা এখনও ঠিক হয়নি। বিদেশে ভারতীয় সাহিত্য বলতে এখনও অনেকে সংস্কৃত ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের কথা মনে করেন, যদিও দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষা পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো, তারও ঐশ্বর্য কম নয়, কিন্তু বলতে গেলে সে সম্পর্কে আমরা প্রায় অজ্ঞই।

মাতৃভাষা হিসাবে পৃথিবীতে হিন্দি ও বাংলার স্থান চতুর্থ ও পঞ্চম। বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সৌজন্যে কোথাও কোথাও বাংলা ভাষাকে হিন্দিরও আগে স্থান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সারা বিশ্বের ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি ও বাংলার এরকম প্রাধান্য সত্ত্বেও এই দুই ভাষারই সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে কোনো আন্তর্জাতিক আগ্রহ বা পরিচিতি নেই। এখন আবার বেশ কয়েকজন ভারতীয় লেখক ইংরেজিতে লিখে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছেন। তাঁদের পাঠকসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। অনেকে ওই ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যকেই ভারতীয় সাহিত্য বলে ভ্রম করেছেন।

হিন্দি ও বাংলার মধ্যে আদানপ্রদান আছে যথেষ্ট। যদিও তাতে ভারসাম্যের কিছুটা অভাব। বাংলা থেকে হিন্দিতে অনুবাদ হয় প্রচুর। সেই তুলনায় হিন্দি সাহিত্য বাংলা অনুবাদে তেমন সুলভ নয়। একটা বাস্তব সত্য হচ্ছে এই, বাঙালি পাঠকেরা ফরাসি, জার্মান, রুশ সাহিত্যের অনুবাদ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন। কিন্তু হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি, তামিল, মালয়ালম সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন। একমাত্র যে-হিন্দি লেখককে বাঙালি খুব

ভালোভাবে চেনে তিনি প্রেমচন্দ। শরৎচন্দ্রেরই মতো প্রেমচন্দও সর্বভারতীয় লেখক হিসাবে গণ্য। প্রেমচন্দের অনেক রচনারই বাংলা অনুবাদ প্রাপ্তব্য। এ ছাড়া মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রেও তাঁর অনেক কাহিনি রূপান্তরিত হয়েছে। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় প্রেমচন্দের দুটি কাহিনি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' এবং 'সদগতি'-র মহৎ চিত্ররূপ দিয়েছেন।

হিন্দি ভাষায় শরৎচন্দ্রের একটি চমৎকার জীবনী রচিত হয়েছে। নাম 'আওয়ারা মসিহা'। কিন্তু বাংলায় প্রেমচন্দের সেরকম কোনো জীবনী আছে কি? প্রেমচন্দের জীবন-তথ্য আমাদের অনেকটা অজানা। সম্প্রতি মদনগোপাল প্রেমচন্দের একটি অভিনব জীবনী প্রকাশ করেছেন ইংরেজি ভাষায়। মদনগোপাল অনেককাল ধরেই প্রেমচন্দের রচনার অনুবাদ, তাঁর জীবনী রচনা ও গবেষণায় নিযুক্ত। এই গ্রন্থটি অভিনব এই কারণে যে, এটি জীবনী না আত্মজীবনী, তা নির্ণয় করা শক্ত। উত্তমপুরুষে বর্ণনা, সুতরাং আত্মজীবনীই বলা উচিত। কিন্তু প্রেমচন্দ কোনো আত্মজীবনী লিখে যাননি।

প্রেমচন্দ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রচনায় কোথাও কোথাও নিজের পরিবার ও জীবিকা-সূত্রে নানা স্থানে বসবাসের কথা লিখেছেন। মদনগোপাল সেইসব টুকরো টুকরো লেখা সংগ্রহ করে এবং প্রেমচন্দের কিছু কিছু গল্পের পটভূমিকা ও সারাংশ জুড়ে জুড়ে নির্মাণ করেছেন এই গ্রন্থ। তার ফল খুব সুখকর হয়নি। বর্ণনা মাঝে মাঝেই অসংলগ্ন মনে হয়। একটি অধ্যায়ে প্রেমচন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তাঁর বেহিসেবি এবং বারবার প্রতারিত হওয়ায় স্বভাবসম্পন্ন স্বামীর সংসারে যে কত কষ্ট করে থাকতে হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন নিজের জবানিতে। তিনি কি এরকম কিছু লিখে গিয়েছিলেন? তার কোনো উল্লেখ নেই।

প্রেমচন্দের জন্ম ১৮৮০ সালে, বারাণসীর কাছাকাছি লামহি গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের কেরানি। তিনি ছিলেন বদমেজাজি ও কঠোর স্বভাবের। প্রেমচন্দের সাত বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁর বাবা বছর দেড়েকের মধ্যেই আর-একটি বিবাহ করেন। শৈশব ও কৈশোরে প্রেমচন্দকে অনেক দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে হয়। তাঁর পড়াশোনাও বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়। রোমান্টিক স্বভাবের এই কিশোরটির রমণীদের রূপ-গুণ সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেমচন্দের বালিকা বধূটির রূপের খুবই অভাব ছিল এবং গুণের কথাও বিশেষ জানা যায় না। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বিমাতার সঙ্গে এই বধূটির নিত্য কলহ শুরু হয় এবং প্রেমচন্দেরও যেহেতু স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণই জন্মায়নি, তাই সেই দুর্ভাগা মেয়েটিকে পাকাপাকিভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পিত্রালয়ে। আত্মীয়পরিজনদের প্ররোচনায় তিনি অবিলম্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সেসময়ে হিন্দুদের মধ্যে একাধিক বিবাহ বেআইনি ছিল না এবং বিবাহবিচ্ছেদেরও প্রচলন ছিল না। সুতরাং পরিত্যক্তা স্ত্রীদের বাকি জীবন কীভাবে কাটাতে হত, তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য নয়।

বাবার চাকরিসূত্রে প্রেমচন্দকে বারবার স্কুল বদল করতে হয়। এমন অসুবিধের মধ্যেও

তিনি পড়াশোনার জেদ ছাড়েননি এবং কৈশোর থেকেই সাহিত্যপাঠের আগ্রহে তিনি পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই পড়েছেন অনেক বেশি। তবে ভবিষ্যতের হিন্দি সাহিত্যে যিনি যুগান্তর ঘটাবেন, সেই প্রেমচন্দ কৈশোরে হিন্দি খুব কমই জানতেন। তাঁর তৎকালীন পড়াশোনা সবই প্রায় উর্দু ভাষায় এবং লেখালেখিরও শুরু উর্দুতেই। প্রথম প্রথম তিনি কিছু অনুবাদও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটা গল্প তিনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন বলে জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথ, তলস্তয়, রম্যাঁ রলাঁ এবং রতননাথ সরশরের প্রেরণায় তিনি ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'দুনিয়া কা আনমোল রতন'। লেখকের নাম নবাব রাই। জন্মসূত্রে তাঁর আসল নাম ধনপত্ রাই। প্রেমচন্দ নামটি তখনও বহু দূরে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সারা ভারতেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় নতুন সাহিত্যে। প্রেমচন্দ বলেছেন, তিনিও এর দ্বারা প্রভাবিত হন।

বি এ পাস করার আগেই সাংসারিক দায়িত্ব ও গ্রাসাচ্ছাদনের তাড়নায় প্রেমচন্দকে চাকরি নিতে হয়। (পরে অবশ্য তিনি বি এ পাস করেছিলেন)। প্রথম প্রথম চাকরি করেছেন বিভিন্ন স্কুলে। পরে তিনি যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের সহকারী স্কুল পরিদর্শকের পদে উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর একটি গল্পসংকলন, *সোজ-ই-ওয়াতন* এবং সেই গ্রন্থটি রাজরোষে পড়ে। কালেক্টর সাহেব তাঁকে ডেকে বলেন, এই গল্পগুলিতে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক সুর রয়েছে। কোনোক্রমে চাকরি রক্ষা হলেও তাঁর প্রতি হুকুম হয়, সরকারের অনুমতি ছাড়া তিনি আর কোথাও কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না। সে আদেশ মেনে তিনি লেখক নবাব রাইকে নির্বাসনে পাঠান। কিন্তু লেখা থামাননি। জন্ম হয় প্রেমচন্দের। তখনও প্রেমচন্দ উর্দু ভাষার লেখক। *প্রেম পচ্চিশি*,*প্রেম বত্তিশি*, এবং *প্রেম চল্লিশি*— এইসব গল্পসংগ্রহগুলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দিতেও এগুলির অনুবাদ শুরু হয়। তারপরে প্রেমচন্দ নিজেই লিখতে শুরু করেন মূল হিন্দিতে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *সেবাসদন*।

হিন্দি সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তনে প্রধান কৃতিত্ব প্রেমচন্দের। পথিকৃৎ হয়েও তিনি সাহিত্য রচনায় উচ্চমান প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দি ও উর্দু সাহিত্য ছাড়িয়েও তাঁর খ্যাতি ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যত্র। আত্মজীবনীতে তিনি বারবার খেদ করেছেন, খ্যাতি ও কিছু কিছু পুরস্কার পেলেও যথেষ্ট অর্থলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। জীবিকার জন্য স্কুল ও কলেজের চাকরি এবং পরিণত জীবনে তিনি পত্রিকার সম্পাদনা এবং প্রকাশনা ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র প্রেমচন্দের সমসাময়িক, বয়সেও কাছাকাছি। তাঁর জন্ম ১৮৭৬ সালে। শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরও কেটেছে দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায়। তবে প্রেমচন্দের জীবন

তেমন ঘটনাবহুল নয়। সেই তুলনায় শরৎচন্দ্রের জীবনী কিছুটা নাটকীয়। তার অল্প বয়সের বাউণ্ডুলেপনার অনেক কাহিনি তাঁর নানা রচনায় প্রতিফলিত। এমনকি একসময় সন্ন্যাসীবেশেও বহু জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। এরই মধ্যে হাতে লেখা পত্রিকায় সাহিত্যচর্চার শুরু। আবার অনিশ্চিত ভাগ্যান্বেষণে বর্মা দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। (শরৎচন্দ্রের বর্মা যাত্রার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনি রয়েছে তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থে। তিনি কলকাতায় ২৬ বছর বয়সে এক সাহেবের সঙ্গে মদ্যপানের প্রতিযোগিতায় বসেছিলেন এক সন্ধ্যায়। দুজনে দুটি বোতল দ্রুত শেষ করার চেষ্টায় মেতে উঠেছিলেন। এরই মধ্যে সাহেব হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুই হয়েছিল। এই ঘটনার জন্য শরৎচন্দ্র দায়ী না হলেও আতঙ্কিত হয়ে অপরাধবোধে দেশ ছেড়ে পাড়ি দেন বর্মা মুলুকে। এ কাহিনির সত্যতার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।)

প্রবাসে শরৎচন্দ্র রোমাঞ্চকর জীবনযাপন করলেও তাঁর সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে পুরোদস্তুর। এর মধ্যেই তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেশে যখন ফেরেন, ততদিনে তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি পাঠকমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্রের খ্যাতি স্বদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে যায়। তাঁর *শ্রীকান্ত* প্রথম পর্বের ইতালিয়ান অনুবাদ পাঠ করে রম্যাঁ রলাঁ তাঁকে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিক আখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর, শরৎচন্দ্রের এদেশীয় অনুরাগীরা মনে করেছিলেন, শরৎচন্দ্রও এই পুরস্কার অবশ্যই পেতে পারেন। সেরকম কিছু চেষ্টাচরিত্রও হয়েছিল বলে শোনা যায়।

প্রেমচন্দ ও শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাই গ্রামভিত্তিক। তবে দুজনের রচনার অমিলও অনেক। শরৎচন্দ্রের গ্রাম অনেকটাই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা। সেই তুলনায় প্রেমচন্দের গ্রাম অনেক নিষ্ঠুর বাস্তবতাময়। এঁরা কি পরস্পরকে চিনতেন? কিংবা পরস্পরের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? প্রেমচন্দের এই আত্মজীবনীটিতে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ থাকলেও শরৎচন্দ্রর নামগন্ধ কোথাও নই।

প্রেমচন্দ বাংলা জানতেন কি না, তা ঠিক জানা যায় না। (প্রেমচন্দের ছেলে অমৃত রাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি নিখুঁত ও সঠিক উচ্চারণে সাবলীল বাংলা বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁর পিতার বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে আমার কিছু জানা হয়নি।) অবশ্য সেকালে হিন্দি তথা ভারতের অন্যান্য অনেক ভাষার লেখকরাই বাংলা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। নিজ উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যপাঠের জন্য তাঁরা বাংলা শিখে নিতেন, এমন উদাহরণ যথেষ্ট। প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি গল্প উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, তা ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে। তবে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য বেশ কৌতূহল উদ্দীপক।

তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কবিতা তাঁর ভালো লাগে না। কারণ সেগুলির

মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ নেই। তাঁর মতে, সাহিত্যে পৌরুষ একটি প্রধান গুণ এবং সেইসব রচনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের বদলে মির্জা গালিবের কবিতার তিনি বিশেষ অনুরক্ত। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সাধারণ ধারণা, এই ভাষার সৃষ্টিগুলি বড়োই নমনীয় (ফেমিনিন)। বাঙালিরা সেন্টিমেন্টাল জাতি। ভাবপ্রবণতায় বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা অনেকটা হারিয়ে যায়। যুক্তি এবং বিশ্লেষণ দিয়ে যা পারা যায় না, তা ভাবপ্রবণ রচনায় মনকে অনেকটা ছুঁয়ে যায়। তবে শুধু ভাবপ্রবণতায় শিল্পসৃষ্টি কত ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই উপলব্ধি প্রত্যক্ষ পাঠের ওপর ভিত্তি করে, না কি শোনা কথার ওপর নির্ভরশীল, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তুলনামূলক বিচারে প্রেমচন্দের রচনা শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব এবং আধুনিক। শরৎচন্দ্রের রচনায় অতি-ভাবপ্রবণতার অভিযোগ অনেক বাঙালি পাঠকের মনেও দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমগ্র বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এমন সাধারণ উক্তি প্রত্যক্ষ পাঠের অভাবেই সম্ভব বলে মনে হয়। অপর ভাষার কোনো প্রধান লেখকের কাছ থেকে ঠিক প্রত্যাশিত নয়।

মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস : প্রেমচন্দ রিক্রিয়েটেড
ফ্রম হিজ ওয়ার্কস। মদনগোপাল
রলি বুক্স্। নিউ দিল্লি ৪৮

বিভূতিভূষণ ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা

বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসটি যখন *প্রবাসী*-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন আমার বয়েস তিন-চার বছর। বই পড়ার বদলে বইয়ের পৃষ্ঠা ছেঁড়ার দিকেই তখন ঝোঁক ছিল বেশি। কী জানি, হয়তো *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠাও আমি ছিঁড়ে কুচিকুচি করেছি।

এখনকার দিনের বাচ্চারা দু-আড়াই বছর বয়েস থেকে মাথায় লেখাপড়ার বোঝা চাপাতে বাধ্য হয়। আমাদের সময়ে পাঁচ বছর বয়েসে সরস্বতী দেবীপ্রতিমার সামনে হাতেখড়ি হত। তার আগে পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান নিষিদ্ধ ছিল। তারপর থেকেই অগ্রগতি হত অতি দ্রুত। আট-ন বছর বয়েসের মধ্যেই সুকুমার রায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় পড়ে শেষ করে ফেলেছি। সেই বয়েসে লেখকের নাম না জেনে কিংবা খেয়াল না করেই পড়ে যেতাম অনেক বই, সম্ভবত সেইভাবেই পড়েছি বিভূতিভূষণের *চাঁদের পাহাড়* ও *মিসমিদের কবচ*।

পাঠক হিসেবে আমরা প্রাপ্তবয়স হই ঠিক কবে থেকে? কয়েক দশক আগেও একুশ বছরের কম বয়স্কদের নাবালক বলা হত। এখন ভোটাধিকারের বয়েস আঠারো করা হয়েছে। কিন্তু পিওবার্টি এসে যায় চোদ্দো বছর বয়েসেই, মেয়েদের বোধহয় আর-একটু আগে। স্পষ্ট মনে আছে, আমি প্রথম প্রেমপত্রটি লিখেছিলাম চোদ্দো বছর বয়েসে, সুতরাং 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' এই ধরনের বাক্য বোঝার মতন পরিণত হয়েছে মস্তিষ্ক। সব ধরনের বই পড়বারও অধিকার জন্মে যায়। আমাদের গুরুজনরা অবশ্য তখনও আমাদের নিতান্ত বালক বলেই গণ্য করতেন। এ বই পড়বে না, সে বই পড়বে না— এরকম নির্দেশ জারি করতেন, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার জেদ আরও বাড়ে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধিনিষেধ তেমন কড়া ছিল না। আমার মায়ের ছিল খুব বই পড়ার নেশা। লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রতিদিন মায়ের জন্য দুখানা বইয়ের জোগানদার ছিলাম আমি। সেই দুটি বই আমারও পড়া হয়ে যেত।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমার পাঠাভ্যাস ছিল এলোমেলো। হাতের কাছে যা

পেয়েছি তাই-ই পড়েছি। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরি সিরিজের পাশাপাশি বঙ্কিম রচনাবলি, কিংবা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের রগরগে উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ দত্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস। ক্ষুধার্তের যেমন খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার থাকে না। তারপর যখন লেখকদের চিনতে শিখলাম, তখন লাইব্রেরিতে গিয়ে এক-একজন লেখকের নাম ধরে ধরে তাঁর সমস্ত লেখা পড়ে ফেলতে শুরু করি।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর বৎসরে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। ততদিনে তাঁর প্রকাশিত সবগুলি বই আমার পড়া হয়ে গেছে। তিনি আমার বিশেষ প্রিয় লেখক। আমি শুধু তাঁর একটি উপন্যাস নিয়ে পাঠক হিসেবে আমার বিবর্তনের কথা বলব।

আরণ্যক প্রথম পাঠে ছিল অবিমিশ্র মুগ্ধতা। সিকি অংশ পড়ার পরই মনে হয়েছিল, এরকম বই আগে কখনও পড়িনি, বাংলা ভাষায় এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার কথা আগে কেউ চিন্তাও করেননি। সত্যিই তো, অরণ্যজীবন নিয়ে বাংলায় কে আর তেমন কী লিখেছেন? *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে অরণ্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই সমাজভিত্তিক। বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের অরণ্য-অভিজ্ঞতা ছিল না। বাড়ির পাশেই এত বড়ো সুন্দরবন একেবারে অপরিচিত। *কপালকুণ্ডলায়* অরণ্যের ভূমিকা নামমাত্র, যেটুকু আছে তাও বাস্তবতা-বর্জিত।

প্রথম পাঠে *আরণ্যক*-এর প্রকৃতিবন্দনাই দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিল এক অচেনা জগতের উন্মোচনের মতন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছুটা অরণ্য-টান থাকে, বিবর্তন-স্মৃতির সূত্রে, আমরা খুব বেশিদিন অরণ্য ছেড়ে বাইরে আসিনি। নগরবাসী হয়েও যে আমাদের মাঝে মাঝেই জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার ঝোঁক, সেটাও হয়তো ওই বিবর্তন-স্মৃতি, ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে। কেউ কেউ জোর করে এটা অস্বীকার করতে চায়, যেমন বোদলেয়ার শহরেও গাছপালা থাকা অপছন্দ করতেন, কিন্তু এই অস্বীকারও স্মৃতিকে প্রমাণ করে।

সেই বয়েসে লবটুলিয়া-বইহারের জ্যোৎস্না-নিশীথের বর্ণনায় এতই অভিভূত ছিলাম যে বুঝিনি, *আরণ্যক* উপন্যাসের মূল উপজীব্য শুধু অরণ্য বা আরণ্যক জীবন নয়, ন্যুট হামসুনের *প্যান* কিংবা উইলিয়াম হেনরি হাডসনের *গ্রিন ম্যানশন*-এর সঙ্গে এ উপন্যাসের অনেক তফাত।

একবার পূর্ণিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি ও তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা বাগান দেখার জন্য। সেই সঙ্গে সাধ হয়েছিল বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসের পটভূমিতেও থেকে আসব কয়েক দিন। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ওরকম কোনো অরণ্যের অস্তিত্ব সে অঞ্চলে নেই, যদিও পূর্ণিয়া শহরের বৈশিষ্ট্যের কথা *আরণ্যক*-এ উল্লিখিত হয়েছে বারবার। কিন্তু *আরণ্যক* তো ভ্রমণ কাহিনি বা ডায়ারি নয়। উপন্যাস, এ কথা লেখক জানিয়ে দিয়েছেন গোড়াতেই। সুতরাং ওই অরণ্য কাল্পনিক

হতে বাধা নেই। শুধু তাই নয়, যে নিবিড় নিস্তব্ধ অরণ্যভূমির কথা তিনি লিখেছেন, তার ধ্বংসের কথা, জঙ্গল সাফ করে মানুষের গৃহস্থালি স্থাপনের কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন উপসংহারে। কিন্তু পাঠক হিসেবে তা আমরা মানতে পারি না। বাস্তবের সেই অরণ্য অপসৃত হয়ে গেলেও আমাদের কল্পনায় তা চিরস্থায়ী হয়ে গেছে।

আরণ্যক দ্বিতীয়বার পাঠ করি ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েসে। কৈশোরের সেই মুগ্ধতার বদলে খানিকটা সমালোচকের চোখ নিয়ে। তখন আমরা সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে মেতে আছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতিকে ধাক্কা মারছি বারবার, শরৎচন্দ্র অনেকখানি আড়ালে চলে গেহছেন, একদিকে তারাশঙ্কর-মানিক-সতীনাথ প্রমুখ, অন্যদিকে কল্লোল যুগের লেখকরা আমাদের মন জুড়ে আছেন। বিভূতিভূষণও আমাদের প্রিয় লেখক বটে। কিন্তু তিনি ঠিক আধুনিক কি না, সে বিষয়ে মনস্থির করা যাচ্ছিল না। এবার *আরণ্যক* পড়ার পর দুটি কারণে ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল। প্রথমত ভাষা। আধুনিকতার একটা শর্তই হল, পুরোনো আঙ্গিক ও ভাষা ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করা। আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষাতেই সাহিত্যের অগ্রগতি। এমনকি অনেকে এমন কথাও বলতে শুরু করেছিলেন যে সাহিত্যের মধ্যে কোনো বক্তব্য বা বাণী খোঁজা উচিত নয়। আঙ্গিকই তার বাণী। ফর্ম ইজ দা মেসেজ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *অ্যান একার অফ গ্রিন গ্রাস* নামে ইংরেজি প্রবন্ধের বইতে এমন মন্তব্য করেছিলেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বিষয়বস্তু বা মালমশলা অনেক আছে, কিন্তু কী করে লিখতে হয় তা তিনি জানেন না। আর প্রবোধকুমার সান্যালের আছে উত্তম লেখার স্টাইল, কিন্তু বিষয়বস্তু কিছু নেই। উক্তিটি চমকপ্রদ, কিন্তু বলাই বাহুল্য, সত্য নয়। সেই বয়েসে আমরা কল্লোলীয় লেখকদের ভাষাবৈচিত্র্যে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে এই ধরনের মত খানিকটা বিশ্বাসও করেছিলাম।

বিভূতিভূষণের ভাষা বেশ এলানো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাধু বাংলা ছেড়ে চলিত ক্রিয়াপদ চালু করে গেছেন। রবীন্দ্র-বিরোধী কল্লোল গোষ্ঠীও ঝকঝকে চলিত গদ্য লেখেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ অনেকদিন ধরে আঁকড়ে ছিলেন সাধু বাংলা। শনিবারের চিঠির দলের অনেকেই সাধু বাংলায় লিখতেন। আমরা তাঁদের মনে করতাম প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। *আরণ্যক*-এর ১৫ নং পৃষ্ঠায় এরকম একটি বাক্য আছে : 'কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভালো লাগিল!' এর ঠিক দু-পাতা পরেই আবার আছে, 'কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভালো লাগিল!' এত কাছাকাছি একই রকম বাক্য ব্যবহার করা তো অমার্জনীয় অপরাধ! একজন লেখক কেন এমন অমনোযোগী হবেন?

আরণ্যক সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি, এই দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠা।র উপন্যাসটিতে যৌনতার নামগন্ধ নেই। শরীর একেবারে অনুপস্থিত! উপন্যাসটি নিছক কল্পকাহিনি নয়, গাছপালার চেয়ে মানুষের কথাই বেশি, বর্ণনাভঙ্গি ও রোমান্স-জাতীয় নয়। বাস্তব ঘেঁষা। স্বয়ং গল্পের

লেখক বা উত্তম পুরুষে বর্ণিত নায়ক একটি অবিবাহিত যুবক, সে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন অথবা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সন্ধানী। তার নিজস্ব কোনো কামনাবাসনা নেই? জঙ্গলে দিনের পর দিন বাস করেও মানুষ শুধু জঙ্গলের সৌন্দর্য দেখে না, অধিকাংশ সময়ই সে নিজেকে দেখে। নিঃসঙ্গতা কখনও উপভোগ্য, কখনও-বা গলা টিপে ধরে। জল যেমন জলের দিকে যায়, মানুষও তেমনই মানুষকে চায়। *আরণ্যক*-এ বিভূতিভূষণ জোর করেই যেন এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন।

সেই তুলনায় *পুতুল নাচের ইতিকথা* কিংবা *অচিন রাগিণী* অনেক বেশি জীবনসত্যের কাছাকাছি।

এরপর *আরণ্যক* বইখানি পড়িনি বহুদিন। একই বই বারবার কেই-বা পড়ে। বিভূতিভূষণকে ঠিক আধুনিক ধারার লেখক হিসেবে গণ্য না করে বিশেষ এক ধরনের লেখক হিসেবে ধরে রেখেছিলাম। একটা ব্যাপার অনুভব করতাম। অনেক বই ভালো লাগলেও কিছুদিন পর সবটা মনে থাকে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখাগুলি মনে গেঁথে যায়। আমি কোনো নির্জন রেলস্টেশনে, কিংবা গ্রামের রাস্তায় কিংবা জঙ্গলের প্রান্তে এক-একটা মানুষকে দেখে চমকে উঠেছি। ঠিক যেন বিভূতিভূষণের এক-একটি চরিত্র। সারা বাংলায় বিভূতিভূষণের যত চরিত্র আজও ছড়িয়ে আছে, তত বোধহয় আর কোনো লেখকের নেই।

মাত্র বছর পাঁচেক আগে, কিছুদিন জ্বরে ভোগার সময় শয্যাবন্দি হয়ে হাতের কাছে অর কোনো বই না পেয়ে বিভূতিভূষণের রচনাবলি পড়তে শুরু করি। এর মধ্যে আমার জীবন ও মানসিকতায় বহু পরিবর্তন এসে গেছে। *পথের পাঁচালি*-র চেয়ে *অপরাজিত* এক সময় আমার উৎকৃষ্টতর মনে হত। এবার *পথেই পাঁচালি*-ই বেশি ভালো লাগল। দেবযান পড়তে পড়তে অসমাপ্ত রেখে আমি আবার শুরু করলাম *আরণ্যক*। কাহিনি অংশ সম্পূর্ণ মনে আছে। তবু প্রতিটি পৃষ্ঠাকে যেন আবিষ্কার করতে লাগলাম নতুনভাবে।

সবচেয়ে বেশি ভালো লাগল তাঁর ভাষা ও স্টাইল। আগে স্টাইল বা আঙ্গিক সন্ধানে কী ভুল ধারণাই না ছিল। ভাষার বেশি বেশি চাকচিক্য, শব্দ নিয়ে মল্লযুদ্ধ, প্যাঁচালো বাক্য গঠন আসলে নিকৃষ্ট স্টাইল, রচনায় এনে দেয় আড়ম্বরতা ও কৃত্রিমতা। যাঁরা বড়ো শিল্পী তাঁরা ভাষাশৈলীর পিছনে যে প্রচেষ্টা তা সযত্নে মুছে দেন। সহজ সরল ভাষা রচনাই সবচেয়ে কঠিন। 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি'। জীবনানন্দ দাশের এই ধরনের লাইন মনে হয় যেন অতি সাধারণ, কিন্তু কতখানি যত্নে, কত চিন্তা করে যে তিনি এইরকম পঙ্‌ক্তি রচনা করেন, তা বোঝা যায় তাঁর পাণ্ডুলিপি দেখে। তাঁর সমসাময়িক কিছু কবি কত চতুর, কত উজ্জ্বল বাক্যবন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলি আর মনে দাগ কাটে না, অথচ জীবনানন্দের কবিতা অমলিন রয়ে গেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর বৈদগ্ধ্যের কথা আমরা জানি, কিন্তু *ঢোঁড়াই চরিত মানস* রচনার সময়ে ভাষাকে তিনি সাধারণ স্তরে

নামিয়ে এনেছে, কোথাও লেখকের কেরামতি দেখে হোঁচট খেতে হয় না। সেইজন্যই ওই বই বারবার পড়া যায়। বিভূতিভূষণের *আরণ্যক*-এর ভাষার সারল্যও ইচ্ছাকৃত, *পথের পাঁচালি*-র চেয়েও এই ভাষা বেশি সরল এবং তাঁর বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী।

আরণ্যক-এ শরীরের জ্বালার কথাও একেবারে অনুপস্থিত নয়। এই উপন্যাসে সবরকম উত্তেজক ঘটনাই সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। অরণ্যটি শ্বাপদসংকুল, হিংস্র জানোয়ারদের উপস্থিতির কথা আমরা জানি, তবু কোথাও তাদের বর্ণনা নেই। কোথাও শিকার করার বর্ণনা দেননি লেখক, অথচ বোঝা যায় অনেক সময়ই জন্তুজানোয়ার শিকার করা হয়েছে। তখন গাছ কাটা বা প্রাণী হত্যা কোনোটাই নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু লেখক যে একবার একটি নীলগাইকে মারতে গিয়েও মারেননি, শুধু সেই কথাটাই জানিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষেরা এসে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছে, প্রথম প্রথম নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, মারামারি হওয়া স্বাভাবিক। তার কোনো উল্লেখ নেই। একবার আছে শুধু জমির লড়াইয়ের কথা। তিনি শুধু মানুষের বেঁচে থাকার জেদের দিকটার কথাই লিখতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে সবকিছুই চাপা সুরে। সেই কারণে নারী-পুরুষের পারস্পরিক টানের কথাও প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যথাসম্ভব।

বিভূতিভূষণ যে প্রেমের তীব্রতা বা যৌন আকর্ষণ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন কিংবা শুধু মানুষের ভালোমানুষির কথাই লিখে গেছেন, তাও ঠিক নয়। তাঁর *অথৈ জল* নামে উপন্যাসটি বগুপঠিত নয়। সেই উপন্যাসে তিনি যেন হঠাৎ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন, এবং শহুরে প্রেম দেখাতে গিয়ে আমদানি করেছিলেন অনেকখানি আদিরস। কিন্তু সব লেখকের কলম সব দিকে খোলে না। ও পথ বিভূতিভূষণের নয়। *আরণ্যক*-এ অবিবাহিত যুবকটির নারীসঙ্গ বাসনা বা রূপানুরাগ সম্পূর্ণ উহ্য নয়। অসাধারণ মুনশিয়ানায় দু-একটা আঁচড়ে মাত্র তা ফুটিয়েছেন। এই কাহিনিতে প্রধান স্ত্রী চরিত্র তিনটি : মঞ্চী, কুন্তা ও ভানুমতী। যেন নারীর তিনটি রূপ। বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী বধূর সঙ্গে লেখকের বেশ একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও এ মেয়েটি ছিল খানিকটা রহস্যময়ী। এই মঞ্চীর প্রতি লেখকের টান ফুটে ওঠে একটিমাত্র বাক্যে। স্বামীর বুদ্ধির দোষে মঞ্চীর একমাত্র পুত্রটি মারা যায়। কিছুদিন পর অভিমান করে মঞ্চী বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় অন্য কারুর সঙ্গে। নক্‌ছেদী যখন এই কাহিনি লেখকের পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে শোনাল, তখন বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নাই। যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য।'

আদিবাসী রাজবংশের কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়ে একটু বেশি। তিনি তাকে আয়না কিনে উপহার দিয়েছেন। দুজনে নির্জন পাহাড়ের ওপর পাথরখণ্ডের ওপর বসে গল্প করেছেন, অঙ্গস্পর্শ পর্যন্ত এগোননি বিভূতিভূষণ। এই

মেয়েটির কথা লেখার সময় তাঁর মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল। একবার তাকে প্রায় যুবতী বলেও পরে আবার তাকে কিশোরীতে পরিণত করেছেন এবং শেষের দিকে প্রকাশ করেই ফেলেছেন, 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।'

একসময়ে বাংলা সাহিত্যে বড়ো সাদা কালোর উপদ্রব হয়েছিল। কিছু কিছু চরিত্র একেবারে সাদা। তারা সৎ, সরল, অত্যাচারিত, নিপীড়িত। আর কিছু কিছু চরিত্র কুচকুচে কালো, যারা জমিদার, মহাজন, কারখানার মালিক বা জোতদার। সব কাহিনিতেই এই দুই শ্রেণির লড়াই, অবাস্তব, রক্তমাংসহীন, কার্ডবোর্ডের মানুষ। শিল্পীর চোখ সব মানুষের মধ্যেই মানুষকে খোঁজে। ধাওতাল সাহু কিংবা যুগলপ্রসাদের মতন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আগে দেখা যায়নি। ধাওতাল সাহু একজন বিত্তবান, মহাজন, বেশির ভাগ আধুনিক উপন্যাসেই সে অত্যাচারী, ব্যভিচারীরূপে দেখা দিত। কিন্তু এমন মানুষও থাকে, যে ঋণ নিয়ে তাগাদা দেয় না, বিনা দ্বিধায় দলিল ছিঁড়ে ফেলে। এমনই লাজুক ও ভদ্র সে যে ঋণ গ্রহণকারীর বাড়ির ধারকাছে দিয়েও হাঁটে না। আর যুগলপ্রসাদ নিঃস্বার্থভাবে জঙ্গলে নানান ফুলগাছ লাগিয়ে যায়। তার নিজস্ব উদ্যান নেই। পৃথিবীটাকেই সুন্দর করে দিতে চায় সে। সামান্য ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে খেয়ে যারা বেঁচে থাকে, তারাও হাসে, তাদের জীবন থেকেও সৌন্দর্যবোধ একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমাদের আপ্লুত করে। আসলে যা চিরকালীন, সেটাই প্রকৃত আধুনিক।

এই লেখাটা শুরু করার সময় ভাবলাম, আবার বিভূতিভূষণের লেখাগুলি একবার পড়ে নিই। পড়তে পড়তে আবার মশগুল হয়ে যাই। অন্য সব কাজ পড়ে থাক। সবসময় মনে হয়, সেমিনারে গিয়ে বকবক করে কী হবে, তার চেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই রচনাগুলি পড়াই তো প্রকৃত আনন্দের।

অপ্রকাশিত ঐশ্বর্য

এমন কি হতে পারে, যেসব গুপ্ত ছাপাখানা থেকে জাল নোট নির্গত হয় সেইরকমই কোনো জায়গা থেকে জীবনানন্দ দাশের একের পর এক অপ্রকাশিত গ্রন্থ বেরিয়ে আসছে? এবং এই কাণ্ডটির হোতা ভূমেন্দ্র গুহ? নইলে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও জীবনানন্দের নতুন নতুন উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ আমরা দেখছি কী করে? বিশ্বসাহিত্যে এমন অলৌকিক কাণ্ড আগে কখনও ঘটেনি। অনেক কবির অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত কিছু কিছু কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এত রাশি রাশি পৃষ্ঠার গদ্য, যা জীবদ্দশায় জীবনানন্দ প্রকাশের কোনো চেষ্টাই করেননি, পাঠক-প্রত্যাশা করেননি। 'মা ফলেষু'-র এমন দৃষ্টান্ত কি বাস্তব-সম্ভব?

এই অনুমানটি অঙ্কুরেই বাতিল করতে হয় শুধু এই কারণে, জীবনানন্দ দাশের কয়েক লাইনও কবিতা বা গদ্যের নিজস্ব রীতি নকল করার ক্ষমতা বাংলা ভাষায় আর কারও নেই। এমনকি জীবনানন্দে নিমজ্জিত ভূমেন্দ্র গুহরও নেই। তাঁকে অনুসরণ করাও অসাধ্য। সুতরাং রচনাগুলি অবশ্যই মৌলিক এবং অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যায় জীবনানন্দ ভূ-ভারতে অতুলনীয় হয়ে রইলেন।

প্রতিক্ষণ প্রকাশন মোট বারো খণ্ড জীবনানন্দ রচনাবলি প্রকাশের পর ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর সমুদয় অপ্রকাশিত রচনার এখানেই শেষ। কিন্তু জাদুকর পি সি সরকারের ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার মতন এ বিষয়ের শেষ বলে কিছু নেই, এ বছরেরই গোড়ার দিকে আবার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটি উপন্যাস, একটি ছোটোগল্প সংকলন এবং একটি কবিতার বই। একসঙ্গে তিনটি গ্রন্থের প্রকাশ অতি জনপ্রিয় লেখকদের ভাগ্যেও ঘটে না। এবং এরকম যে আরও অপ্রকাশিত রচনা রয়ে গেছে, সে আশ্বাসও পাওয়া যায়। জীবনানন্দের এইসব পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ঔচিত্য বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে কোনো কোনো মহলে। তাঁদের বক্তব্য এই, কবি স্বয়ং এগুলি প্রকাশের উপযুক্ত মনে করেননি, অনেক অপ্রকাশিত কবিতাই তাঁর পূর্বপ্রকাশিত কিছু কবিতার খসড়া মাত্র। কিছু রচনা

নিতান্তই হাতমকশো করার মতন অকিঞ্চিৎকর। এতে একজন কবির খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়। আবার অন্য পক্ষের বক্তব্য, যে-কবি বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সমস্ত রচনাই প্রকাশযোগ্য, পৃথকভাবে কোনো কোনো রচনা সার্থক না হলেও সামগ্রিকভাবে এইসব রচনার মধ্যে ফুটে ওঠে কবির সম্পূর্ণ মনোজগৎ, তাঁর নির্মাণপদ্ধতি, তাঁর সময়-চেতনা। আর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত এতগুলি গদ্য রচনা জীবনানন্দর সম্পূর্ণ অন্য একটি পরিচয় এনে দিয়েছে, যা শুধু বিস্ময়করই নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও স্থান করে নেবে।

আমি এই দ্বিতীয় মতটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করি। জীবনানন্দের যে-কোনো টুকরোটাকরা রচনা সম্পর্কেও আমি আগ্রহী। কবিতায় পাঠান্তর বা খসড়াগুলি দেখলে কবির খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে কেন? তবে, আফসোস এই, জীবনানন্দের অনেকগুলি খাতা ভরতি ডায়ারি। যাদের অস্তিত্বের কথা আমরা জেনে গেছি, সেগুলি নাকি কবির উত্তরাধিকারীগণ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। জীবনানন্দ সরাসরি আত্মজীবনীমূলক কিছু রেখে যাননি, তাঁর প্রাত্যহিক ডায়েরিতেই রয়ে গেছে তাঁর জীবনীর উপাদান, গবেষকদের পক্ষে সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় তো বটেই, সাধারণ পাঠকদের কাছেও আকর্ষণীয়। আর দশ বছর পর আর কারও অনুমতি নিতে হবে না। তখন প্রকাশিত হতে পারবে বিনা বাধায়, আশা করি এই দশ বছরের মধ্যে সেই অমূল্য খাতাগুলি নিরুদ্দেশে চলে যাবে না।

নতুন উপন্যাসটির নাম *সফলতা-নিষ্ফলতা*। এ নাম লেখকের দেওয়া নয়, পাণ্ডুলিপিটি ছিল নামহীন। বিষয়বস্তুর নিরিখে গ্রন্থ সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ এই নাম দিয়েছেন, তা বেমানান হয়নি। তবে জীবনানন্দ সরাসরি নাম দেওয়া পছন্দ করতেন না। যেমন 'রূপসী বাংলা' নামটিও তাঁর মনোনীত নয়, পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় লিখে গিয়েছেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'। সেইরকম, এই উপন্যাসেরও হয়তো নাম হতে পারত, 'কল্পনার জয়স্তম্ভ শুধু নয়'।

গ্রন্থটির আকৃতির বিষয়ে আগে কিছু বলা দরকার। মোট ২৭২ পৃষ্ঠা, টাইটেল পেজ সমেত। প্রকাশকের নিবেদন দু-পাতা। সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহর প্রাক্‌কথন ১৬ পৃষ্ঠা এবং গ্রন্থশেষে টীকা ও নির্দেশিকা ১২০ পৃষ্ঠা। এবং মূল কাহিনি অংশ ১২২ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ কাঁকুড়টির থেকে তার বীজ বেশি লম্বা। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়, অনেক গবেষণাগ্রন্থে এরকম দেখা যায়। তবে কোনো উপন্যাসের এমন তথ্যপঞ্জি সাজানো অবশ্যই অভিনব। ভূমেন্দ্র গুহ সদ্য কৈশোর-উত্তরকালে জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিক্ষানবিশি চিকিৎসক হিসেবে গুরুতর আহত অবস্থায়, মৃত্যুশয্যায় দেখেছেন কবিকে, তারপরেও কবির পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। পরবর্তীকালে অত্যন্ত সফল ও ব্যস্ত চিকিৎসক হয়েও তিনি এক গুরুদায়িত্ব কাঁধে বহন করে চলেছেন সুদীর্ঘকাল, তা হল জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত রচনার পুনরুদ্ধার। সে কাজ যে কত কঠিন তা প্রত্যক্ষদর্শীরা ছাড়া অন্য কেউ বুঝবেন না। পাণ্ডুলিপির খাতাগুলি খুবই পুরনো,

সত্তর-আশি বছর আগেকার, লালচে হয়ে গেছে পাতা, জীবনানন্দর হস্তাক্ষর খুবই খুদে খুদে এবং জড়ানো। খাতাগুলি খুব যত্নেও রাখা হয়নি, খাটের তলায় বোঁচকা বাঁধা অবস্থাতেও পাওয়া গেছে অনেকগুলি, কিছু কিছু অংশ জল লেগে ঝাপসা। অসীম ধৈর্য নিয়ে চোখের সামনে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস রেখে সেইসব রচনার প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে হয়েছে। ভূমেন্দ্র এ সবই করেছেন নিঃস্বার্থভাবে, বলা যেতে পারে, এ তাঁর ভালোবাসার ঋণ। এই গ্রন্থটি নির্মাণে, বিশেষত শেষের দিকে সুদীর্ঘ টীকা-তথ্যপঞ্জিতে যে পরিশ্রমের চিহ্ন আছে তা দেখলে শ্রদ্ধাবনত হতেই হয়। এত বেশি তথ্যের হয়তো প্রয়োজন ছিল না। কিছু কিছু অকিঞ্চিৎকর, তবু খাটতে হয়েছে তো প্রচুর! অবশ্য এই তথ্য সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছেন আর-একজন গবেষক, গৌতম মিত্র।

মূল উপন্যাসটি অবশ্য মোটেই জটিল নয়, বরং এলোমেলো বলা যায়। মাঝে মাঝেই খেই হারিয়ে গেছে। প্রথমে শুরু হয়েছে শিয়ালদার কাছে একটি মেসবাড়ি বা বোর্ডিং-এর বর্ণনায়। সেখানকার নানান ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী অধিবাসী, দুর্মুখ ম্যানেজার, ততোধিক বেয়াদব ভৃত্য, যাচ্ছেতাই রকমের খাওয়াদাওয়া, রাজনীতির আলোচনা এবং ধবল কাকাতুয়া-পরির মতন এক কিশোরী। এর মধ্যে রয়েছেন এক লেখক, খুবই গরিব এবং চাকরি গেছে কিছুদিন আগে, ভাইয়ের পাঠানো টাকায় কোনো রকমে দিন চলে, সেই লেখক ঠিক নায়ক না হলেও উত্তমপুরুষের পর্যবেক্ষক। এরকম মেসবাড়ি পরিবেশ নিয়ে অনায়াসে উপন্যাস রচিত হতে পারে। যেমন চলন্ত ট্রেনের কামরা কিংবা নদীর ধারে কয়েক ঘর বসতি নিয়েও উপন্যাস হয়। কিন্তু কিছু পৃষ্ঠার পরেই লেখক এই মেসবাড়ির পটভূমিকার কথা যেন ভুলেই গেলেন।

ঘটনাকাল ১৯৩২, তখন সারা দেশের বড়ো দুঃসময়। সমস্ত পৃথিবীতেই আর্থিক মন্দা। অবিভক্ত বাংলায় এম এ পাস করা ছেলেরাও বেকার। জীবনানন্দ দাশও কিছুদিন আগে তাঁর অধ্যাপনার চাকরি খুইয়েছেন। প্রধান চরিত্র নিখিলের মধ্যে স্পষ্ট জীবনানন্দের আদল। এটা তাঁর আত্মজীবনীর একটি খণ্ডচিত্রও বলা যায়। এখানেই জানা যায়, তিনি একটি উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছেন এবং আগেই ছ-সাতটা উপন্যাস লিখে ফেলেছেন কিন্তু প্রকাশের চেষ্টা করেননি।

শুধু তিরিশের দশকের সেই দুর্দিনের কথাই নয়, এর মধ্যে আরও আছে কল্লোল যুগের সাহিত্যগোষ্ঠীর খানিকটা পরিচয়। সেই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে দুটি চরিত্র। বাণেশ্বর এবং শংকর। বাণেশ্বরের মধ্যে প্রায় স্পষ্টভাবেই চেনা যায় বুদ্ধদেব বসুকে, কোথাও কোথাও ছায়া ফেলেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং দু-এক ঝলক বিষ্ণু দে। আর শংকর চরিত্রের আড়ালে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিছুটা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কদাচিৎ প্রবোধকুমার সান্যাল। এঁরা সবাই বয়সে জীবনানন্দের চেয়ে কিছু ছোটো, তবু বন্ধুস্থানীয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরিচিত হয়েছেন কবি হিসেবে,

কিন্তু প্রথম থেকেই ওঁরা গল্প-উপন্যাসও লিখছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে লেখেন *পাঁক* উপন্যাস, অচিন্ত্যকুমার কুড়ির আগেই উপন্যাস লিখেছেন *বেদে* আর বুদ্ধদেব বসুও *কল্লোল*-এর পৃষ্ঠায় 'রজনী হলো উতলা'-র মতন গল্প লিখে হইচই ফেলে দিয়েছেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এঁদের সাত-আটখানি করে বই প্রকাশিত হয়ে গেছে, কলম চালনা করে কিছু কিছু, কখনও সামান্য হলেও অর্থ উপার্জন করেছেন। আর জীবনানন্দ কবি হিসেবে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছেন, তাও তেমন খ্যাতিমান নন। লিখে কিছুই প্রাপ্তি নেই। সুতরাং বন্ধুরা তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন গল্প-উপন্যাস লিখতে। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে সেসব ছাপিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। উপন্যাসের অনেকখানি অংশ এই সংলাপেই ভরতি। এর মধ্যে আবার বাণেশ্বরের চরিত্রে যে তিনজনের ছায়া আছে, তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত, তাই তাঁদের কথার মধ্যে এসে গেছে বিদেশের বহু স্থান, নাম, সাহিত্যপত্রিকার উল্লেখ, যেমন *আটলান্টিক মান্থলি*, আনাতোল ফ্রাঁস, হাক্সলি, অ্যাডাম স্মিথ, *ইংলিশ রিভিয়ু*, এডগার ওয়ালেশ, এইচ জি ওয়েলস, কিউবিক আর্ট, কিটস, ক্রোচে, বার্নার্ড শ, হার্ডি, এলিয়ট, এমনকি রিচার্ড ক্রশ-এর মতন মাইনর কবিও। প্রেমেন্দ্র শৈলজার বরং অমন ইনটেলেকচুয়াল গর্ব নেই। তাঁদের জীবন নানান বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, উপদেশগুলিও সেরকম।

নিখিল অর্থাৎ জীবনানন্দের মনোভাব যেন প্রথম থেকেই, 'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে'। বন্ধুদের এসব পরামর্শ কিংবা প্ররোচনাতেও তিনি উত্তেজিত হন না। চাকরি নেই, প্রবল অর্থাভাব, তবু উদ্যম নেই চাকরি খোঁজার। হঠাৎ একটা কিছু পেলেও নিতে চান না। কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা না করে লিখে চলেছেন। জীবনে প্রেম নেই, তবু কথা বলতে যান না কোনো নারীর সঙ্গে। এটাই তাঁর চরিত্র, এইরকমই তিনি। এই নিরুদ্যম ও হতাশার মধ্যেও তিনি যে সারা জীবনে মাত্র ১৬২টি কবিতা ছাপিয়ে গেছেন, তার ফল কী হয়েছে, তার সাক্ষ্য আছে পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

উপন্যাসটি অসমাপ্ত, আচমকা থেমে গেছে দুজনের সংলাপের মাঝখানে। এখানে পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যায়। মনে হয় আরও থাকলে ভালো হত। আমার একটা ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তিও হয়েছে। বাণেশ্বর যেখানে পুরোপুরি বুদ্ধদেব বসু, সেখানে জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় মনে হয় প্রকৃত হৃদ্যতা নেই, বরং জীবনানন্দের ব্যবহারে রয়েছে সূক্ষ্ম বিদ্রুপ। বাণেশ্বর দ্রুত বিখ্যাত হয়ে উঠছেন, নিজেকে মনে করছেন, তরুণদের মধ্যে প্রধান লেখক, একসময় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হবেন, তাঁর সত্তর বছরে পাবেন রবীন্দ্রনাথেরই মতন সংবর্ধনা— এসব কথা কোনো তরুণ লেখক কৌতুকচ্ছলে বলতেই পারেন, কিন্তু নিখিলের ভাষ্যে এর মধ্যে কৌতুক নেই, আছে আত্মম্ভরিতা। বাণেশ্বর নিখিলকে যে সাহায্য করতে চাইছেন, নিখিলের ধারণায়, তা আন্তরিক নয়, বরং পিঠ চাপড়ানির ভাব। অথচ আমরা জানি, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসু নিঃস্বার্থভাবে

জীবনানন্দ দাশকে পাঠকসমক্ষে পরিচিত করাবার চেষ্টা করেছেন। বার বার লিখেছেন তাঁর সম্পর্কে। তবু তাঁর প্রতি জীবনানন্দের এই মনোভাব ছিল? হতেও পারে, অনেক সময় কৃতজ্ঞতা একটা অতিরিক্ত বোঝার মতন ঘাড়ে চেপে বসে, তা ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। অনেক মানুষ উপকারীকেই দংশন করতে চায়।

সব মিলিয়ে, অর্থাৎ মূল টেক্সট ও সুদীর্ঘ তথ্যাবলিতে বইটি খুবই আকর্ষণীয়। আমি আমার কতিপয় প্রিয় গ্রন্থের পাশে এই 'সফলতা-নিষ্ফলতা'কে রেখে দেব।

সমরেশ ও অন্যান্য গল্প সংগ্রহটিতে আছে তেরোটি গল্প। এর মধ্যে কয়েকটি গল্প 'সফলতা-নিষ্ফলতা'র সমসাময়িক। কয়েকটি আবার চল্লিশের দশকের শেষে, দেশভাগের সময় রচিত। প্রথম পর্বে সেই বেকারজীবন ও দারিদ্র্যের কষ্ট যেমন ছিল, দ্বিতীয় পর্বেও ঠিক তাই। ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর সপরিবারে চলে এসেছেন কলকাতায়, আশ্রিত থেকেছেন ছোটো ভাইয়ের বাড়িতে, অনিশ্চয়তাময় জীবন। এসময়ের চিহ্নগুলি গল্পের মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের কথা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ নেই। দু-তিনটি ছাড়া, আর সব গল্পের আকারই বেশ ছোটো, ছোটোগল্প না বলে অণুগল্প বলা যায়। এবং গল্পগুলির আরম্ভ এমন চাঁছাছোলা গদ্যে লেখা যে, তার মধ্যে কবি জীবনানন্দ দাশের চিহ্নমাত্র নেই। তারপর বাক্যগুলি জটিল হয়, চলে যায় পরাবাস্তবতার দিকে। এবং থেমে যায় অকস্মাৎ। গল্পগুলির এরকমই চরিত্র। অন্তত একটি গল্পকে মনে হয় একেবারে বিদেশি গল্পের মতন, নাম, 'ছাদে বসে'। ছাদে বসে এক প্রৌঢ় তাঁর ছাত্রবয়সের গল্প বলছেন। পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়ার সময় সব ছাত্রেরই ঘুম এসে যায়, বারবার চা-সিগারেট খেলেও চোখ ঢুলে পড়ে। মেসের এক বাসিন্দা পরামর্শ দিল চায়ের বদলে কফি খেতে। কয়েকজন মিলে একটা কফির টিন কেনা হল। তাতে কাজ হচ্ছিল বেশ, তবে এক রাতে দেখা গেল, সেই টিনে এক টিপ নস্যির মতনও কফি অবশিষ্ট নেই। এখন উপায়? কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এক চায়ের দোকানে নাকি কফি পাওয়া যায়। অন্যরা আলস্য করে যেতে চাইল না, একাই বেরিয়ে পড়ল গল্পের নায়ক। রাস্তা শুনশান, তবু খোলা আছে দার্জিলিং কেবিন। হ্যাঁ, কফি পাওয়া যাবে। সুন্দর সাজানো দোকান, দেয়ালে ছবির বাহার, ফুলদানিতে তোড়া, শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর মখমল বেছানো। (হ্যাঁ, আমাদের কলেজ স্ট্রিটের এরকম দোকান খোলা, মাঝ রাতে।) নায়কটি কফিতে চুমুক দিচ্ছে, এমন সময় ঢুকল কচি মতন একটি মেয়ে। সে ওই ছেলেটিরই টেবিলে এসে বসে চাইল, এক কাপ কোকো।

'মেয়েমানুষকে সাইকেলে চাপতে দেখেছি, মোটর চালাতে দেখেছি, ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি... কিন্তু চায়ের দোকানে ঢুকতে দেখিনি।' তাও প্রায় মাঝরাতে, একা, চায়ের বদলে কোকো। মেয়েটির চোখে কোনো দুষ্টুমি নেই, কিন্তু কোনো কথা বলল না। দুজনেই নিস্তব্ধ, মুখোমুখি। যুবকটি আর-এক কাপ কফি চাইল, মেয়েটিও চাইল আর-এক কাপ

কোকো। তারপর রাত বারোটায় দোকান বন্ধ হবে, দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে এল রাস্তায়, এরপরেও কোনো কথা হল না। দুজনে দুদিকে।

সে রাতে ছেলেটির ঘুম আসবে না তো বটেই। পরদিন আবার সে গেল সেই চায়ের দোকানে। দোকানের মালিক জিজ্ঞেস করল, আপনি একটি ছাতা ফেলে গেছেন? কিছু না ভেবেই সে বলল, হ্যাঁ। মেসে ফিরে সে ছাতাটি ভালো করে দেখল। দিব্যি আনকোরা সুদৃশ্য ছাতাটি, প্যারাসুট সিল্কের, হাড়ের ডাঁট, সোনার বোতাম। এক কোণে ছোটো হরফে নাম লেখা, অলকা রায়, তারপর হরি ঘোষ স্ট্রিট, কিন্তু বাড়ির নম্বর নেই। ছেলেটি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল ছাতার মালিকের উদ্দেশে। সন্ধেবেলা এসে উপস্থিত ময়লা শার্ট পরা, ছোটো মতন 'মুদ্দোফরাশ' গোছের লোক। সে ছাতার বর্ণনা দিল বটে, কিন্তু তাতে কোনো নাম লেখা আছে কি না তা বলতে পারল না। তাকে ছাতা ফেরত দেওয়া হবে কেন? দুজনে তর্ক লেগে গেল। শেষপর্যন্ত লোকটি বলল, আমার স্ত্রী যা শিখিয়ে দিয়েছে, তাই বলছি। গাড়িতে আমার স্ত্রী বসে আছে।

ছেলেটি ভাবল, হায় রে, অলকা রায় তাহলে এই বিকট চেহারার লোকটির স্ত্রী? হতাশ হলেও সেই তরুণীর মুখখানা আর-একবার দেখার জন্য সে নেমে এল গাড়ির কাছে। আবার চমক! গাড়িটি খুব দামি বটে, কিন্তু তার মধ্যে বসে আছেন এক প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়াটি বললেন, আমার বোন ছাতাটি ফেলে গেছে, বড্ড আলাভোলা মেয়েটি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তার স্বামীটি আকর্ণবিস্তৃত হেসে বলল, এই ছাতা বানাতে লেগেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভেতরে অনেকগুলি হিরে।

প্রৌঢ়াটি বললেন, আপনি আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন অবশ্যই। অলি—অলকা আপনাকে কফি খেতে নেমন্তন্ন করেছে।

তিনি একটি সুদৃশ্য লেফাফা দিলেন, তাতে মেয়েলি ছাঁদে যুবকটির নামধাম, মেসের ঠিকানা সব লেখা।

এই পর্যন্ত বেশ রহস্যকাহিনির মতন জমে উঠলেও গল্পটি হঠাৎ এরপর শেষ হয়ে গেছে মাত্র কয়েক লাইনে আর-একটি চমক দিয়ে। সে চমকটি বেশ দুর্বোধ্য।

ছায়া আবছায় নামের কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলিও ১৯৩১ থেকে '৩৪-এর মধ্যে রচিত। এর প্রথম কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য।

চারদিকে রিট্রেঞ্চমেন্ট, বিজিনেস-ডিপ্রেশান/আমি বেকার/অনেক বছর ধরে কোনো কাজ নেই/কোথাও কাজ পাবার আশা নেই/একটা পয়সা খুঁজে বার করার জন্য/আমার সমস্ত শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে/পৃথিবী যেন বলছে : তোমার এই শক্তি : বরং তা/কবিতা লিখুক গিয়ে/আমি বলি : আমিও কবিতা লিখতে চাই/কিন্তু পেটে কিছু পাবো না কি/যার জোরে আশাপ্রদ কবিতা লিখতে পারা যায়/পৃথিবীর জয়গান করে/কিন্তু

তার বদলে পেটে কিছু পেতে চাই/ পেটে কিছু পেতে চাই।

বলাই বাহুল্য, এটা ঠিক কবিতা পদবাচ্য নয়, খসড়া মাত্র। কিন্তু এর মধ্যে এক কবির কী নিদারুণ দুর্দশার ছবি ও আর্তি ফুটে উঠেছে! এগারো লাইনে 'আশাপ্রদ' শব্দটি উল্লেখযোগ্য। পেট একেবারে খালি থাকলে আশার কথা কিংবা জীবনের জয়গান কি সম্ভব? পঙ্‌ক্তিগুলি পড়তে পড়তে যেন অবিশ্বাস্য মনে হয় যে 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবি এসব রচনা করেছেন! অবশ্য অন্য কিছু কিছু কবিতায় সেই কবিকে নিশ্চিত খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন 'মানুষ কোথায় হিতাহিত/ভুলে মানবত্বের মানে ফুরিয়ে ফেলেছে অন্ধকারে।' অথবা ৫৬ নং কবিতায়, 'সমুদ্রের পারে এই—/মনে হলো সবচেয়ে দূর দ্বীপ; যেন আসন্নতা/গ্রীস ট্রয় রোম কাঞ্চীর নব-বর্ষ কোনও দিন বানায় নি যাকে/সেই এক প্রাসাদের সনাতন ব্যথা/আকাশ রেখার পারে ফিকে নীল হয়ে/ দেখা দেয় যেন।'

২৩ নং কবিতায় একটি অত্যাশ্চর্য কথা আছে। 'গরিব বিধবা মোর'। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো মানুষ কি নিজের বিধবাকে দেখতে পায়? শুধু এই কবিই লিখতে পারেন, 'আমারই বিধবা যেন— সুন্দর একাকী।'

পূর্ণিয়া জেলার উইলিয়াম ফক্‌নার

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে এই উপন্যাসখানি সন্ত তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিতমানস'এর আদলে লেখা। তুলসীদাসের গ্রন্থখানি অন্তত চার শতাব্দী ধরে সারা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। বাঙালিরা অবশ্য এ বইয়ের স্বাদ তেমন করে পায়নি, বাঙালিরা রামায়ণ পেয়েছে কৃত্তিবাস মারফত। প্রতিভার নিরিখে তুলসীদাস অনেকটা ঝাপসা পরিচয়ের, কৃত্তিবাসের চেয়ে বহুগুণ বড়। তুলসীদাসের ভাষাও খুব দুর্বোধ্য নয়, অনেকটা ব্রজবুলির মতন। হিন্দু বাঙালিরা রামকেও দেবতা হিসেবে তেমন উচ্চে স্থান দেয়নি, তাদের আরাধ্য কৃষ্ণ কিংবা শিব। তুলসীদাসের প্রভাবে সমগ্র হিন্দিভাষী অঞ্চলে রামই একমাত্র ভগবান। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চলের অক্ষর পরিচয়হীন সাধারণ মানুষও জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে রামচরিতমানসের কোনো না কোনো শ্লোক থেকে নির্দেশ খুঁজে পান।

তুলসীদাসের নায়ক রাম, সতীনাথের নায়ক ঢোঁড়াই। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলে ছোট শহরটির নাম জিরানিয়া, রামায়ণের জীর্ণারণ্যের সঙ্গে এর মিল কষ্ট-কল্পনা করা যায়। তার অদূরে তাৎমাটুলি। তাৎমারা কোনো এককালে তাঁতি ছিল, এখন সে পেশা ভুলে গেছে, নিছক এটা-সেটা করে একবেলা পেট ভরাবার মতন অন্নসংস্থান করে। মধ্যে একটা পাক্কি, অর্থাৎ পাকা রাস্তা, তার ওপাশে মেথরদের বস্তি। এই দুই অন্ত্যজদের গ্রামই উপন্যাসটির মূল পটভূমি। তাৎমাটুলির ছেলে ঢোঁড়াই অতি অল্প বয়সে বাবাকে হারায়। তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করার সময়, ছেলেকে সঙ্গে রাখা সম্ভব নয় বলে তিন বছরের ঢোঁড়াইকে এক সাধুর পায়ের কাছে রেখে আসে। মহাকাব্যের নায়ক রামের সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠতে থাকে এই অনাথ ঢোঁড়াই।

উপন্যাসের এই পরিকল্পনাটাই বিস্ময়কর।

বাঙালিদের কাছে বিহার খুবই পরিচিত। বহু বাঙালি এককালে ছড়িয়েছিল বিহারের সর্বত্র, যাতায়াতও অনবরত। বাংলা সাহিত্যে বিহারের কিছু কিছু ছবি পাওয়া গেছে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। সে সবই আংশিক। বিহারের দরিদ্র, সাধারণ মানুষের কথা আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকে। খুবই উচ্চাঙ্গের বই নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিভূতিভূষণ অতি রোমান্টিক, মানুষের চেয়েও প্রকৃতি তাঁর কাছে অনেক সময় প্রধান হয়ে ওঠে, তাঁর চক্ষু সবসময় সৌন্দর্যসন্ধানী। আরণ্যক-এর সঙ্গে ঢোঁড়াই চরিতমানসের কোনো তুলনাই চলে না।

অন্যান্য লেখকরা লেখেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সতীনাথের যেন কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। এমনকী তিনি যে বাঙালি লেখক, তাও কোথাও বোঝা যাবে না। অত্যন্ত কুশলতায় তিনি জিরানিয়া-তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলির যে জনজীবনের কথা লিখেছেন, তা যেন আপনাআপনি ফুটে উঠছে, লেখকের কোনো ভূমিকাই নেই এখানে। ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু চরিত্রগুলির সংলাপে, এমনকী বর্ণনাতেও অনর্গল দেহাতি হিন্দি শব্দ, তুলসীদাসের দোঁহার টুকরো ছড়ানো যে মনে হয়, সমগ্র উপন্যাসটি ওখানকার নিজস্ব ভাষাতেই রচিত। এই দক্ষতা তুলনাহীন, নিজেদের পরিচিত গণ্ডির বাইরের কথা যারা কিছুই জানে না, দেশ সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই নেই, সেইরকম একটা তুচ্ছ অঞ্চলের মানুষের ওপর গান্ধীজি ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে পড়তে পারে, তা সতীনাথের আগে আমাদের কেউ দেখাননি। এই মানুষগুলির অন্ন নেই, তবু একটা বিশেষ জীবনবোধ আছে, এমনকী সংস্কৃতিও আছে। সেইজন্যই উপন্যাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঞ্চলিক হয়েও সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

ঢোঁড়াই ছেলেটি দোষে-গুণে ভরা। একটি জীবন্ত চরিত্রকেই মডেল হিসেবে নিয়েছিলেন সতীনাথ। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সে ছাপিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব পরিবেশে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অঞ্চলটি একটু একটু বদলাচ্ছে। অতি ধীর ও সূক্ষ্ম সেই পরিবর্তন, সম্পূর্ণ নাটকীয়তা বর্জিত। এখানে কোনো উচ্চ আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইচ্ছাপূরণেরও কোনো স্থান নেই, সেই জন্যই এই বর্ণনা অসাধারণ। লকলক করছে প্রখর বাস্তব, কিন্তু আদিখ্যেতা করা হয়নি দারিদ্র্য নিয়ে।

অনাথ ঢোঁড়াই এক সময় গোরুগাড়ির চালক হল। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে তরুণ ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে তার পচ্ছিমে স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদে। তুলসীদাস বলেছেন, যদিবা আরশির ওপর নিজের ছায়া ধরে রাখা সম্ভব, কিন্তু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়। অত ভালোবেসেও স্ত্রীর কেন মন পাওয়া গেল না, তা বুঝল না ঢোঁড়াই, রাগে-দুঃখে সে বিবাগী হয়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ডে ঢোঁড়াই-এর অভিজ্ঞতার জগৎ আরো বিস্তৃত হয়। বিপ্লবী বা ক্রান্তিদলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। রামায়ণ ছাড়াও অন্যান্য কেতাবের কথা সে শোনে। নতুন রামায়ণ আর পুরনো রামায়ণে জট পাকিয়ে যায় তার মনে।

এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড বা পরপর আরো অনেক খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল সতীনাথের।

লিখলেন না, মধ্যপথে ছেড়ে দিলেন। প্রথম কারণ তাঁর অপূর্ণতাবোধ। তিনি ভেবেছিলেন, ঢোঁড়াইদের মতন মানুষদের চরিত্র মানস সরোবরের মতন বিশাল ও গভীর, সেটা তিনি ঠিক ফোটাতে পারছেন না। শিল্পী মাত্রেরই এরকম অতৃপ্তি থাকে, আমাদের আফসোস, কেন তিনি আরো লিখলেন না।

না লেখার আরো একটি কারণ তিনি কৌতুকচ্ছলে জানিয়েছেন। ঠিক করেছিলেন, তৃতীয় খণ্ডে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ঢোঁড়াইদের মনের রূপরেখার পরিবর্তনও ধরে রাখবেন। সে খণ্ডের নাম দেবেন 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। সে পরিকল্পনা শিকেয় তুলে রাখলেন, তার কারণ এই উপন্যাস বাংলার পাঠকরা ঠিক মতন গ্রহণ করেননি। বইটি বিক্রি হয়নি, প্রকাশক বেজার হয়েছিলেন। সতীনাথ ডায়েরিতে লিখেছেন, 'বইখানা যদি খুব বিক্রি হত, তাহলেও কি নায়কের চরিত্রের অপর্যাপ্ততার কথা তোমার মনে আসত? তা হলে কি তুমি, শুধু উত্তর ঢোঁড়াই চরিত কেন উত্তরোত্তর ঢোঁড়াই চরিত পর্যন্ত লিখে চলতে না?'

আমাদের অধীত বিদ্যার মধ্যে উইলিয়াম ফক্‌নারের কথা বিশেষ মনে পড়ে এই উপন্যাস প্রসঙ্গে। সতীনাথ ভাদুড়ী আজীবন পূর্ণিয়াতেই কাটিয়ে গেলেন। সেখানকার পারিপার্শ্বিকের যে-সমস্ত মানুষজন তিনি দেখেছেন, তাঁদের কথাই বেশি লিখে গেছেন। ফক্‌নারেরও একটা নিজস্ব অঞ্চল ছিল। নিজের বাসস্থানের কুড়ি মাইল গণ্ডির মানুষজন, সাদা, কালো বা লাল, তাদের কথাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একের পর এক উপন্যাসে। ফক্‌নারের সেই অঞ্চলটির নাম 'ইয়োকনাপাটাওফা কাউন্টি' (Yoknapatawpha County) যার ভিত্তিতে 'স্যারকুচয়ারি', 'লাইট ইন অগাস্ট', 'দা আনভ্যাংকুইশ্‌ড', 'দা হ্যামলেট', 'গো ডাউন মোজেজ' প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। আঞ্চলিক হয়েও সেগুলি সর্বজনীন।

ফক্‌নার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। যে-সব উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তার অনেকগুলিই তো আমরা পড়ে দেখি। সেই মানদণ্ডে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলার একাধিক লেখক নোবেল পুরস্কার অনেক আগেই পেতে পারতেন। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' অবশ্যই সে রকম পুরস্কারের যোগ্য। নোবেল কমিটির দুর্ভাগ্য, তাঁরা এরকম রচনার সন্ধান পান না।

ফক্‌নারের সঙ্গে তুলনাটা আরো কিছুদূর টানা যায়। ফক্‌নার বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাহবা পেলেও জনপ্রিয় হননি। জীবনের একটা সময় তাঁর বই বিক্রি খুবই কমে যায়, প্রকাশকরাও বিমুখ হন, চল্লিশের দশকের গোড়ায় ফক্‌নার প্রায় বিস্মৃত, একটিমাত্র বই ছাড়া আর কোনো বইই পাওয়া যেত না। ফক্‌নারের সৌভাগ্য, জীবদ্দশাতেই তিনি পুনরাবিষ্কৃত হন, রবার্ট পেন ওয়ারেন-এর মতন তরুণ লেখকরা তাঁর বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন, যার ফলে র‍্যান্ডম হাউজের মতন বড় প্রকাশক আকৃষ্ট হয়ে পুরনো বইগুলি

ছাপতে শুরু করে আবার, পুরস্কারও আসতে থাকে একে একে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস,'জাগরী'র জন্যই রবীন্দ্র পুরস্কার পান, অনেক মান্য সমালোচকের প্রশস্তিও পেয়েছেন, কিন্তু সে রকম জনপ্রিয়তা কখনো পাননি, বেঁচে থাকতে থাকতেই তা আরো কমতে থাকে। মৃত্যর কিছুদিন পরেই তিনি যেন বিস্মৃত লেখকের পর্যায়ে চলে যান, তাঁর বইগুলিও দুর্লভ হয়ে পড়ে। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' আর ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যু ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে।

১৯৭২ সালে সনাতন পাঠক নামে এক তরুণ কলমনবিশ সতীনাথ ভাদুড়ীর বইগুলির অপ্রাপ্যতা বিষয়ে আক্ষেপ করে একাধিকবার লিখেছেন এই 'দেশ' পত্রিকায়। তিনি এই পত্রিকায় তখন নিয়মিত সাহিত্য সংবাদ লিখতেন। তখন সতীনাথের দাদা ভূতনাথ ভাদুড়ী উক্ত সনাতন পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বইগুলি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করতে চান। কোনো বড় প্রকাশক আগ্রহী হন, তবে সনাতন পাঠকের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হন অরুণা প্রকাশনী। অচিরকালের মধ্যেই শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্যের অতি সযত্ন ও সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং সুমুদ্রিতভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে। সেই রচনাবলীই এখনও সুলভ।

ঢোঁড়াই চরিতমানস : সতীনাথ ভাদুড়ী
(দুই খণ্ড ১৯৪৯, ১৯৫১)

বিস্মৃত লেখক

পূর্ণিয়া শহরের ভাট্টাবাজারে বাস থেকে নেমেই মনে পড়ল সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা। আমার কাছে পূর্ণিয়া শহরের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর নামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একটি পেট্রোল পাম্প ও বেশ বড় আকারের মনোহারি দোকান। দোকানের পরিচালকরা বঙ্গভাষী! সেখানে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়িটা কোথায় ছিল বলতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

আমি পুনশ্চ সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম বললাম। তিনি ঠিক চিনতে পারলেন না, কিংবা ওই নামটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দোকানের অপর একজন পরিচালককে উদ্দেশ করে বললেন, এই দ্যাখো তো এই ভদ্রলোক কাকে খুঁজছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে আমার প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলাম। তিনি দু-এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি কার বাড়ি খুঁজছেন? ঠিকানা জানেন?

আমি বললাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি, যিনি লেখক ছিলেন।

সাধারণত কোনো সত্যিকারের লেখকের নামের আগে বা পরে, লেখক শব্দ ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে না। তবু অবস্থার বিপাকে করতেই হয়। সাহিত্য অনেকেই পড়ে না, অনেকেই সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য মানুষ মনে করে না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, পূর্ণিয়া শহরেও বাঙালিদের কাছে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম নিশ্চয়ই পরিচিত হবে, শুধু লেখক হিসেবে নয়, সমাজসেবক হিসেবেও।

দোকানের সেই পরিচালকদের কাছেও সতীনাথ ভাদুড়ীর নামটা পরিচিত ঠিকই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর এত বছর বাদে হঠাৎ তাঁর বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে প্রশ্ন শোনার কথাটা খুবই অপ্রত্যাশিত বলেই ধরতে পারছিলেন না।

বুঝতে পেরে বললেন, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন।

আমি রীপ ভ্যান উইঙ্কল নই যে, এ খবর জানব না। বললাম, আমি ওঁর বাড়িটা কোথায় ছিল, তাই জানতে চেয়েছি।

কেন, সে বাড়িতে গিয়ে কী করবেন। সেখানে তো কেউ থাকে না।

এবার আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম! সত্যিই তো, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ির খোঁজ করছি কেন? কী হবে সেখানে গিয়ে? আমরা নিজেদের অনেক গতিবিধির মানে জানি না। সতীনাথ ভাদুড়ীকে আমি কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখিনি, তাঁর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছে আমার হয়নি। এখন তাঁর বাড়িতে কেন যেতে চাই?

একটা ছুতো খুঁজে পেয়ে গেলাম। সতীনাথ ভাদুড়ীর নানা লেখায় তাঁর বাড়ির বাগানের উল্লেখ আছে। বাগান করা তাঁর প্রিয় ব্যসন ছিল। সহকারের সঙ্গে মাধবীলতা মেলাবার সেই বিখ্যাত কৌতুক। বললাম, ওঁর বাগানটা দেখতে চাই, খুব নাকি ভালো বাগান—

সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। সেসব বাগান-টাগান আর...। ভদ্রলোকের গলায় আফসোসের সুর ছিল। স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে কীসব চেষ্টা হয়েছিল, সেকথাও বললেন। তা সত্ত্বেও আমি বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম। বছর কয়েক আগের কথা, তখন বাড়িটার সদর ছিল তালাবন্ধ, গেটের সামনে আগাছা। এখন কী অবস্থা জানি না।

লেখকদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা কিংবা মৃত লেখকের বাগান দেখতে যাওয়া আমার স্বভাবের অন্তর্গত নয়। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে আমার দুর্বলতা অত্যধিক। বিশেষত যত দিন যাচ্ছে ততই বাংলাভাষার পাঠকদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে বিস্মরণ এসে যাচ্ছে বলে আরো বেদনাবোধ করি। ইদানিংকালের অনেক নবীন পাঠক এঁর নামও শোনেননি, এঁর অনেক বই এখন ছাপা নেই। এই লেখকের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা হবে না। সতীনাথ ভাদুড়ী জীবিতকালে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেননি কখনো, কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে দেখাশুনো করেননি বিশেষ, প্রায় সমস্ত লেখাই ডাকে পাঠাতেন। কোনোদিন সেরকম কোনো সভা-সমিতিতে যাননি। তিনি শুধু লিখতেন। এবং তাঁর লেখার সঙ্গে অর্থোপার্জনের সম্পর্কটাও ছিল অপ্রত্যক্ষ। এবং এরকম লেখক বাংলাভাষায় খুব বেশি জন্মায়নি। প্রথম বইটিতেই তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর পরের বইগুলিও ভারতবর্ষের সব কটি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। যদি পুরস্কার অর্থে স্বীকৃতি ও সম্মান বোঝায়। সতীনাথ প্রত্যেকটি বই লিখতেন নতুন পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এবং এই একজন বিরল জাতের লেখক, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে পেরেছেন নিজের রচনা থেকে।

তাঁর যে-কোনো বই পড়লেই বোঝা যায়, কী অসম্ভব শক্ত এই ধরনের বই লেখা। তাঁর রচনার গতি কোথাও দুর্বার নয়, বিন্দু বিন্দু রস চয়ন করে মৌচাক সৃষ্টির মতন। 'জাগরী' ছাড়া তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই আমার কাছে 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' দুই খণ্ড, 'অচিন রাগিণী', 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী', 'জলভ্রমি' এবং 'সঙ্কট'। ঢোঁড়াই চরিতমানসের কথা আমি বারবার নানা জায়গায় উল্লেখ করেছি। এরকম বিস্ময়কর বই যে-কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। এই বইখানি বাংলা আধুনিক ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।

রিক্ত সর্বহারাদের নিয়ে বাংলায় কিছুই লেখা হয়নি এই অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই অবশ্য ঢোঁড়াই চরিতমানস পড়েননি। পড়লেও বোধহয় পছন্দ হবে না। কারণ বইখানি শেষ পর্যন্ত শান্ত রসের। বস্তিবাসীর জোলো প্রেমকাহিনী যেমন এটা নয়, তেমনি এতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিকটাও বড় করে দেখানো হয়নি। নিদারুণ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের কথা আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে অধ্যাত্মরসে এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ সরল নিম্নবিত্ত মানুষ আশ্রয় ও সান্ত্বনা পেতে চায়, সতীনাথ ভাদুড়ী সেই জীবন-সত্যের কথাই বলেছেন। সাহিত্যের বিচারে বইটি আশ্চর্য সার্থক। বইটি সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজেরও খুব প্রিয় ছিল; কারণ অন্য একটি লেখায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এই বইটি পাঠকদের সমাদর লাভ পায়নি। যদি পেত তিনি বইটার আবার পরিমার্জন করতেন, আরও এক খণ্ড লিখতেন, বাংলা সাহিত্য সেই লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখার কথা ভাবলে বাংলাদেশের এই দুঃসময়ের কথাও মনে পড়ে। মনে হয় সত্যিকারের সৎ ও অকৃত্রিম সাহিত্যের আজ সমাদর নেই! এক-একজন লেখকের মৃত্যুর পরই পাঠকরা তাঁদের ভুলে যায়— হঠাৎ কোনো হুজুগে তাঁদের পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা হলে তা হলে জীবিতকালে কে আর অমরত্বের সাধনায় সাহিত্য রচনা করতে চাইবে? তাৎক্ষণিক হাতে-গরম লেখার যুগই বুঝি কায়েম হয়ে গেল!

বৈঠকী মেজাজের এক উপেক্ষিত সাহিত্যিক

পত্রান্তরে অনুজপ্রতিম লেখক শ্রী শৈবাল মিত্র কিছুদিন আগে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের খুব একচোট বকুনি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ এই যে, যখনই এই সব ব্যক্তিদের প্রশ্ন করা হয়, আপনারা গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য কী কী বই পড়েছেন, তখন অবধারিতভাবে প্রায় সকলেই কিছু ইংরিজি বই বা বিদেশি সাহিত্যের সুখ্যাতি শুরু করেন। তাঁরা কি বাংলা বই পড়েন না? নিজেরা বাংলাভাষার লেখক হয়েও অপর কোনো বাঙালি লেখকের রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না? না কি বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য কিছু লেখাই হয় না।

এই অভিযোগে সত্যতা আছে। পাণ্ডিত্য প্রমাণ করার জন্য অনেকেই বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন; পাণ্ডিত্য কিংবা স্নবারি যাই হোক, বাংলা বই-টই এর মধ্যে আসে না। কফিহাউসের বুদ্ধিজীবীদের হাতে বাংলা বই রাখার রেওয়াজ নেই। ঢেউয়ের মতন কখনো মার্কেজ, কখনো দেরিদা-গ্রামসি, কখনো টনি মরিসন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওষ্ঠের ওপর খেলা করে যান।

বিদেশি সাহিত্য ও তত্ত্বগ্রন্থ পাঠ করা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু বাংলাভাষায় আলোচনাযোগ্য কোনো গ্রন্থ লেখা হয় না, এমন যদি মনে করা হয় তা হলে বাংলাভাষা নিয়ে এত গর্ব করারই বা কী আছে? বিদেশি সাহিত্য পাঠ করলেই বরং বোঝা যায়, সম্প্রতি অন্যান্য ভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা বাংলার তুলনায় এমন কিছু আহামরি উচ্চাঙ্গের নয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ'-এর মতন উপন্যাস কিংবা জয় গোস্বামীর 'পাগলী, তোমার সঙ্গে'-র তুল্য কাব্যগ্রন্থ ইদানিং কোনো ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে?

যাই হোক, আমার পক্ষে এরকম পণ্ডিতিপনা কিংবা স্নবারি দেখাবার কোনো সুযোগই নেই; কারণ গত এক বৎসরে আমি বিদেশি সাহিত্য কিছুই পড়িনি! এমনকী ইংরিজি অক্ষরে লেখা নিতান্ত কয়েকখানা পুরনো ইতিহাস-জীবনীগ্রন্থ ছাড়া কোনো গল্প-উপন্যাস চোখেও দেখিনি! বন্ধুবান্ধবরা কেউ যখন সাম্প্রতিক কোনো সাড়া-জাগানো বইয়ের প্রসঙ্গ

তুলে জিজ্ঞেস করে,তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই ? আমাকে সসংকোচে স্বীকার করতেই হয়, না ভাই, পড়িনি! কিংবা বিদেশ থেকে ফিরে এলে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, ও দেশের হালফিল সাহিত্যের ধারা কী দেখলে, আমি মাথা চুলকোই। জানি না, খবর নেবার সময় পাইনি! লন্ডনে গিয়ে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আমি পুরনো পুঁথিপত্র ঘেঁটেছি, একটাও নতুন ইংরিজি কবিতার বই কিনিনি, এটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয়। এটা আমার একটা অধঃপতনের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হতে পারে। এক সময়ে আমি 'অন্য দেশের কবিতা' অনুবাদ করেছি, বিভিন্ন ভাষার সাম্প্রতিকতম কবিতা পড়া ও কবিদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আমার শখ ছিল!

কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে বিমানে ফিরছি, হাতে একখানা বই। ট্রেনে বা বিমানযাত্রায় বই পড়ার প্রকৃষ্ট সময়, বেশ মনঃসংযোগ হয়। দূর থেকে এক সহযাত্রী উঠে এল আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। সে আমার বহুদিন-পরিচিত, অতি ব্যস্ত ব্যুরোক্রাট, প্রতি সপ্তাহে একবার-দু'বার বিমানে হিল্লি-দিল্লি যাতায়াত করে, আমার সঙ্গে এরকম যাত্রাপথেই মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে সে আমার হাতের বইখানা দেখে আঁতকে উঠল। আমার হাতে 'নিবেদিতা লোকমাতা'। বিমানযাত্রীরা কেউই বাংলা বই পড়ে না। আমার পাঠ্য শুধু বাংলা বই নয়, 'ধর্মের বই'? এর আগে সে আমার হাতে দেখেছে আর্থার সি. ক্লার্কের 'স্পেস অডিসি ২০৬১', কিংবা টনি মরিসনের 'বিলাভেড', কিংবা অমিতাভ ঘোষের 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড'। চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে নিশ্চয়ই ভাবল, সুনীলকে তো জানতাম ধর্ম-টর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, হঠাৎ এত পরিবর্তন হয়ে গেল কবে, রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে নাকি!

না, আমি এখনও ধর্ম-আশ্রিত হইনি, কোনো মিশনে দীক্ষা নেবার প্রশ্নই ওঠে না। এইসব বই আমি পড়ছি প্রাণের দায়ে। কী কুক্ষণে আমি গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের ইতিহাসের পটভূমিকায় এক উপন্যাস ফেঁদে বসেছি, এখন তার জন্য উপাদান-সংগ্রহ ও তথ্য-যাচাই করতে করতে আমার সমস্ত সময় হরণ হয়ে যাচ্ছে! এখন হলদেটে রঙের, পোকায় কাটা, জীর্ণ পত্রপত্রিকা ও বইয়ের পৃষ্ঠায় আমাকে দিনের পর দিন দৃষ্টিক্ষয় করতে হয়। কোনো বইয়ের ফুটনোটে আর তিনটি অজানা বইয়ের নাম দেখলে সেগুলিও সংগ্রহ করার ঝোঁক চাপে। শুধু একবার নয়, কোনো বই বারবার পড়তে হয়, ইংরিজিতে যাকে বলে 'ইন বিটুইন দ্য লাইন্‌স', তা খোঁজার জন্য। এত মন দিয়ে ছাত্রবয়সে পড়াশুনো করলে আমি ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারতাম।

কত কবিতার বই-ই তো হাতে আসে, সব কি আর পড়া হয়? তবু আমি অনঙ্গমোহিনী দেবী নাম্নী এক কবির 'শোক-গাথা' কাব্যগ্রন্থটি পড়ছি কেন? কাব্যরসের সন্ধানেও নয়, প্রাণের টানেও নয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে, এই অনঙ্গমোহিনী ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের কন্যা এবং সেই রাজ্যের উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্মার পত্নী। কাব্য নয়,

নিছক ইতিহাসের উপাদান। এরকম প্রচুর নীরস গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে দু-একটি এমন বইও পাওয়া যায়, যা পাঠ করে আমি বিমল আনন্দ পেয়েছি। সেইরকম, অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এক লেখকের কিছু রচনার কথা এখানে জানাতে চাই।

স্বামী বিবেকানন্দর দুই ভাইয়ের নাম মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ প্রখ্যাত বিপ্লবী, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তারপর দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা হন। মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথই আমাদের আলোচ্য। মহেন্দ্রনাথ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অনুজের তুলনায় তিনি বিবেকানন্দের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন অনেক বেশি, কিন্তু তিনি মিশন বা মঠে যোগদান করেননি। তিনি দেশ-বিদেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন, বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল, অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও গেরুয়া ধারণ করেননি।

মহেন্দ্রনাথের বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দি ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশোর কাছাকাছি। বিস্ময়কর তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য। তাঁর অনেক বইই এখন খুবই দুর্লভ। 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' নামে বইটিই এখনও পর্যন্ত কিছুটা পরিচিত, যাঁরা পুরনো কলকাতা নিয়ে প্রবন্ধ বা গল্প-উপন্যাস লেখেন, তাঁদের কাজে লাগে।

মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যখন তাঁর গুটিকয়েক শিষ্য সংসার ত্যাগ করে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরানগরে ও আলমবাজারে আখড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করলেন, মহেন্দ্রনাথ সে-সব জায়গায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত মহারাজদের তিনি অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার লন্ডনে বক্তৃতা দিতে আসেন, তখন মহেন্দ্রনাথও পড়াশুনোর জন্য সেখানে ছিলেন, বেশ কিছুদিন তিনি অগ্রজের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণর প্রথম সারির শিষ্যদের জীবনের অনেক ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শী এই মহেন্দ্রনাথ। এইসব বিষয়ে তিনি অনেকগুলি স্মৃতিকথা লিখেছেন। 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' নামে লিখেছেন তিনটি বই, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'ও লিখেছেন তিন খণ্ডে। ভক্তিরসের কথা বাদ দিয়ে যারা বাংলাভাষায় রস-সাহিত্য পাঠে আগ্রহী, তাদের এই বইগুলি অবশ্যপাঠ্য।

মহেন্দ্রনাথকে অনায়াসেই বলা যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর পূর্বসূরি। বাংলাভাষায় বৈঠকী মেজাজের রচনার আদিপুরুষ হিসেবে যদি ধরা হয় হুতোম প্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহকে, তা হলে সেই ধারারই আর একজন প্রধান লেখক এই মহেন্দ্রনাথ। তাঁর বইগুলির গুরুগম্ভীর বা সাধু-সন্ন্যাসী জড়িত নাম দেখে হয়তো অনেকে বিমুখ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় রয়েছে প্রকৃত রসের ধারা এবং বাংলাভাষাকে নিয়ে ইচ্ছেমতন খেলা করার

দক্ষতা ছিল তাঁর। সাধু ও কথ্য ভাষার এমন সাবলীল সংমিশ্রণ খুব কম লেখকই ঘটাতে পেরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দর গদ্যরচনাও এই ধরনেরই, তাঁর গদ্যরীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অথচ মহেন্দ্রনাথ একেবারেই উপেক্ষিত, এটা একটা দুঃখের কথা। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬) নাম আকরগ্রন্থটিতে কত বিস্মৃত, অকিঞ্চিৎকর লেখকের নাম আছে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের উল্লেখমাত্র নেই!

সাধারণ মানুষ যাঁদের মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করে, তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বায়োগ্রাফি হয় না, হয়ে যায় হোজিওগ্রাফি। অর্থাৎ জন্মকাল থেকেই তাঁরা অসাধারণত্বে উন্নীত, কোনোরকম মানবিক দুর্বলতা যেন তাঁদের থাকতে পারে না, শ্রদ্ধা ও ফুলচন্দনে ঢেকে দেওয়া হয় তাঁদের ধুলো-মাখা পা। এর ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়। এর চেয়ে সাধারণ অবস্থা থেকে অসাধারণত্বের স্তরে ক্রমিক উত্তরণের কাহিনী অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক, সাধারণ মানুষ তার থেকে সত্যিকারের প্রেরণা পেতে পারে। প্রকৃত লেখক কখনো বাস্তব-বিমুখ হতে পারেন না। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীন রূপ ফোটাতে চান। কুমোরটুলির শিল্পীরা যখন দুর্গাঠাকুরের প্রতিমা গড়েন, তখন সামনের দিকটা হয় অপূর্ব সুন্দর, নিখুঁত বলা যেতে পারে, কত রকম তার সাজসজ্জা; কিন্তু পেছন দিকটা থাকে উদোম, অসম্পূর্ণ, এনকী খড়-বাঁশও বেরিয়ে থাকে। অর্থাৎ সামনের দিকটা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে জনসাধারণকে দেখানো হয়। পেছনের দিকটা রাখা হয় চোখের আড়ালে। কিন্তু খাঁটি কোনো শিল্পী বা ভাস্কর যখন মূর্তি গড়েন,তখন তিনি কোনো দিকটারই প্রতি অবহেলা করেন না। সন্ত-জীবনীকাররা ওই কুমোরটুলির শিল্পী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্যিক।

মহেন্দ্রনাথের রচনায় ধারাবাহিকতা নেই। যখন যে ঘটনা মনে পড়েছে, সেইভাবে লিখেছেন, ছোট ছোট এক একটি পরিচ্ছেদ, তাতে রচনাগুলি আরো চিত্তাকর্ষক হয়েছে। নিছক ঘটনা বর্ণনার বদলে তিনি মানুষগুলির চেহারা, পোশাক, মুখের ভাষার বৈচিত্র্য ও পরিবেশের নিখুঁত বিবরণ দিতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যর পর দশ-বারোটি যুবক ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই নিছক জেদের বশে বরানগরের একটি ভাড়া-বাড়িতে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই বাড়িটির বর্ণনা এই রকম, 'মঠের বাড়িটা অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটিতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে, শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থল। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতলের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে তো দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা-জানালাগুলির তক্তা খানিকটা আছে, খানিকটা নাই, ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ি তো সত্যিই ভূতের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তর দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ— যেটিকে কালী বেদান্তীর বা 'কালী তপস্বীর ঘর' বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ।... মেঝের উপর শয্যা স্থাপন করা হইয়াছিল, পালঙ্ক তখন একটাও

ছিল না। দানাদের ঘরে (কালী তপস্বীর ঘরটি ব্যতীত অপর যে একটি বড় গৃহ তাহার নাম 'দানাদের ঘর') বালন্দা পটপটীর খান দুই তিন মাদুর সংযুক্ত করিয়া মেঝেতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; অপর এক জায়গায় সতরঞ্চি রহিয়াছে— 'চোরের বিশ্বাসী', কোনো জায়গায় টানাটা রহিয়াছে, অপর জায়গায় পড়েনটা রহিয়াছে— জেলের জালবৎ। মাথার বালিশ-বালন্দার চ্যাটাইয়ের নীচে নরম নরম ইট দেওয়া। শীত করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শয়ন, বা তাহাতে শীত না ভাঙিলে রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তি লড়িয়া লওয়া; শরীর গরম হইলে শীত পলাইয়া যাইত।''

মঠের সেই আদিপর্বের এমন নিখুঁত বর্ণনা আর কেউ দেননি। মেঝেতে যে মাদুর পাতা হত, সেটা এমনই জরাজীর্ণ যে চোরেও ছোঁবে না, তাই 'চোরের বিশ্বাসী'। এই বর্ণনার সবচেয়ে কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে মাথার বালিশে হিসেবে নরম নরম ইট। 'নরম নরম ইট' কী বস্তু?

সেই মঠে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ছিল কীরকম? ''কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না ইহা স্থির করিয়া সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার যে চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্রখণ্ডের উপর তৎসমুদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়ে বসিতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন, কখনও বা তেলাকুচাপত্রের ঝোল হইত। জলপানের জন্য একটিমাত্র ঘটি ছিল। একটি বাটিতে নুন-লঙ্কার ঝোল থাকিত; সকলেই একগ্রাস করিয়া একবার ভাত মুখে লইতেন ও একবার ওই ঝোল হাতে করিয়া মুখে দিতেন, জিহ্বায় অত্যন্ত ঝাল ঝাল লাগিত। গুরুসেবা ও গুরুভাইকে সেবা করা একই, এই ভাবটি তখন অত্যন্ত প্রবল ছিল।''

কিন্তু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। কারণ এদের কাউকেই ভিখিরির মতন দেখতে নয়। স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছেলেরা যখন ভিক্ষে করে, তখন তাদের প্রতি মানুষের করুণার বদলে অবজ্ঞা ও সন্দেহই বেশি জাগে। এক সন্ন্যাসীর এক দিনের ভিক্ষে অভিযানের অভিজ্ঞতা এইরকম : ''যোগানন্দ স্বামী বলিতেন, 'একদিন আলমবাজারে একটি খোড়ো বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলুম। সকালে একটি স্ত্রীলোক মেটে দাওয়ার সম্মুখে উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। উঠানের সম্মুখে একটি নারকেল গাছ। গেরুয়াধারী যুবা পুরুষ ভিক্ষে করতে এসেছে, মাথা নেড়া, শিখাও নেই, কণ্ঠিও নেই, কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করছে না, এ তো বৈরাগী বাবাজী নয়, তবে এ লোকটা কে? স্ত্রীলোকটি দেখে তো রেগে অগ্নিশর্মা; বললে— যা মিন্সে, যা, এখানে ভিক্ষা পাবিনি; খেটে খেতে পারিস নি? দিনের বেলা ভিক্ষের ছলে সব ঘরদোরের সন্ধান নিয়ে যাবি, আর রাত্তিরে সিঁদ কেটে চুরি করতে আসবি।' এই বলে স্ত্রীলোটি রাগে গরগর হয়ে নারকেল গাছটার গোড়ায় শপ শপ করে ঝাঁটা মারতে লাগল।' যোগেন মহারাজ যদিও জমিদার-সন্তান এবং মহা

কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষুক, হাসিবার উপায় নাই। অগত্যা স্থিরচিত্তে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং মঠে পদার্পণপূর্বক নানাপ্রকার ব্যঙ্গচ্ছলে স্ত্রীলোকটির অভিনয় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'মাগীটার আছেটা কী? একখানা খোড়ো ঘর, দু'খানা ছারপোকাওয়ালা ছেঁড়া কাঁথা, আর শতেক তাপ্পি মারা একটি তামার ঘটি।'''

'কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না', এই শপথ অবশ্য বেশিদিন রাখা যায়নি, ভিক্ষান্নেও খিদে মেটাতে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য কয়েকজন চাঁদা দিতেন, সেই টাকায় মঠের কাজ চলত। সংসারীদের মধ্যে অনেকেই যদিও এই হুল্লোড়বাজ সন্ন্যাসীদের পছন্দ করতেন না। সেইসব সাধারণ মানুষের মনোভাব মহেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেছেন, ''সাধারণ লোকের ভিতরে কথা উঠিল, 'নরেনটা পাগল হয়ে গেছে,তার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কী বকে যে তার মাথামুণ্ডু নাই, আবার বলে বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ... আমরা তো কোনো কালে এসব কথা শুনি নাই বাপু। আর শিখেছেন কতকগুলি বচনের ঝুড়ি। কাজকর্ম করিবার নাম নেই, চাকরি-বাকরি করার নামগন্ধ মুখে নেই। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পেট ঠেসে আসে, আর কাজের মধ্যে কতকগুলি ছোঁড়াকে বখিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে নিয়ে কীরকম করছে সব— একটা কর্মনাশার দল করেছে।'''

মঠের জীবনে কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং রসে-বশে সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দও পরিহাসপ্রবণ, অন্য শিষ্যেরাও কেউ সবসময়ে গুরুগম্ভীর মুখ করে থাকতেন না, কেউ চাইলেও অন্যরা থাকতে দিতেন না। এঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন, বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন, কখনো কখনো ধ্যান ও আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, আবার এরই মধ্যে মধ্যে চলত নানারকমের হাস্যকৌতুক। সেইরকম অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায়। অধ্যাত্ম বিষয় ছাড়াও তাঁরা যে সাহিত্য ও ভাষা নিয়েও আলোচনা করতেন, তার একটি উদাহরণ:

''শিবানন্দ স্বামী কঠোর জপ-ধ্যান করিতেন, চক্ষু ঢুলুঢুলু বিভোর, মাঝে মাঝে হাসিতেন। তিনি তখন বড় কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। মাইকেল (বিষয়ে) কথাবার্তা শুনিয়া একদিন তাঁহার মনে খেয়াল হইল, বাংলাভাষার সংস্কার করিতে হইবে। তিনি আরম্ভ করিলেন, 'দ্যাখ, বাংলাভাষায় একটি ক্রিয়াপদের সহিত দুই-তিনটা শব্দ যোগ না করিলে ক্রিয়া হয় না। ওরূপ চলিবে না। অন্য শব্দ সংযোগ না করিয়া একটি মাত্র ক্রিয়াপদেতেই ভাব প্রকাশ পাইবে।' তিনি দাঁড়াইয়া কোমর কিঞ্চিৎ সামনের দিকে বক্র করিয়া ডানহাতের তর্জনী সম্মুখে চালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কেন, ইংরাজিতে হয়,বাংলায় হবে না কেন? এককথায় ক্রিয়াপদ করিতে হইবে।' একজন কৌতুক করিয়া বলিল, 'মহাপুরুষ আলুর দম করতে হবে। এটা এক কথায় কী করে হবে?' তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,'কেন, বলবে, আলুটা দমিয়ে দাও। দাঁড়াও, দাঁড়াও, লুচি ভাজবে কথাটা এক কথায় করতে হবে। আচ্ছা, লুচিটা লুচ্চাইয়া দাও।' এই বলে নিজে উচ্চৈঃস্বরে

হাসিতে লাগিলেন, 'আরে ছি ছি, এ যে বেখাপ্পা হয়ে গেল, এক আধটা চলবে না।' আর সকলেই বিদ্রূপ করিয়া আরম্ভ করিল— 'মহাপুরুষ তামাকটা তমকাইয়া দিবেন।' সম্মুখে গুপ্ত বসিয়া ছিল, 'ওরে গুপ্ত, তামাকটা তমকাইয়া দে না!'"

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়মিত বক্তৃতাসভায় কীভাবে ইংরেজ শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন এবং ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার বর্ণনা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং আরো কেউ কেউ। কিন্তু স্বামীজির প্রতিদিনের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি ঘটনার কথা লিখে গেছেন মহেন্দ্রনাথ। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ও অনেকগুলি বক্তৃতাসভায় হাজির থাকতেন। সেইজন্য মহেন্দ্রনাথের বিবরণের ওপর কিছুটা নির্ভর করতে হয়েছে পরবর্তীকালের জীবনীকারদের। স্বামীজির ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ মানুষটি।

মহেন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে যান,তখন তিনি সদ্যযুবা। তাঁর দাদার বয়েস তখন তেত্রিশ। সেই বয়েসেই বিবেকানন্দ বেশ বিখ্যাত এবং তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বে বহু মানুষ মুগ্ধ। মহেন্দ্রনাথ যেমন সেই রূপটি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন ঘরোয়া পরিবেশের মানুষটিকেও। বক্তৃতাসভায় যাঁর সিংহ-বিক্রম, বাড়ির মধ্যে তিনিই একজন স্নেহপ্রবণ মানুষ, কখনো কিছুটা খাময়োলি, কখনো অস্থির, কখনো ক্লান্ত। ছোট ভাইকে দেখেই তিনি নিজের সোনার কলম উপহার দেন, তার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে কিনা সেই খবর নেন। নিজের পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বেশ সচেতন, ভালো জাতের পাইপের তামাক না পেলে তাঁর মন ওঠে না, তাঁর ঝাল-প্রীতির জন্য সারা লন্ডন খুঁজে খুঁজে তিনটি কাঁচালঙ্কা সংগ্রহ করে আনতে হয়!

লন্ডনে এসেও মহেন্দ্রনাথের চোখ ধাঁধিয়ে যায়নি। সেখানকার জীবনযাত্রা অন্যরকম, রীতিনীতি কিছুটা আলাদা। কিন্তু তাতে গদগদ হবার কিছু নেই। তিনি লক্ষ করেছেন, বিলেতের অনেক বাড়িতে যেসব মাদুর ও কার্পেট পাতা থাকে সেগুলি বাংলাদেশের মাদুর এবং মির্জাপুরী গালচে। এখানকরা লোকেরা ঝিনুক ও গুগলি খায়। ঝিনুক বা অয়েস্টার অন্যজাতীয় হলেও গুগলি আমাদেরই মতন। 'যদি হুগলির কোনো লোক লন্ডনে গিয়া গুগলির ব্যবসা করে তা হলে বেশ ব্যবসা চলিবে।'

মহেন্দ্রনাথ পারতপক্ষে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন না। অনেক বিলিতি দ্রব্যের তিনি চমৎকার বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে নিয়েছেন। যেমন ইজিচেয়ার হচ্ছে সুখাসন এবং ফায়ার প্লেস হচ্ছে আতশীখানা।

লন্ডনে স্বামী বিবেকনন্দর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীমতী হেনরিয়েটা মুলার এবং স্টার্ডি দম্পতি। শ্রীমতী মুলারের বাড়িতেই থাকতে হয়েছে বেশিদিন। এই শ্রীমতী মুলার

ছিলেন ধনবতী মহিলা এবং ভারতের প্রতি অনুরক্ত, বেলুড় মঠ নির্মাণের সময়ে এবং জমি কেনার জন্য তিনি অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। জীবনীগ্রন্থগুলিতে এই কারণেই শ্রীমতী মুলারের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি মানুষটি কীরকম ছিলেন, তা জানতে পারি শুধু মহেন্দ্রনাথের লেখনীর সুনিপুণ বর্ণনায়।

এই প্রৌঢ়া মহিলাটির চেহারা পুরুষালি, ঠোঁটে স্পষ্ট গোঁফের রেখা এবং থুতনিতেও সামান্য চুল ছিল, গালে অবশ্য দাড়ি ছিল না। স্বভাবটা বদমেজাজি, কখন যে কী মূর্তি ধরবেন তার ঠিক নেই। স্বামীজিকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, খাওয়াচ্ছেন-পরাচ্ছেন। বক্তৃতাসভার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, এ সবই তাঁর উদারতার পরিচয়, তখনকার দিনের লন্ডনের পক্ষে খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা বলতে হবে। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গীদের ওপর মাঝে মাঝেই খাপ্পা হতেন। তখন স্বামীজি কলকাতা থেকে সারদানন্দকে আনিয়েছেন, মহেন্দ্রও পড়াশুনোর জন্য সেখানে জুটেছে, গুডউইন নামে একটি ইংরেজ ছোকরাও সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করে, এরা মিস মুলারকে বেশ ভয় পায়।

শ্রীমতী মুলারের মুখের ভাষা কীরকম ছিল তার একটি বর্ণনা আছে। শ্রীমতী মুলারের চেহারা তো ওইরকম, পোশাকও পরতেন উদ্ভট ধরনের। মাঝে মাঝে সাইকেল চড়ার শখ ছিল। একদিন স্টার্ডিও তাঁর পত্নীকে নিয়ে সাইকেল চালাতে গেলেন গ্রামের রাস্তায়। শ্রীমতী স্টার্ডি ভালো সাইকেল চালাতে জানে না, উলটে পড়ে গেল আছাড় খেয়ে। একদল ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে হাততালি ও টিটকিরি দিতে লাগল। এরপরে মহেন্দ্রনাথের ভাষায় : "ঘণ্টাখানেক পরে মিস মুলার ফিরিয়া আসিয়া স্টার্ডির পত্নীকে বকিতে শুরু করিলেন, 'অলবড্ডে মাগী। বাইসাইকেল চড়তে জানে না, পথে খানিকটা গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল, কাপড়-চোপড়ে সব ধুলো লাগলো। পাড়ার হতভাগা ছেলেরা সব হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলো... গাঁয়ের ছোঁড়াগুলি কী পাজি! আমাকে হাততালি দিতে লাগলো, কেউ বা ঢেলা ছুঁড়তে লাগলো, সব ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আমার বাইসাইকেলের পথ আটকে দিয়ে বলতে লাগলো, দ্যাখ দ্যাখ, একটা বুড়ো মাগী মদ্দোর পোশাক পরেছে'..."

মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গেলে পুরো বইগুলিই তুলে দিতে হয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিশেষত্ব আছে। স্বামী বিবেকানন্দর বক্তৃতাসভার বর্ণনা সবাই দেয়, মহেন্দ্রনাথও দিয়েছেন, কিন্তু বক্তৃতা শুরু করার ঠিক আগে স্বামীজী ঠিক কী অবস্থায় থাকতেন, কী কথা বলতেন, সে বর্ণনা শুধু মহেন্দ্রনাথের লেখাতেই পাওয়া যায়। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর রচনায় যত চরিত্র এসেছে, প্রত্যেককেই যেন তিনি প্রথমে একটু দূর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করেছেন, তাদের অবয়ব, হাবভাব।

শ্রীমতী মুলারের কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। স্বামী বিবেকানন্দর শেষ জীবন

পর্যন্ত অনেক বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। শ্রীমতী ওলি বুল, শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউড, আর নিবেদিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু শ্রীমতী মুলার, যিনি ইংল্যান্ডে স্বামীজির প্রতিষ্ঠার জন্য এত সাহায্য করেছেন, ভারতে এসে থেকেছেন, বেলুড় মঠের জন্য বহু টাকা দিয়েছেন, তাঁর কোনো উল্লেখ আর পরবর্তীকালে পাওয়া যায় না কেন? সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল? ঝগড়াঝাঁটি? বিশদ বিবরণ কোথাও নেই, শুধু নিবেদিতাকে কোনো একটা সময়ে শ্রীমতী মুলারের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করা হয়েছিল।

যাই হোক, লন্ডনে দ্বিতীয়বার শ্রীমতী মুলারের আশ্রয়ে থাকার সময়ে অনেকরকম সাহায্য পেয়েও তাঁর প্রতি স্বামীজি যে বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথের লেখায়। ঘটনাটি এরকম :

শ্রীমতী মুলারের একটা হামবড়া ও সবজান্তা ভাব ছিল, এই ভাব তিনি বেশি ফলাতেন সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের ওপর। ওঁরা কিছু বলতে গেলেই শ্রীমতী মুলার ধমকে দিয়ে বলতেন, তোমরা কিছু জানো না!

একদিন শ্রীমতী মুলার বলতে লাগলেন, আমি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, দেখেছি, রোগা রোগা গরু, রোগা রোগা কুকুর, চারদিকে সবই রোগা। আমরা কিন্তু এমন হতে দিই না। যখন গরু বা ঘোড়া বুড়ো হয় তখন তাদের জীবনটা একটা বোঝা হয়। তাদের আর বেঁচে থাকবার দরকার কী? তাই আমরা বুড়ো গরু-ঘোড়াকে মেরে ফেলি, তাদের মাংস লোকে খায়। আমরা ইংরেজরা দয়ালু জাতি, আমরা বুড়োদের কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

ইংরেজরা খুব দয়ালু জাতি, এই কথাটা বার বার শুনতে শুনতে সারদানন্দ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি ফস করে বলে ফেললেন, বাপ-মা বুড়োবুড়ি হলেও তো জীবন বড় কষ্টদায়ক হয়। কেন তাদের মেরে ফেলেন না?

শ্রীমতী মুলার বিকট মুখভঙ্গি করে বললেন, অ্যাঁ, কী বললে?

শ্রীমতী মুলারের মা বেঁচে আছেন, তাঁকে তিনি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। সারদানন্দের কথা শুনে তিনি দপদপিয়ে উঠে গেলেন। তারপর আর সারদানন্দ-মহেন্দ্রর সঙ্গে কথাই বলেন না। প্রণাম নিতে চান না, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে মুখ ফিরিয়ে নেন। সারদানন্দ তো খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বিবেকানন্দ জানতে পারলে নিশ্চয়ই রাগ করবেন। শ্রীমতী মুলারের মুখে মুখে কথা না বলে চুপ করে শুনে গেলেই হত।

মহেন্দ্র অবশ্য সান্ত্বনা দেয়, যেমন কথা, তেমনই তো উত্তর দিয়েছেন। অত ভয় পাবার কী আছে? না-হয় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!

দিন তিনেক পর বিবেকানন্দ ঠিক অস্বাভাবিক অবস্থাটা লক্ষ করলেন। তিনি সারদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে পাগলী বুড়ির সঙ্গে কী হয়েছে?' সারদানন্দ

কাঁচুমাচু, তখন মহেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন ঘটনাটি।

"স্বামীজি বলিলেন, 'ও খ্যাপতান মাগীর জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। দ্যাখ শরৎ, এ দেশে যে মাগীরা বে করে না সেগুলো বুড়ি হলে দু'রকম হয়। কতকগুলো মাগী ফেটিয়ে যায় (মোটা হয়), সেগুলো ঠাণ্ডা ভালোমানুষ থাকে। কতকগুলো মাগী শুঁটকে যায়, সে মাগীরা খিটখিটে হয়। এই খ্যাপতান মাগীর জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। ওরে বাপু, তোরা বুড়ি মাগীর সঙ্গে সাবধানে চলবি। ঘরে ও ঢুকলেই দাঁড়িয়ে উঠবি, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করবি, প্যান্টালুনের পকেটে হাত রাখবিনি। বুড়ি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তা বাপু তোরা বসিসনি। যে জিনিস চাইবে তা তাড়াতাড়ি ওকে দিস। কোনো রকমে বুড়িকে সন্তুষ্ট করবি। আর পারিনি বাপু, সারাদিন লেকচার করতে হবে, ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আবার বুড়িকেও সন্তুষ্ট করতে হবে...'।"

মহেন্দ্রনাথ এই সব রচনায় নিজেকে কখনো জাহির করেননি, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো প্রসঙ্গ আনেননি, এটা একটা বড় গুণ। এমনকী নিজের নাম না দিয়ে সর্বত্রই বলেছেন, বর্তমান লেখক। নিজেকে তিনি আড়াল করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্মৃতিকথায় এইসব খুঁটিনাটি ও সংলাপ কতদূর সত্য, এতে কি কল্পনার কিছু মিশ্রণ আছে?

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দর বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে মহেন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। তবে ঘটনারই উদ্ধৃতি আছে, রঙ্গ-কৌতুক বা সংলাপ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব রঙ্গ-কৌতুক-সংলাপের সত্যতা সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদও আমার চোখে পড়েনি।

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)— মহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী (তিন খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

দুর্বোধ্য, তবু রোমাঞ্চকর

কমলকুমার মজুমদার চলে গেছেন ১৯৭৯ সালে। আজও বহু অনুরাগী ও অনুচরদের মধ্যে তাঁর স্মৃতি অতি উজ্জ্বল। সেই স্মৃতি যত না তাঁর রচনার স্বাদ-মাধুর্যের, তার চেয়ে বেশি তাঁর ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য রোমন্থনের। এর অন্যতম কারণ, তিনি তাঁর সমসাময়িক বা সমবয়সিদের কাছে যত পরিচিত ছিলেন, তার চেয়েও বেশি বয়ঃকনিষ্ঠরাই সঙ্গলোভী ছিলেন তাঁর। কমলকুমারের কোনো রচনাই পড়েনি কিংবা পড়লেও দন্তস্ফুট করতে পারেনি, তাঁর এমন ভক্তও আমি দেখেছি, যারা— কথার কথা— কমলকুমারের চরণামৃত পান করতেও রাজি ছিল। এর কারণ কমলকুমারের অসাধারণ বাক্‌বিভূতি। তৃণাদপি তুচ্ছ বিষয় থেকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং জীবনের গভীর দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি, এবং তা অতি সাবলীল ও রসসিক্ত ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা।

প্রাচীন গ্রিসে একধরনের দার্শনিক ছিলেন, প্রধানত অ্যারিস্টটল, তাঁরা নির্দিষ্ট বক্তৃতাস্থলের বদলে হাঁটতে হাঁটতে, ঘুরে ঘুরে আলাপচারী করতেন। তাঁদের বলে পেরিপাটেটিক ফিলোজফার, সক্রেটিসও অনেকটা ওই ধরনেরই। কমলকুমারও ছিলেন অবিকল সেইরকম। মধ্যযৌবনেও আমি তাঁকে সচরাচর বসতে দেখিনি, ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান অথবা চলন্ত, এমনকী, খালাসিটোলার পানশালাতেও তিনি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতেন, পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে, একটা ছোট্ট দলের মধ্যমণি হয়ে। তিনি কথায়-কথায় চলে যেতেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের পোড়া সর্ষের তেলে ভাজা হলুদ রঙের অতি সুস্বাদু 'মামলেট' খেতে খেতে আড্ডা, আবার ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে সেই ভাঙা আড্ডা জোড়া দেওয়া। তখন টেপ রেকর্ডারের তেমন প্রচলন হয়নি, কিংবা সেরকম কিছু ব্যবহারের কথা আমাদের মনেও আসেনি। এখন মনে হয়, সেই আলাপচারিতাতেই কমলকুমারের বৈদগ্ধ্য, প্রজ্ঞা ও রসবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত।

কমলকুমার নতুন করে লিখতে শুরু করেন একটু বেশি বয়েসে, কিছু তরুণ কবি-

লেখকের সান্নিধ্যে এসে। সেই জন্য তাঁর রচনাসংখ্যা বেশি নয়। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা পত্রপত্রিকায়। যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমে সেগুলি দুই মলাটে আবদ্ধ করেছে 'চর্চাপদ' নামে নতুন প্রকাশক। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ২৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৫০, সেদিক থেকে ৪০০ টাকা দাম খুব বেশি নয়। এইসব বই, বাজারে খুব বেশি দিন থাকে না, সুতরাং কমলকুমারের অনুরাগীদের উচিত হবে, অবিলম্বে এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দৃষ্টিগ্রাহ্য দূরত্বে রেখে দেওয়া। রোজ পড়ার দরকার নেই।

কমলকুমার ফরাসি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, আবার জনগণনার কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে গ্রামবাংলার অনেক লোকশিল্প সম্পর্কে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, এই রকম আরও অনেক বিচিত্র বিষয় ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। আলাদাভাবে সেইসব প্রবন্ধের বিশ্লেষণের সাধ্য আমার নেই, তবে এর কোনো কোনো রচনার প্রকাশের ব্যাপারে আমি জড়িত ছিলাম, সেইসব কথা মনে পড়ে। আনন্দবাজার পত্রিকায় নদী বিষয়ক এক ক্রোড়পত্রের জন্য কমলকুমারের একটি রচনা আদায় করার ভার পড়েছিল আমার উপরে। তার জন্য কমলকুমার-সান্নিধ্যে, তাগাদা দেওয়ার জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল বারবার, অতি আনন্দের সঙ্গে। রচনাটি হাতে পাওয়ার পর বিভাগীয় সম্পাদক নিখিল সরকার (কমলকুমারের বিশেষ অনুরাগী) সেটি পড়তে পড়তে হাঁ। 'নৌকার চোখ সকল কী পর্যন্ত ভয়ের হইল; তীরস্থিত বৃষকাষ্ঠ নড়িয়া উঠিল, অবিলম্বে এক মায়িক স্বরভেদে উহার ভোঁ বাজিয়া চলে; ইহাতে আমার সর্বশরীরে সিঞ্চিরা কাটিল এবং তৎক্ষণাৎ ওই শব্দকে অনৈসর্গিক করিল, ফেরী বা খেয়াঘাটের ডাক, পারে যাব হে! নিশ্চয়ই গঙ্গাযাত্রী গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়াছে!' কিছু সংলগ্নতা নেই। কিন্তু একটি শব্দও ছেদ বা পরিবর্তন করা যাবে না, এই ছিল কঠিন শর্ত। প্রকাশের পর ক্রোড়পত্রের অন্যান্য রচনাগুলির চেয়েও কমলকুমারের 'কলকাতার গঙ্গা' সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও বিতর্কিত হয়েছিল। লেখাটি আমি এখনো মনে করি, এখন আর দুর্বোধ্য মনে হয় না, 'গঙ্গার অন্ধকার নাই', এরকম লাইন মনে গেঁথে যায়। আর 'রোজনামা' শিরোনামার রচনাগুলি আমারই প্ররোচনায় লিখিত, সেইসময় আমি একটি অধুনালুপ্ত দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলাম। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্যও তিনি লিখেছেন। স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই, তাঁর অনেক কাব্যই বুঝতে না পেরেও ছাপিয়েছি।

বাংলাভাষায় সাধু বাংলা থেকে চলতি বাংলায় রূপান্তরের ইতিহাস সকলেই জানেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং কল্লোল যুগের লেখকরাও সাধু বাংলা গদ্য ছেড়ে চলে আসেন চলিত ভাষায়। কমলকুমারই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র লেখক। যিনি বিপরীতগামী, চলিত বাংলা দিয়ে শুরু করে পরে চলে আসেন সাধু বাংলায়। শুধু ক্রিয়াপদ বদলই নয়, বাক্যগঠন

হয় জটিল থেকে জটিলতর। অথচ তিনি কথা বলতেন অনেকটা শ্রীরামকৃষ্ণের মতনই, রগুড়ে লোকচলতি ভাষায়। কেন তাঁর লিখিত রচনা বাক্যবন্ধ এমন দুর্বোধ্য তা নিয়ে আমরা এবং অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছি। বিভিন্ন সময়ে উত্তরও পেয়েছি নানারকম। একবার তিনি বলেছিলেন, সাহিত্য হচ্ছে দেবী সরস্বতীর প্রতি নিবেদন। সুতরাং সাধারণ ভাষার বদলে তাঁর জন্য বিশেষ ভাষা তৈরি করতে হয়। দেবী সরস্বতীর ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, হয়তো এটাও কমলকুমারের কৌতুক। আর একটি মত এই যে, বাংলা গদ্যের সিনট্যাক্স প্রধানত ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে, কমলকুমার তা অস্বীকার করে ফরাসি সিনট্যাক্স অবলম্বন করেছিলেন। এটা অনুধাবন করার মতন ফরাসি জ্ঞান আমাদের নেই, তবে সাধারণভাবে এটা উল্লেখ করা যায় যে, ফরাসিতে যেমন বিশেষ্যের পর বিশেষণ বসে, (যেমন কালো বেড়ালের বদলে বেড়াল কালো কিংবা গোলাপ লাল) কমলকুমারের রচনায় বিশেষণের এই স্থান বদলের দৃষ্টান্ত নেই। সম্প্রতি দয়াময়ী মজুমদার রচিত কমলকুমার বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত রচনা-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়েও দেখা যাচ্ছে দয়াময়ী তাঁর স্বামীকে গদ্যের দুর্বোধ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, সেখানে কমলকুমারকে উত্তর দিতে শুনি যে, আমি অনেক পরিশ্রম করে যা জেনেছি, বুঝেছি, তা বোঝার জন্য পাঠকদেরও পরিশ্রম করতে হবে। এটা একটা লেখকের মনোবাঞ্ছা হতেই পারে, কিন্তু শেষ দিকের রচনায় সরস্বতীর বদলে কালীঠাকুরের আধিপত্য খটকা লাগায়।

যাঁরা কমলকুমারের কোনো রচনা আগে পড়েননি, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না, অথচ সাহিত্যপ্রেমী, তাঁরাও বাংলাভাষার এই এক সম্পূর্ণ অভিনব, বতিক্রমী গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দেখতে পারেন। দুর্লভ সব পত্রপত্রিকা থেকে এই প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করার ব্যাপারে অনেক পরিশ্রম করেছেন প্রশান্ত মাজী আর রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ভাষাবিদ উদয়নারায়ণ সিংহর একটি ভূমিকাও এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

আগেই বলেছি এই বই একটানা পড়ে যাওয়ার মতন নয়। মাঝে মাঝে দু-চার পাতা পাঠ করলে অকস্মাৎ সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ বোধ হতে পারে। যেমন : 'সম্মুখে এই যে সকালবেলাকার ধানখেতটি, সবুজ হইয়া পড়িয়া আছে আকাশের রোদে, তাহার কতখানি আমরা সত্যই লইয়া থাকি— তাহার স্থানকে কখনো আমরা লই না, আর তাহাকে কেবল দেখার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সেখানে বুঝিতে পারিব একটি বিশেষ অন্ধকার ছাইয়া আছে।'

এরকম অংশপাঠের পর একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়।

কমলকুমার মজুমদার

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার কাছে ইউনাইটেড কফি হাউস নামে অধুনালুপ্ত একটি সরাইখানাতে একদা আমাদের আড্ডা ছিল। সেখানে কোনো এক রবিবার বিকালে কমলকুমার মজুমদার তাঁর প্রথম উপন্যাস আমাদের কয়েকজনকে উপহার দেন। উপন্যাসটি বেরিয়েছিল একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যপত্রিকার ক্রোড়পত্র হিসেবে, পত্রিকাটির নাম আমরা জানতে পারিনি, কেন কি, কমলকুমার পত্রিকাটি থেকে তাঁর রচাংশ ছিঁড়ে আলাদা কাগজে নিজে মলাট সেলাই করে একটি সম্পূর্ণ পুস্তক হিসেবেই দিয়েছিলেন আমাদের। উপন্যাসটির নাম 'অন্তর্জলী যাত্রা', যার শুরুতেই ভোরবেলার বর্ণনা এরকম : আলো ক্রমে আসিতেছে। আকাশ মুক্তা ফুলের ন্যায় হিম নীলাভ।

কমলকুমার মজুমদারের রচনার সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। মানুষটিকে এর বছর কয়েক আগে থেকেই চিনি, ১৯৫৩ সালে সিগনেট প্রেসের পরিচালক দিলীকুমার গুপ্ত (ডি কে নামে পরিচিত ছিলেন ছোট-বড় সকলের কাছে) আমাদের মতন সদ্য কলেজ পাস ছোকরাদের নিয়ে 'হরবোলা' নামে গড়েছিলেন একটি নাটকের দল, তার পরিচালক হিসেবে আসেন কমলকুমার, সেই সূত্রে তাঁকে আমরা কমলদা বলে ডাকি। কুচকুচে কালো রঙের একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধুতি ও লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবি পরা, কণ্ঠস্বর গমগমে। তিনি সর্বক্ষণ এলাচ ও লবঙ্গ খেতেন, অত এলাচ-লবঙ্গ মানুষের সহ্য হবার কথা নয়, পরে জেনেছিলাম, আমাদের কাছ থেকে ওঁর মুখের দেশি মদের গন্ধ লুকোবার জন্যই ওইপ্রকার চেষ্টা। হাস্য পরিহাসে, বুদ্ধির প্রাচুর্যে ও বাক বৈদগ্ধ্যে অতুলনীয়, কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে তিনি একটি সাধারণ চটের থলে (কাঁধে ঝোলানো শান্তিনিকেতনি ঝোলা নয়, যাকে বলা হয় র‍্যাশন ব্যাগ) বহন করতেন সব সময়, যার মধ্যে থাকত তাঁর সর্বক্ষণ পাঠ্য বইপত্র ও টাকাপয়সা। চটের থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকা তুলে এনে ট্রাম-বাসের টিকিট কাটতে আমরা আগে কখনও কারুকে দেখিনি।

হিসেব অনুযায়ী তখন তাঁর বয়েস আটত্রিশ, কিন্তু তিনি এমন ভাব করতেন যেন জন্মেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরদের সচক্ষে দেখেছেন। স্করোঁ নামে এক মধ্যযুগীয় ফরাসি কবির রচনা এখন অনেক ফরাসিই পড়েন না, কিন্তু কমলদা যখন তখন স্করোঁ কিংবা ভিয়োঁর মতন কবিদের মূল রচনা উদ্ধৃত করতেন, আবার বাংলায় কাঙ্গাল হরিনাথ রচিত 'হারামণি' থেকেও স্তবক উদ্ধার করতেন সাবলীলভাবে।

আমরা 'হরবোলা' প্রতিষ্ঠানের চ্যাংড়ারা আমাদের মোশন মাস্টার কমলদার অন্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম প্রথমদিন থেকেই, কিন্তু তাঁর রচনা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না আমাদের। ক্রমে লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম যে একদা উনি লেখক ছিলেন। নরেশ গুহ সিগনেট প্রেসের সঙ্গে জড়িতে ছিলেন তখন, তিনি একদিন বলেছিলেন, তোমরা জানো না কমলবাবু একসময় চমৎকার কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছেন, 'চতুরঙ্গ' ও 'সাহিত্যপত্রে'। ডি কেও বলতেন, কমলবাবু আপনি আর লেখেন না কেন? কমলদা সেকথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। মনে হত যেন লেখার ব্যাপারে ওঁর কোনো অভিমান বা বিরাগ জন্মে গেছে। আমরা তখন কবিতা রচনার ব্যাপারে খুব মাতামাতি করছি এবং সদ্য দাঁত ওঠা কুকুরছানার মতন কামড়ে বেড়াচ্ছি একে তাকে, কমলদা পরিহাস করতেন আমাদের।

'হরবোলা' কয়েক বছরের মধ্যেই উঠে যায়। কিন্তু আমরা তখনও কমলদার সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকতাম। এই সময় তিনি হঠাৎ আবার লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস দেখেই আমরা স্তম্ভিত। এরকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে। গুরু-চণ্ডালী শব্দ মেশাবার প্রক্রিয়া আর কারুর রচনায় নেই, এ উপন্যাসে প্রধান দুই চরিত্র। এক চণ্ডাল ও এক ব্রাহ্মণী, এবং বাক্যবন্ধও অতি জটিল, বাংলা ব্যাকরণের কোনো নিয়মের ধার ধারে না। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, বাংলা গদ্যভঙ্গি ইংরেজি সিনট্যাক্স অনুযায়ী চলে, ফরাসি ভাষায় পণ্ডিত কমলকুমার ফরাসি সিনট্যাক্সে বাংলা চালু করছেন। এ কথাও পুরোপুরি সত্যি নয়, ফরাসিতে বিশেষণগুলি কর্তার পরে বসে, লাল ফুলের বদলে ফুল লাল যেরকম,তাছাড়া ফরাসি সিনট্যাক্সের সঙ্গে ইংরেজি সিনট্যাক্সের খুব তফাত নেই। ফরাসি ধাতুরূপ ইংরেজির চেয়ে বেশি কিন্তু সংস্কৃতের মতন। এর চেয়েও বড় কথা, যতদূর জেনেছি, ফরাসি গদ্য ফরাসিদের মুখের ভাষারই অনুসারী, পৃথিবীতে সব ভাষাতেই গদ্য ও মৌখিক ভাষা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, কৃত্রিম অলঙ্কারবহুল ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তার বাহক না হয়ে বাধা হয়, কিন্তু কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে তার লিখিত বাক্যের হাজার যোজন ব্যবধান। তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাটি মধ্য কলকাতার, অনেক সময় যাকে আমরা বলি কাঁচা বাংলা, (অর্থাৎ অতিশয় পরিপক্ক) এবং সবসময় রঙ্গরস মিশ্রিত। অথচ তাঁর লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বারবার না পড়ে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষণাৎ অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা, অনেকটা কবিতার মতন বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি শব্দের প্রতি এমনই মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই জাদু।

এরপর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অন্য রচনাগুলি, বছরে একটি বা দুটি, কখনও বা দুবছরে একটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প, মতিলাল পাদ্রী এবং তাহাদের কথা, তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয় বেশিরভাগই ছোট পত্রিকায়, এক্ষণেই বেশিরভাগ, আমরা কৃত্তিবাসের গোটা একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলাম, তাঁর বড় উপন্যাস 'সুহাসিনীর পমেটম'। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নাম 'পিঞ্জরে বসিয়া শূক', 'শ্যাম নৌকা', 'খেলার প্রতিভা', 'কয়েদখানা', 'রুক্মিণীকুমার'— এর মধ্যে পুস্তকাকারে পাওয়া যায় দু-একটিমাত্র এবং তাঁর 'গল্পসংগ্রহ' এবং 'নিম অন্নপূর্ণা' নামে গল্পগ্রন্থ। তবু কমলকুমার মজুমদার বরাবরই রয়ে গেলেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে, বাইরে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি একজন আউটস্ট্যান্ডিং লেখক। কোনো সংকলনে তাঁর গল্প নেওয়া হয়নি, কোনো সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তাঁকে (তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন কি না, সেটা আলাদা কথা), বেশিরভাগ পাঠকের কাছেই। তিনি রয়ে গেলেন অজ্ঞাত, সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন কিন্তু তাঁর রচনা পড়েননি এক লাইনও। নিজের রচনার দুরূহতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তিনি, 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, আমার বই উনত্রিশখানা বিক্রি হয়েছিল, তারপর তিরিশ জনই দোকানে বই ফেরত দিয়ে গেছে। তবু, দিন দিন যেন আরও বেশি দুরূহতার সাধনায় ব্রতী হলেন।

খুব দুর্মুখ ছিলেন, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটানোর আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর, সমসাময়িকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি ছোটদল, পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট দল তাঁর লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছে, বিশেষত কবিরা। ওয়েলিংনের কাছে একটি বাংলা মদের দোকানে কমলকুমার মজুমদারের সান্নিধ্যে কেটেছে আমাদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বছর। পুরো এক গ্লাস নিট বাংলা মদ (৩৫ শক্তি, আজকাল পাওয়া যায় না) এক চুমুকে খেয়ে ফেলে অবিচলিত থাকার মতন দ্বিতীয় মানুষ আমি সারা পৃথিবীতে দেখিনি। এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাপী প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে কথাবার্তার চুম্বকাকৃষ্ট করে রাখার ক্ষমতাই বা কজনের থাকে। বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নতুন চিন্তা, নিজে ছবি আঁকতেন ও খ্যাতনামা চিত্র-সমালোচক ছিলেন, গ্রামের জীবন, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও কথ্যভাষায় রূপান্তর— এমন কত দিকে ছিল তাঁর আগ্রহ। আর সাহিত্য তো ছিল তাঁর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাক্যকে তিনি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতেন, আমায় রসে বশে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। ওয়েলিংটনের সেই সান্ধ্য আসর থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল দুটি স্বল্পজীবী পত্রিকা, একটির নাম 'তদন্ত' যেটি গোয়েন্দা ও অপরাধ কাহিনি বিষয়ক ও আর একটির নাম 'অঙ্ক ভাবনা', যেটির বিষয় গাণিতিক

দর্শন। হ্যাঁ, একই ব্যক্তি এই দুটি পত্রিকার কথা চিন্তা করেছিলেন।

তিনি এই পৃথিবীতে ৬৪ বৎসর থেকে গেলেন। শেষ জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে, যদিও শুনেছি, তাঁর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। কয়েক বছর খুব কষ্ট পেলেন হাঁপানি রোগে, তাতেও অবশ্য তার তীক্ষ্ণতা ও রসবোধ এক বিন্দু কমেনি, নবীনতর কিছু লেখকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গেছে বরাবর।

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই বিষয়ের গভীরতায় অসাধারণ, ঠিক এমন চোখ দিয়ে মানুষের জীবন আর কেউ দেখেননি। ভাষার কঠিন আবরণের জন্য তা পাঠকদের কাছে পৌঁছয়নি, রচনাগুলি রইল ভবিষ্যৎ কালের জন্য, ভবিষ্যতের উদ্যমশীল রসভোক্তাদের জন্য।

আমি কমলকুমার মজুমদারকে আমার একটি বই উৎসর্গ করেছি। সেই বইয়ের এক কপি তাঁকে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, কমলদা, এ বইটা আপনার পড়বার জন্য নয়, আপনার পড়ার যোগ্যই না, তবে আপনার বাড়ির কোনো খাট বা টেবিলের পায়া যদি ঠকঠক করে তখন সেই পায়ার নীচে গুঁজে দেবার জন্য বইটা রেখে গেলাম।

কমলদা, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র পঞ্চাশ বছর

ভাবতেই পারছি না, এর মধ্যে পঞ্চাশ বছর চলে গেল! এই তো সেদিন— এক রবিবার সকালে, শ্যামবাজার কফিহাউসে আমরা আড্ডা দিচ্ছি, কমলদা এলেন। হাতে ওই 'নহবৎ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'। পত্রিকাটি থেকে উপন্যাসের পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে নিজের হাতে সেলাই করেছেন— কয়েকটি কপি আমাদের কয়েকজনকে উপহার দিলেন। আমরা তো অবাক। সেই উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে— 'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।' আমাদের কাছে এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের মতন।

এর আগে কমলদাকে আমরা জানতাম নাট্যকার বলে। নাট্যপরিচালক হয়ে তিনি আমাদের দিয়ে নাটক করাচ্ছেন, করিয়েছেনও। আমাদের লেখা গল্প-কবিতা আমাদের পত্রপত্রিকা— এসবের সঙ্গে মেলামেশারই ফলে তিনি লিখতে শুরু করেছেন এবং সে লেখা শুরু থেকেই প্রচলিত লেখা থেকে অনেক দূরে। ভাষা, ভাবনা, নির্মাণ— সব কিছুই নতুন। তাঁর লেখা 'গোলাপ সুন্দরী' তখন থেকেই আমার খুব প্রিয় লেখা। আমি একবার কমলদাকে বলেছিলাম— আপনি মারা যাওয়ার পর আমার ভাষায় সহজ করে একবার গোলাপ সুন্দরী' লিখব। কমলদা উত্তরে বলেছিলেন— তাহলে আমি ভূত হয়ে এসে তো তোমার ঘাড় মটকে দেব। 'গোলাপ সুন্দরী' এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারও একটা গল্প আছে। আমরা তখন 'কৃত্তিবাস' বের করি— পুরোপুরি কবিতার পত্রিকা। কমলদার লেখা তো নেওয়া যাচ্ছে না। একবার ঠিক করা হল ওই একই নামে গল্প ও কবিতার কৃত্তিবাস হবে। তাই হল। গল্পর কৃত্তিবাসে বেরিয়েছিল দুটি গল্প—কমলদার 'ফৌজ-ই-বন্দুক' আর সন্দীপনের 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল,

ছিমছাম। আমার কাছে তার কপি নেই। শঙ্খদার বড়িতে আছে। যতদূর জানি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতেও আছে। 'কৃত্তিবাস'-এর পঞ্চাশ বছরের উৎসবের সময় প্রদর্শনীতে কিন্তু ছিল। তারপর হল কী— অনেকেরই লেখা আসতে থাকল—মতি নন্দী, দীপেন বন্দ্যোপ্যাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু...। কমলদা লিখলেন 'গোলাপ সুন্দরী'—অপূর্ব সেই কাহিনি! মনে আছে আমরা ওই গল্প লেখার জন্য সেই সময়ে তিরিশ টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দুটো করে কৃত্তিবাস বের করা সাধ্যে কুলোলো না। ঠিক সেইসময় সৌমিত্র আর নির্মাল্য 'এক্ষণ' বের করার পরিকল্পনা করছিল। সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে তাদের আলাপ-আলোচনাও হয়ে গেছে। 'গোলাপ সুন্দরী' আমরা তখন 'এক্ষণ'-এ প্রকাশের জন্য দিয়ে দিই।

কৃত্তিবাসে কমলদার আর একটি লেখা উপন্যাসাআমরা ছাপি। 'সুহাসিনীর পমেটম'— ক্রমশ তাঁর ভাষা, নির্মাণ আরও জটিল হয়ে যেতে থাকল। ফরাসি সিনট্যাক্স ব্যবহার ছাড়া আর একটি কথা প্রায়ই বলতেন ওই জটিল ভাষা ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করলে, বলতেন 'সাহিত্য তো দেবী সরস্বতীর সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা, সে ভাষা চলতি বাজার-হাটের ভাষায় হয় নাকি?' আর বলতেন, 'আমি একা কখনও লিখি না। ঠাকুর ও আমি দুজনে মিলে লিখি। মানে, লিখি আসলে আমি নয়, আমরা।'.

সেসব দিন আর ফিরে পাওয়া যাবে না। যেমন ডি কে। তাঁর মতো মানুষ কি এখন আর পাওয়া যাবে? তাঁর মতো প্রকাশক। শুধুমাত্র তাঁর বইয়ের দোকানটা সাজিয়ে দেবার জন্য কমলদাকে মাইনে দিতেন। সাজানো মানে—আর কিছু নয়— সেলফ থেকে বই ওই একটু এদিক-ওদিক করে দেওয়া। আর নাটকের মহড়া— সে তো প্রত্যহ এক এলাহি বন্দোবস্ত! দীর্ঘদিন ধরে চলত মঞ্চস্থ হওয়ার আগে ওই মহড়া— কোনোদিন সন্দেশ আসত 'ভীমনাগ' থেকে, কোনোদিন 'নকুড়' থেকে। সঙ্গে বড় বড় সিগারেটের টিন। আমরা তুলতে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো তুলে পকেটে পুরতাম। শুধু কি তাই? রাত হয়ে যেত প্রায়ই কমলদার নির্দেশনায় মহড়া শেষ করতে। ডি কে নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের পৌঁছ দিতেন শ্যামবাজার পর্যন্ত। হাওড়া দিকে যারা থাকত, হাতে বাসভাড়া দিয়ে দিতেন। কমলদা শ্যামবাজার পর্যন্ত এসে কখন যে কোনদিকে চলে যেতেন— আমরা বুঝতেই পারতাম না, ফলে কমলদার বাড়ি কোথায়— আমরা কেউ জানতে পারতাম না কখনও। পরে শুনেছি তখন থাকতেন পাতিপুকুর অঞ্চলে।

'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রথম বই হয়ে বেরোয় 'কথা শিল্প' থেকে। একই সঙ্গে দুটি বই— 'নিম অন্নপূর্ণা' আর 'অন্তর্জলী যাত্রা'। পরে এই প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন 'জানো তো আমার বই ১৭কপি বিক্রি হয়েছিল। ১০জন পরে এসে ফেরত দিয়ে গেছে। পরে ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ মজুমদার তার সুবর্ণরেখা থেকে 'অন্তর্জলী যাত্রা'প্রকাশ করে। ইন্দ্রনাথ তখন থেকেই প্রায় কমলদার পুত্রের মতো হয়ে যায়। কখনও কখনও আড্ডায় আমরা

পানীয়ের পয়সা দিতে গেলে ধমকে দিতেন আমাদের— 'আমি বয়োঃজ্যেষ্ঠ না'! বলে চটের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে আনতেন। দু-একবার আমরা লুকিয়ে ইন্দ্রনাথের হাতে পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম। তাঁর আর্থিক দিকের কথা ভেবে।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কমলদার সম্পর্কটাও ছিল বেশ মজার। কমলদা সত্যজিৎ রায়কে নানান নামে ডাকতেন, কিছু বলতে গিয়ে কিছুটা শ্লেষ থাকত তাঁর কথাবার্তায়, অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় কমলদাকে বেশ মান্য করতেন। তাঁর বিশালত্বটা এখানেই। কমলদার মৃত্যর পর তাঁর সম্পর্কে লিখলেন : 'পল্লীগ্রামের ছবি করে কমলদাকে খুশি করার ক্ষমতা আমার নেই।' অন্যদিকে কমলদারও উল্টোদিকটা দেখেছি। একবার আড্ডায় কেউ একজন কমলদার সামনে সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে নানা মন্তব্য করেছিল। কিছুক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে কমলদা দিলেন ধমক : 'তুমি কে হে ছোকরা, তুমি নিজে কী করেছ? আর কোনোদিন যদি সত্যজিৎ সম্পর্কে কোনো পেঁপে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এসব বলো— দেখবে সে গাছের পেঁপেগুলো তেতো হয়ে গেছে।'

আর একজন ছিলেন সতীকান্ত গুহ। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে তিনি তখন অধ্যক্ষ। আমি একবার একটা লেখা লিখি—'কে এই সতীকান্ত?' কমলদা তখন সাউথ পয়েন্টে পড়ান মিঃ গুহরই অধীনে। সবাই বলছিল তিনি নাকি আমার পিছনে গুণ্ডা লাগাতে পারতেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের আড্ডায় এসে ওই লেখাটি প্রকাশের পরেই কমলদা আমায় বললেন, 'আজ তোমার নামে আজেবাজে যা গালগাল মুখে এসেছে তাই বলে গেছি মিঃ গুহ-র সামনে। আরে, চাকরিটা তো করতে হবে, না?' কিছুক্ষণ পর আবার খুবই স্নেহময় গলায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, নিজের ছেলেকেও তো বাবা মাঝে মাঝে এরকমভাবেই বকাঝকা করে, আমি না হয় তাই করেছি! কিছু মনে কোরো না।' কমলদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল এরকমই।

'নহবৎ' পত্রিকার সম্পাদক সে সময় কে ছিলেন, এখন আর মনে পড়ে না। তার আগে সাহিত্যপত্রে পড়েছি তাঁর গল্প 'জল'... 'ফজল হয় ভালো লোক, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখে।' তখন কমলদার লেখার শুরু। সে সময়ের পরিচিত পত্রিকাগুলোয় তখনও লেখেননি। 'নহবৎ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কীভাবে যোগাযোগ হল তাও জানি না। তবে 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশের পর থেকেই আমরা ওই লেখা নিয়ে লেখালেখি, হইচই শুরু করি। কমলদা এরপর থেকেই 'এক্ষণ', 'চতুরঙ্গ', 'দর্পণ'... এসব পত্রিকায় নিয়মিত লেখা শুরু করেন। আমি কিছুদিন 'জনসেবক' পত্রিকায় রবিবারের পাতা দেখতাম। সেখানেও কমলদা লিখতে থাকেন আমার অনুরোধে 'রোজনামা' বলে ধারাবাহিক লেখা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও তখন ওখানে লিখতেন। 'দেশ' পত্রিকায় একসময় কমলদা শিল্প সমালোচকের কিছু লেখা লিখেছেন। ছবির প্রদর্শনী দেখে। সাগরদার অনুরোধে।

বাংলাদেশে কমলদার বই কিন্তু ভালো বিক্রি হয়। পাঠকও বেশ ভালো। ওখানে

কমলদার প্রবন্ধর বইও দেখেছি। কমলদার আর একটা বিশেষত্ব হল— বহু বিচিত্র বিষয়ে পারদর্শিতা। হঠাৎ তার সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'অঙ্ক ভাবনা'। আনমন্দময় ঘোষও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অঙ্কের সব জটিল তত্ত্ব বিষয়ে লেখা থাকত। লীলাবতীর অনুবাদ করেছিলেন তিনি। তারপরই দেখা গেল তিনি সম্পাদনা করছেন 'তদন্ত' নামে গোয়েন্দা পত্রিকা। যদিও একটি-দুটি করে সংখ্যা এসব পত্রিকাগুলোর দেখা গিয়েছিল। তবু আমাদের অবাক করত তাঁর বৈপরীত্যের রূপ। একই মানুষ এসব ভাবনা করছেন— অর্থকরী ব্যাপারটা আদৌ না ভেবে। এসব কমলদাকেই মানাত। আর পাওয়া যাবে এসব মানুষের দেখা বা সঙ্গ?

'অন্তর্জলী যাত্রা'-র বা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপের ও ঘনিষ্ঠতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এসব কথাই আজ মনে পড়ল।

গোলাপ সুন্দরী

গোলাপ সুন্দরীর পটভূমিকা

কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী'র পটভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। তাতে একালের পাঠকদের পক্ষে কমলকুমারের রচনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার কিছুটা সুবিধে হতে পারে।

১৯৫৩ সালে কমলকুমারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তখন তিনি পরিণত যুবা পুরুষ। বলিষ্ঠ দেহ, মসৃণ কালো রং, চোখ দুটি অতি উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠে সব সময় কৌতুক হাস্য। আমরা তখন কলেজীয় ছোকরা, পৃথিবী তো দূরের কথা, এই কলকাতা শহরটাকেই তখনো ভালো করে চিনি না।

তাঁকে আমরা প্রথমে দেখি একজন নাট্য পরিচালক হিসেবে। সেই সময় 'হরবোলা' নামে একটি থিয়েটার ক্লাব খোলা হয়েছিল, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত এবং পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ। পরে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এসেছিলেন আমাদের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে এবং প্রথম থেকেই ফৈয়াজ খাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে সন্তোষ রায় নিযুক্ত ছিলেন গান শেখাবার জন্য। আমরা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালার মহড়া শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই কমলকুমার মজুমদার এসে যোগ দিলেন আমাদের মোশান মাস্টার হিসেবে।

পরিচয়ের আগে আমরা তাঁর নামও শুনিনি। তিনি যে লেখক এটা জানতে আমাদের ঢের দিন লেগেছিল। তার আগে আমরা জেনেছিলুম যে আমাদের এই নাট্য পরিচালক খুব ভালো ছবি আঁকেন, প্রায় সময়েই মার্গ সঙ্গীত গুনগুন করেন, ফরাসি ভাষা অতি উত্তম জানেন এবং কথা বলেন উনিশ শতকের বাঙালিদের বৈঠকী কায়দায়।

আমরা নাটকের দল খুলেছিলাম বটে, কিন্তু নাট্যজগতের চন্দ্র-সূর্য হবার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল না। সাহিত্যের প্রতিই ছিল আমাদের সর্বাঙ্গীন টান। নাটক

মঞ্চস্থ করার চেয়ে মাসের পর মাস ধরে শুধু মহড়া দিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের বেশি আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে আড্ডা। দিলীপকুমার গুপ্ত যেমন ছিলেন এই নাটকের দলের মধ্যমণি, আবার তাঁরই উৎসাহে ও ঔদার্যে আমরা প্রকাশ করতে শুরু করি তরুণতম কবিদের কবিতার পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ ব্যক্তি, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিশেষত বাংলা কবিতার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ভালোবাসা। 'হরবোলা'র আসরে তিনি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিষয়ে নানান অশ্রুতপূর্ব কাহিনী শোনাতেন আমাদের। এবং আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের সঙ্গীত পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একজন বিশিষ্ট কবি, তিনিও যোগ দিলে আমাদের সেই আড্ডায় আমরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস পেতাম এবং পরের সপ্তাহের জন্য তৃষিত হয়ে রইতাম। কিছুদিন পরেই আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমাদের নাট্য পরিচালকেরও প্রধান আসক্তি সাহিত্যে, অগাধ তাঁর পড়াশুনো এবং দেশি-বিদেশি সাহিত্যের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। অবশ্য তখনও টের পাইনি যে তিনি নিজেও একজন লেখক।

আমরা অল্পদিনেই তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়লুম এবং হরবোলার আড্ডার শেষে আমরা একই সঙ্গে বাসে চেপে বাড়ি ফিরতুম বলে (হরবোলার দপ্তর ছিল এলগিন রোডে সিগনেট প্রেসের বাড়িতে, আর আমরা প্রায় সকলেই থাকতুম শ্যামবাজারের কাছাকাছি, কমলকুমার আরও উত্তরে) আরো অনেকক্ষণ তার সঙ্গ পেতাম, এর পরেও পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্পে গল্পে মধ্যরাত্রি পার করা। শব্দ ব্যবহারের অসীম ক্ষমতায়, শুধু কথা দিয়ে তিনি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন।

হরবোলা নামের প্রতিষ্ঠানটি বেঁচেছিল কিঞ্চিৎ-অধিক চার বছর। এর পরেও আমরা কমলকুমার মজুমদারের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে যাই।

কমলকুমারের রচনা প্রসঙ্গে এই হরবোলা-পর্বটি তুলে ধরার বিশেষ কারণ আছে। এর আগে তিনি সাহিত্যপত্র ও চতুরঙ্গে কয়েকটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন মাত্র এবং মাঝখানে বেশ কিছুদিন সাহিত্যরচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। হরবোলা-আসরের ধারাবাহিক সাহিত্য প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁকে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এই সময়েই তিনি হাত দেন তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনায়। অকস্মাৎ একদিন তিনি আমাদের একটি অখ্যাত পত্রিকা উপহার দিলেন, তাতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পূর্ণ উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'।

পুস্তকাকারে প্রকাশের পর 'অন্তর্জলী যাত্রা' পাঠক মহলে কোনো সাড়া জাগায়নি। তাঁর খ্যাতি কিছু নবীন লেখকদের, বিশেষত কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা এই উপন্যাস পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলুম বলা যায়। এরকম কোনো রচনা আমরা বাংলাভাষায় আগে পড়িনি। প্রথমে বেশ শক্ত লেগেছিল, এক একটি বাক্য খুবই দীর্ঘ, বারবার পড়েও সঠিক অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু শব্দ ব্যবহারের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় এটা ঠিকই বুঝতুম যে অসাধারণ কিছু আস্বাদন করছি। ফৈয়াজ খানের তালগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছন্দ এবং কারিকুরি

আমরা যেমন সব বুঝতে পারি না কিন্তু অনুভব করতে পারি যে একজন মহৎ শিল্পীকে শ্রবণ করছি। 'অন্তর্জলী যাত্রা' সাধু ক্রিয়াপদে লেখা। এর বাক্য গঠনরীতির সঙ্গে পরিচিত বাংলার কোনো মিলই নেই। আমরা তখন কাফকা ও জয়েসে দীক্ষিত হয়েছি, তবু বুঝেছিলুম, কমলকুমারের রচনার জাত ওঁদের থেকেও আলাদা।

এবার 'গোলাপ সুন্দরী' প্রসঙ্গে আসি। এই রচনাটির সঙ্গে গোড়া থেকেই আমরা কয়েকজন জড়িত। আমাদের 'কৃত্তিবাস' ছিল তখন শুধুই কবিতার পত্রিকা, অন্য কিছু তাতে ছাপা হত না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গদ্য লেখক বন্ধুরাও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তখন আমরা ঠিক করেছিলুম যে কবিতার কৃত্তিবাসে গদ্যের অনুপ্রবেশ ঠিক হবে না বটে, কিন্তু ওই কৃত্তিবাস নামেই আর একটি গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ গল্প ও কবিতার জন্য একই নামে দুটি আলাদা পত্রিকা। এই গল্প-কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কমলকুমারের গল্প 'ফৌজ-ই-বন্দুক'। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য তিনি রচনা করতে শুরু করেন 'গোলাপ সুন্দরী'।

প্রত্যেকদিন আমরা গোলাপ সুন্দরীর একটু একটু অগ্রগতির কথা শুনতুম। যেমন, টি বি স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের জন্য একজন বিনামূল্যে এপিটাফ লিখে উপহার দিতে চায়; একটি নারী যে একবার জল রং-এ চিত্র আবার কখনো ভাস্কর্য; একজন কারুর ছেলেবেলা তার বাগানের গোলাপে ফুটে উঠবে; একজন কারুর খরচ করার মতন নিঃশ্বাস কম আছে বলে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে না,... ইত্যাদি। ছোটগল্প হিসেবে শুরু হয়ে লেখাটি ক্রমশ বড় হতে থাকে। গোলাপ সুন্দরী সমাপ্ত হবার পর এক সন্ধ্যায় ওয়েলিংটনের মোড়ে একটি সাঙ্গুভেলি রেস্তোরাঁয় আমাদের কয়েকজনকে কমলকুমার সেটি পুরো পাঠ করে শোনান। মনে আছে, প্রচণ্ড নেশার ঘোরে বাড়ি ফিরেছিলাম সেই রাত্রে। সেই বয়েসে, এরকম একজন লেখককে সামনাসামনি দেখছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছিলুম।

প্রবল অর্থাভাবে আমরা গল্প-কৃত্তিবাসের দ্বিতীয় সংখ্যা আর প্রকাশ করতে পারিনি। সেই সময় আমাদেরই বন্ধু নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধায়ের সম্পাদনায় 'এক্ষণ' নামে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হচ্ছিল, লেখকের সম্মতিক্রমে 'গোলাপ সুন্দরী' দেওয়া হয় সেই পত্রিকায়। পরে তিনি 'এক্ষণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে যান এব ং তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে 'দেশ' পত্রিকার দুটি বাদে বাকি সব ওই পত্রিকাতেই বেরিয়েছে। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় ইন্দ্রনাথ মজুমদারের, যিনি কমলকুমারের বাকি জীবন ভাই-বন্ধু-পুত্রের মতন সঙ্গে থেকেছেন এবং কমলকুমার মজুমদারের গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করে তাঁকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেন।

গোলাপ সুন্দরী কমলকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা কি না জানি না, তবে তাঁর সম্পূর্ণাঙ্গ দু'-তিনটি রচনার অন্যতম নিশ্চয়ই। 'গোলাপ সুন্দরী' অনেককাল দুর্লভ হয়েছিল, পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হবার ফলে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হল।

যাঁরা কমলকুমারের রচনায় দীক্ষিত, তাঁদের কাছে গোলাপ সুন্দরীর ভাষারীতি বেশ সহজ ও সাবলীল মনে হবে, কেন না, শেষের দিকে ক্রমশ তাঁর রচনা আরও জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। একেবারে শেষ জীবনের দু-একটি লেখা বারবার পড়ে আমিও যেন সঠিক মর্মোদ্ধার করতে পারছি না মনে হয়েছে। সেই তুলনায় গোলাপ সুন্দরী সরল নিশ্চয়ই। তবু, সদ্য নতুন পাঠকদের কাছে এই গোলাপ সুন্দরীর ভাষাও প্রাথমিক বাধার সৃষ্টি করতে পারে বোধহয়। সেইজন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার।

কমলকুমারের ভাষা একেবারেই অন্য রকম। কেন এরকম ভাষায় তিনি লেখেন, সে প্রশ্ন অনেকবার করেছি। এক এক সময় এক এক রকম উত্তর দিয়েছেন তিনি। যেমন, বাংলা গদ্যের বাক্যবিন্যাস তৈরি হয়েছে ইংরেজির অনুকরণে। কমলকুমারের মতে, যদি বিদেশি রীতি নিতেই হয়, তবে ফরাসি বাক্-ভঙ্গি অনেক বেশি কাম্য। তিনি ইংরেজি-প্রভাব অস্বীকার করে ফরাসি-রীতিতে বাংলা গদ্য লেখেন। আবার কখনো কখনো বলেছেন, হাটে-বাজারে, বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, সে ভাষায় সাহিত্যের রচনা উচিত নয়। সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা, তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়।

তবে, এগুলোও বোধহয় সঠিক যুক্তি নয়। আধুনিক বাংলা গদ্য অনেকখানিই রবীন্দ্র-অনুসারী গদ্যে। এই রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর তেমন মনঃপূত ছিল না। তিনি পছন্দ করতেন গদ্যের দৃঢ়তা এবং মনে করতেন, বাংলা গদ্য বঙ্কিম-দৃষ্টান্তেই চলা উচিত ছিল। তবুও, সাধু ক্রিয়াপদ আঁকড়ে ধরে থাকলেও, কমলকুমারের গদ্য ঠিক বঙ্কিমী গদ্য নয়, এ তাঁর নিজস্ব তৈরি করা ভাষা। নিজের লেখার জন্য একজন লেখক আলাদা ভাষা তৈরি করে লিখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বেশি নেই।

তাঁর বিষয়বস্তুও অভিনব। তিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের লেখক হলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমসাময়িক জীবন প্রসঙ্গ কদাচিৎ এসেছে। তিনি গত শতাব্দীর বাঙালি-গৌরবে মুগ্ধ ছিলেন বলে তাঁর অনেক রচনারই পটভূমি গত শতাব্দী। অথবা, এই শতাব্দীর গোড়ার দিক। তাঁর শৈশব-কৈশোরের পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতি নিয়ে লিখতেই তিনি ভালোবাসতেন। গোলাপ সুন্দরী পটভূমিও স্বাধীনতার আগের আমলের।

তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাটিই বেশি জটিল। যেন তিনি পাঠকদের পরীক্ষা করতে চান। শাল-সেগুনের জঙ্গল দেখেই যারা ফিরে যেতে চায় তাদের তিনি চন্দনের বনে পৌঁছবার পথের সন্ধান দিতে চান না। সেই জন্য পাঠকদের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। যেমন, গোলাপ সুন্দরীর প্রথম বাক্যটি : "বিলাস অন্যত্রে, কেননা সম্মুখেই নিম্নের আকাশে, তরুণ সূর্য্যবর্ণ কখনো অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদসকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে"। প্রথমেই তিনি একটা রঙের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করলেন, এবং এর একজন

দ্রষ্টা আছে, তার নাম বিলাস, সে একজন যুবক, তার মন এখন অন্যত্র। কমলকুমারের একটা বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মানুষের অনুভূতি, তার পরিবেশ, তার রচিত দৃশ্যের বর্ণনা দেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, সেই তুলনায় চরিত্রগুলিকে আঁকেন কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে। বিলাসের জামাইবাবু মোহিতের চেহারাটি কেমন তিনি বললেন না, কিন্তু তার গাড়িটির বর্ণনা চমৎকার। মোহিতকে অবশ্য তার বাক-ভঙ্গির জন্য আমাদের চিনতে একটুও অসুবিধে হয় না, কারণ সে নিজের কাছে নিজেই অত্যন্ত ফেমাস ম্যান।

গল্পের শুরু একটি স্যানাটোরিয়ামে। যক্ষ্মা যেমন এক সময় ছিল রাজরোগ, তেমনি একসময় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবেও এই রোগটি রাজ-স্থান পেয়েছিল। দেশ-বিদেশের অনেকগুলি বিখ্যাত উপন্যাস লেখা হয়েছে এই রোগীদের নিয়ে। স্যানাটোরিয়ামের বর্ণনা টমাস মান-এর উপন্যাসে আছে অসাধারণ, কমলকুমার সেই স্যানাটোরিয়মকে আনলেন সম্পূর্ণ নতুন রূপে। হাসপাতাল মানেই রক্তহীনতা, আর তিনি প্রথমেই সেই হাসপাতালকে ভরিয়ে দিলেন রক্তে। বিলাস হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে, তার দিদি-জামাইবাবু তাকে নিতে এসেছে, সেইসময় বাইরে মোহিতের গাড়ির ফুটবোর্ডে (এখনকার গাড়িতে এ জিনিস থাকে না) বসে একটি গ্রাম্য বালক সাবান জলের ফেনার বুদ্বুদ ওড়াচ্ছে অসংখ্য। সেই সব 'সুডৌল, দ্যুতিসম্পন্ন, সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী, আশ্চর্য' বুদ্বুদগুলি ভরিয়ে দিয়েছে হাসপাতাল। সেই ভ্রাম্যমাণ বুদ্বুদ, গতিশীল বর্ণচ্ছটা, যা কয়েক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়, তা দেখে বিলাস মুগ্ধ, কারণ সে ছুটি পেয়েছে। কিন্তু অন্য অনেক রোগী চঞ্চল ও ব্যথিত হয়। চেট্টি নামে একজনের মনে হয় সেই বুদ্বুদ 'ভ্রাম্যমাণ নিদ্রা, চলন্ত এপিটাফ'। এবং সে তার প্রিয় এপিটাফটি উচ্চারণ করে। এখানে লেখক বাংলা অক্ষরে আট লাইনের একটি ফরাসি এপিটাফ লিখে দিলেন, অর্থ বলে দেবারও চেষ্টা করলেন না, পাঠককে তিনি এমনই শিক্ষিত মনে করেন। গোলাপ সুন্দরী প্রথম পাঠের সময় আমরা অবশ্য সেরকম শিক্ষিত ছিলাম না, তাই অনুসন্ধান করে জেনেছি, সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি কবি স্কারোঁ-র রচনা ওইটি, তাঁর নিজের এপিটাফ, কেউ যেন শব্দ না করে, কারণ এই প্রথম রাত্রে স্কারোঁ ঘুমোচ্ছে।

এই পর্যন্ত দু-তিনগুণ মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে, গোলাপ সুন্দরীর বাকি অংশের রস গ্রহণ করতে কোনো পাঠকের অসুবিধে হবার কথা নয়।

গোলাপ সুন্দরীর মূল কাহিনীটি অতিশয় রোমান্টিক। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার পর বিলাস কোনো স্বাস্থ্যকর নিরালা জায়গায় একটি বাগানবাড়িতে একা থাকে। সে বাগানে গোলাপ ফোটায়, বিশেষত একটি গোলাপ, যার রং ঠিক কীরকম লাল হবে তা সে নিজেই জানে না, যে গোলাপের জন্য নির্দিষ্ট একটি নারী আছে, সেই নারী কখনো সেই গোলাপের কাছে এলে তাকে আর ভালোবাসার কথা মুখে উচ্চারণ করতে হবে না। একসময় আসে সেই নারী, তার নাম মণিকা চ্যাটার্জি। সত্যিই সে এক সময়ে জলরঙের

চিত্র, পরে ভাস্কর্য হয়। কাহিনীর চেয়েও বড় এর কাব্য সৌন্দর্য, কয়েকটি মাত্র চরিত্র তবু জীবনের কত দিক উদ্ভাসিত করেছেন লেখক, মৃত্যুকে দিয়েছেন মহান সংজ্ঞা।

এই বই একাদিক্রমে বার বার পড়তে হবে। এমন বই বাংলাভাষায় তেমন বেশি নেই, যা প্রত্যেকবার নতুন করে পড়লে প্রত্যেকবারই নতুন নতুন সূক্ষ্ম রসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

একটি চিঠি

সম্পাদক সমীপেষু,

কৃত্তিবাসের একুশ নম্বর সংকলনে কমলকুমার মজুমদার রচিত সুহাসিনীর পমেটম পড়লাম। আমি কমলকুমার মজুমদারের কোনো রচনা আগে পড়িনি। আমার সাহিত্য সংক্রান্ত চিন্তা, পাঠ ও পরিধির মধ্যে ওই নাম কোথাও ছিল না। দৈবাৎ আমি তাঁর দেখা পাই। প্রথম একটি পৃষ্ঠা পড়তে গিয়েই আমি বিব্রত বোধ করি, আমার মস্তিষ্কে বিভ্রম জাগে। কিন্তু নিবৃত্ত না হয়ে আমি আবার প্রথম থেকেই শুরু করে তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মনঃসংযোগে পাঠ করে যাই, কিন্তু তবু বিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ ঘটতে থাকে। আমি অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। মনে হয়, কে এই কমলকুমার মজুমদার, কী তার অধিকার? আমি একজন মাঝারি ধরনের শিক্ষিত, সাধারণ মানুষ— আমার মাতৃভাষায় লিখিত কোনো রচনা আমি পড়ে শেষ করতে পারব না— এ ধারণা আমাকে বিমূঢ় করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে এ পর্যন্ত যে মনোহারী, সতেজ, সুরবান, সৌরভময়, চিরহরিৎ, অতি প্রিয় বাংলাভাষার সৃষ্টি হয়েছে,তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার সাহস বা অধিকার এ লেখক কোথায় পেলেন? একজন খুব সাধারণ কিন্তু অপমানিত পাঠক হিসেবে আমি কমলকুমার মজুমদারকে অভিশম্পাত দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু অন্য কথা মনে পড়ায় যথাসময়ে নিজেকে সংযত করেছি।

কিছুকাল আগে, আমার এক বন্ধু, স্যামুয়েল বেকেট রচিত একটি দীর্ঘ চম্পূ পড়ে শেষ করার জন্য প্রায় সাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেখেছিলাম। বেকেটের ভূতপূর্ব মনিব, জয়েস সাহেবের রচনাবলী পড়ার সময়ও অনেকের কম পরিশ্রম হয় না। আর, আমারই মাতৃভাষায় লিখিত এই রচনা ভালো কি মন্দ জানার জন্য নিশ্চিত সেই পরিশ্রম ও মনঃসংযোগ করা কর্তব্য। আমাদের দেশে যাঁরা জেমস জয়েসের ইউলিসিস পড়েছেন বলে ঘোষণা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ও গ্রন্থটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গিঁটহীন রচনার মতো একইরকম অনায়াসে পড়েননি। অথচ জয়েস ও বিভূতিভূষণ দুজনেই মহৎ লেখক।

এ ছাড়া জয়েসের ফিনেগান্‌স ওয়েক খুব একটা দুর্বোধ্য কঠিন বই— এরকম একটি গুজব আছে— অবশ্য যাঁরা এই গুজবটি ছড়ান—তাঁরা অধিকাংশই ও বইটি কখনো চোখেও দেখেননি। ভালেরির মসিও তেস্‌ সম্পর্কেও এই একই প্রকার কানাঘুষো। যাই হোক, আমি ওসব বই পড়িনি। তবে আমার মনে হয়, একটি দশ লাইনের কবিতাও তো খুব কঠিন ও দুর্বোধ্য হতে পারে। কিন্তু সেটাও যে দুর্বোধ্য এবং আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তা বলার জন্য আমি কবিতাটি পড়ে শেষ করতে পারি ঠিকই। অথচ একটি দীর্ঘ রচনা যদি দুর্বোধ্য এবং বাজেও হয় তবু সেটা শেষ করতে না পারার কারণ কি শুধুই আলস্য? একথা অতি লজ্জার। যে-কোনো রচনাই, শেষপর্যন্ত পড়তে পারিনি বলে, তা বাতিল করা সভ্যতার উপযোগী নয়। বিশেষত রচনাটি যখন আমার মাতৃভাষায়। এবং নির্বিশেষে সমস্ত লেখক সম্পর্কে আমার এই শ্রদ্ধা আছে যে, একজন পাঠক কোনো লেখকের একটি রচনা পাঠ সমাপ্ত করলে, সেই লেখককে ধন্য করা হয় না, পাঠকই ধন্য হয়। সুতরাং, নিজের কাছে সৎ থাকার জন্য সুহাসিনীর পমেটম আমি আবার পড়তে শুরু করি।

এবার পাঁচপাতা পর্যন্ত এগিয়ে যাই। শিরা দপদপ করে ও সমস্ত আবহাওয়া থমথমে। আমি বুঝতে পারি— আমার জীবনে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমার ভালো লাগছে। কিন্তু পাঠককে এতখানি কষ্ট দিয়ে মজুমদার মহাশয় কী স্যাডিস্টিক আনন্দ পান? ততক্ষণে আমি ২৯ পৃষ্ঠায় এসেছি। ন্যাংটো বালক লখাই-এর প্রস্রাবযন্ত্রের সামনে অষ্টাদশী তরুণীর সুহার আঁজুনি ওঠা চোখ তখন আধ-বোজা— এই দৃশ্যের কাছে আমি শিউরে উঠি, এবং "ইহার সম্মুখে বালিকা যে বহু শিব গড়িয়াছে যাহার রহস্যময় অন্তরীক্ষ হইতে রং সকল শুভ যাত্রা করিয়া ইহলোকের বাঁশরীর শব্দের দায়িত্ব, যে অন্তরীক্ষের শূন্যতায় হ্লাদিনী-উজ্জীবিত-সাধ্য অমর জ্যোতিপ্রভা, বীজকণা সমূহ পরিক্রমণশীল— বেগবতী নদীর তরঙ্গস্তর ভাঙিয়া সেই স্থান হইতে কোন মমতাময় 'এসো এসো' কণ্ঠস্বর আসিতে থাকে..." এই বাক্যবন্ধ পড়ে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি— এ রচনা কোনো ভাষা বা গল্পের প্রশ্ন নয়— এ এক দর্শন, বহুদিনের বাসনার উন্মোচন, এখানেই বাংলাদেশ। কত দিন বাংলা দেশের কথা পড়িনি, কতদিন বাংলাভাষায় আর বাংলাদেশের কথা লেখা হয় না। বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। আজকাল বাংলায় শৌখিন বা জটিল, জৈব বা অজৈব সমস্যাসংকুল কত কাহিনি পড়া যায়, কিন্তু বাংলাদেশ একেবারে অনুপস্থিত। আমি ভিখারি ও ক্ষুধার্তের মতো এই রচনা পড়তে থাকি তারপর। কোনো কোনো অংশে বার বার ও ফিরে ফিরে এসে। যেদিন শেষ হল, অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। কৃতজ্ঞতায় আমার চক্ষু দিয়ে জল আসে। মানুষকে নিয়ে গল্প নয়, মানুষের হৃদয়-দর্শন এবং দর্শনের সৌন্দর্য সন্ধান— এর আগে আমি কখনো গ্রন্থপাঠে এরকম অভিজ্ঞতা পাইনি। আমরা যারা নিরীহ মানুষ— আমাদের প্রিয় মাতৃসাহিত্যে নকল ঐতিহাসিক বা রহস্যকাহিনীর উৎপাত দেখে গোপনে

দুঃখিত হই, অহংকারী বা আহাম্মককে লেখকের ভূমিকায় দেখে কষ্ট পাই, কুসাহিত্য ঢক্কানিনাদ শুনলে বিরলে দীর্ঘশ্বাস ফেলি, প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধের সামর্থ্য নেই,— আমাদের অন্তত একবার এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়ে এই লেখক চিরকৃতজ্ঞ করলেন। অন্তত একদিনের জন্যও বাংলাদেশে বেঁচে থাকা সার্থক মনে হয়। আমি মূক, তবু বুঝতে পারি বাংলাদেশকে ভালোবাসায় আমি আর একা নই। তাঁর এই সৌন্দর্য দর্শনকে কমলকুমার মজুমদার কেন লখিন্দরের বাসর-ঘরের মতো এমন কঠিন ভাষায় ঘিরে রেখেছেন আমি জানি না! যারা এই কঠিন দেয়াল দেখে ফিরে যাবে— সেই হতভাগ্যদের জন্য মায়া হয়। হয়তো তিনি ভালেরি'র মতো বলতে চান, ডু নট এনটার উইথআউট আ ডিজায়ার। যাই হোক, আমি যে প্রবেশ করতে পেরেছি— এ গর্ব আমরা নিজের।

নমস্কারান্তে
অতীন্দ্রনাথ ঠাকুর*
বহরমপুর

* সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম

বাংলা ছোটোগল্পের তিন দিকপাল

সব সাহিত্যেই কিছু কিছু লেখক থাকেন, যাঁদের আবির্ভাব হয় আকস্মিকভাবে, পরেও যাঁরা থেকে যান মূল ধারার বাইরে। আক্ষরিক অর্থেই যাঁদের বলা যায় আউটস্ট্যান্ডিং। সব লেখকেরই প্রথম জীবনে একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকে, সেই পর্বটি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকে, জানতে ইচ্ছে করে, অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রেই জানা যায়। সকলেই লেখে না, কেউ কেউ লেখে। এক পরিবারের অনেক সদস্যের মধ্যে অন্য কেউ লেখা-টেখার তোয়াক্কা করে না, শুধু একজন কেন গোপনে অনেক সাদা পৃষ্ঠা অক্ষরে ভরিয়ে দেয়, সে রহস্যের আজও কোনো সমাধান হয়নি। ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগ নেই, খ্যাতি কিংবা অর্থপ্রাপ্তির সুদূর সম্ভাবনা নেই, তবু কেউ কেউ লেখে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত কোনো আসামিও লিখেছে, অমর সাহিত্য রচনা করে গেছে।

সাহিত্য সৃষ্টির স্ফুরণ হয় কৈশোরেই। যৌবনে আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তি থাকে আকাশের মতো সীমাহীন। কলম হাতে নিয়ে যে একবার শব্দকে নিজস্বভাবে ব্যবহার করার অভিনব স্বাদ পেয়েছে, সে সেই শব্দ সম্বল করেই তার কাছাকাছি এক টুকরো পৃথিবীর ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজের মনোজগতের নির্যাস অপরকে জানাবার জন্য যে ব্যাকুলতা তা থেকেই রচিত হয় কবিতা,গল্প, উপন্যাস। যাঁরা শেষপর্যন্ত সার্থক সাহিত্যিক হন, তাঁরা সাধারণত অনেক কিছু পেয়ে যান, পাঠকদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। তাঁদের বলা হয় সফল লেখক। কিন্তু কোনো সার্থক লেখকেরই রচনা শুরু করার সময় এই সাফল্যের প্রতি লোভ থাকে না, হয়তো স্বপ্ন থাকতে পারে, কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি, স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ কিংবা আত্ম-নিপীড়নের নেশাই তখন বেশি থাকে। যৌবনেই এসব মানায়। যৌবনেই বোঝা যায়, শুধু কলম হাতে নিয়ে কে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে এগোবে, অনেকেই কিছুদিন পর ফিরে যায়।

বিশ্বের প্রায় সব সাহিত্যিকই যৌবন বয়সেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। যার যৌবন কেটে যায় ভিন্ন মনস্কতায়, পরে সে আর সাহিত্যের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হতে পারে না।

তবে, যৌবন পার করেও সাহিত্যের অঙ্গনে সক্ষম পদক্ষেপে আগমন খুব বিরল হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। এই বিরল আগমন অবশ্যই বিস্ময়কর।

সাহিত্যজগতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পান, তাঁরা আসেন সাধারণত কোনো পত্রিকাকে অবলম্বন করে কিংবা কোনো লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কিংবা পারিবারিকভাবে বা সামাজিক সূত্রে তাঁদের জীবনে অন্য কোনো লেখকের প্রভাব থাকে, সাহিত্যের একটা পরিমণ্ডলের কাছাকাছি এসে তাঁরা কোনো না কোনোভাবে প্রেরণা পান। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজজীবনের শুরুতেই মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন, তারপর নিজেই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়েস থেকেই তাঁদের নিজস্ব পারিবারিক একাধিক পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উদয় অনেকটা ধূমকেতুর মতন বলে মনে হলেও তিনি কৈশোর-প্রথম যৌবনে হাতে-লেখা পত্রিকায় লিখে হাত পাকিয়েছেন। তা ছাড়া, তাঁর মাতুল পরিবারের অনেকেই ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা লেখক।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তিনজন বিশেষ প্রতিভাবান লেখক এসেছেন এই প্রথার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদার। এঁদের শিল্পপ্রক্রিয়া এখনও আমাদের কাছে রহস্যময় মনে হয়। এঁরা সমসাময়িক নন, বরং বলা যায় পর্যায়ক্রমিক, যেন একজনের হাতের মশাল নিয়ে অন্যজন এগিয়েছেন, কিন্তু পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা, মনে হয় মনোজগতের তিনটি পৃথক প্রদেশের বাসিন্দা, কারুর সঙ্গে কারুর রচনারীতি কিংবা জীবনদর্শনের মিল নেই বিন্দুমাত্র।

কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ খুঁজে বের করা যায় অবশ্য। এই তিনজনই সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছেন প্রৌঢ় বয়েসে, এঁরা সাহিত্যের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হলেন তা আজও প্রায় অজ্ঞাত। জগদীশ গুপ্ত কলেজ-বয়েসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন অর্থাভাবে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্য কিংবা সংস্কৃত সাহিত্য যে তাঁর বেশ পড়া ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কমলকুমার মজুমদারও কোনোরকম ডিগ্রি পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করেননি, যদিও অর্থাভাব তার কারণ নয় এবং তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অগাধ। কলকাতার প্রাচীন পরিবারগুলির ধারা অনুযায়ী তিনি স্বশিক্ষিত এবং ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। সতীনাথ ভাদুড়ী আবার প্রথাগতভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন অর্থনীতি এবং আইন, কিন্তু এই বিদ্যার প্রয়োগ করেননি তেমনভাবে। আইন পাস করেও তিনি শামলা এঁটে বেশিদিন যাতায়াত করেননি আদালতে, তার বদলে প্রথম জীবনে রাজনীতি, পরে উদ্যান-সৌন্দর্যচর্চায় মগ্ন থেকেছেন। ইনিও ফরাসি ভাষার চর্চা করেছেন নিজে নিজে এক মফস্‌সল শহরে বসে। হিন্দি-উর্দুতে দখল তো ছিলই, রুশ ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলেন একসময়। জগদীশ গুপ্ত জীবদ্দশায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান কিংবা পুরস্কার পাননি, শেষজীবন কেটেছে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবহেলায়। যাদবপুরের এক রিফিউজি কলোনিতে তিনি প্রায় অন্ধ অবস্থায় শেষনিশ্বাস

ফেলেছিলেন, তখন তাঁর ওষ্ঠে নিশ্চিত নিদারুণ তিক্ত স্বাদ ছিল। পাঠকদের কাছেও সমাদর পাননি তিনি, কিন্তু সমালোচকদের স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেকখানি, সমস্ত অগ্রগণ্য সাহিত্য- পণ্ডিত ও সমালোচকরা তাঁর প্রতি যথেষ্টরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কলম ধরেছেন তাঁর জন্য। কমলকুমার মজুমদার জীবিতকালে পাঠক পাননি, সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি তাঁর দিকে, তাঁর নামে বঙ্কিম পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর এগারো বছর পর, যা এক নির্মম রসিকতার মতন, যা মুকুন্দ দাসের বিখ্যাত গানের লাইনটি মনে করিয়ে দেয়। সতীনাথ ভাদুড়ী আবার এদিক থেকে এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, এক অজ্ঞাতকুলশীল লেখক হয়েও প্রথম উপন্যাসের জন্যই তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার, যা এ দেশে শ্রেষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান। এ দৃষ্টান্ত আজও তুলনারহিত।

প্রথমে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত থেকেই শুরু করা যাক।

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত জন্মেছিলেন গত শতাব্দীতে পূর্ববাংলার কুষ্টিয়ায়। প্রথম যৌবনেই তাঁকে চাকরি নিতে হয়, অতি সাধারণ চাকরি, আদালতের কেরানিগিরি। চাকরিসূত্রে বদলি হতে হতে তিনি আসেন বোলপুরে, অদূরেই শান্তিনিকেতন, কিন্তু রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যাওয়ার স্পৃহা তাঁর ছিল না। তিনি কস্মিনকালেও রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আদালতের কেরানিটির মানসিকতার বিস্তর ব্যবধান। সেইসময়ে কল্লোল, কালি-কলম গোষ্ঠীর তরুণ লেখকরা প্রকাশ্যে রবীন্দ্র-বিরোধী বলে পরিচিত হলেও আসলে সকলেই ছিল প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রভক্ত, তখনই তাঁরা গোপনে, নিভৃতে পাতার পর পাতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে চিত্তশুদ্ধি করতেন এবং পরবর্তীকালে সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। বাংলাভাষায় যাঁরা চর্চা করবেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মাথার ওপর বসিয়ে রাখাটা অপছন্দ করতে পারেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে গুরুঠাকুর হিসেবে মান্য করাটা ন্যাকামি মনে করতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। সেই দিক থেকে জগদীশচন্দ্র কী করে রবীন্দ্র-বর্জিত হয়ে রইলেন, তা বেশ কৌতূহলজনক।

বোলপুরে থাকার সময়েই, একচল্লিশ বছর বয়েসে জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* ছাপা হয়। এত বেশি বয়েসে আদালতের এক কেরানির হঠাৎ লেখক হবার সাধ জন্মাল কেন? অল্প বয়েসে তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থটি খুবই দুর্লভ, তাঁর রচনাবলিতে কিছু কিছু কবিতার নমুনা আছে, সেগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার মধ্যে প্রতিভা কিংবা বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন নেই। তারপর সুদীর্ঘকাল সাহিত্যজগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সংস্রব ছিল না। *বিনোদিনী* গ্রন্থটির আগে তাঁর দু-চারটি গল্প পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু তাও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়ে। এমনকি প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া জাগাতেও পারেননি। কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ থেকে জানতে পারা যায়, প্রথম দিকে তাঁর অনেক

রচনাই ফেরত আসত, সম্পাদকের নির্দেশে গল্পের কিছু কিছু অদলবদল করে নতুনভাবে লিখতে হত। প্রথম গল্পগ্রন্থ ছাপার জন্যও তিনি প্রকাশক পাননি, বোলপুরের এক সহৃদয় ব্যক্তি খরচ দিয়েছিলেন, সেই বইয়ের তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কপির বেশি বিক্রি হয়নি, বাকি কপিতে ধুলো জমেছে।

তবু তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করে রইলেন কেন? 'গল্প কেন লিখিলাম?' এই নামে জগদীশচন্দ্রের একটি রচনা আছে। তাতে তিনি কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, তাঁর স্ত্রীর তাড়না থেকে বাঁচার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখলেই হাতে একটা পয়সা দিয়ে বলতেন বাজার থেকে ধনে কিংবা কাঁচালঙ্কা কিংবা পান কিংবা সোডা কিংবা মউরি কিনে আনতে। অনবরত বাজারে ছোটা এবং বউয়ের ফরমাশ খাটা এড়াবার জন্যই তিনি কলম হাতে নিয়ে লেখার ভান করতেন। ভান করতে-করতে একদিন গল্প লিখে ফেললেন। এটা বেশ একটা ভালো ধরনের রসিকতা, কিন্তু সত্যিকারের আত্ম-উদ্‌ঘাটন নয়। লেখকরা সাধারণত তাঁদের প্রেরণার গূঢ় সত্যটি বলতেও চান না। অন্তরের তাগিদ, নিজেকে প্রকাশ করার যন্ত্রণা কিংবা সাহিত্যে নতুন কিছু সংযোজনের বাসনা, এ সবই গালভরা বা আত্মম্ভরিতার মতন শোনায়। 'কেন লিখি' এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ লেখকই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে উড়িয়ে দেন। সৈয়দ মুজতবা আলী অনেকবার স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, লিখি শুধু টাকার জন্য! আমরা জানি, তাঁর ক্ষেত্রেও এই উত্তর একেবারেই সত্য নয়।

একজন মহৎ লেখকের গুপ্ত সাহিত্যপ্রতিভা হঠাৎ ফেটে বেরিয়েছে, 'বিনোদিনী'পড়লে সে-কথাও মনে হয় না। গল্পগুলি গল্প হিসেবে বেশ দুর্বল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বাংলা ছোটোগল্পের আঙ্গিক যথেষ্ট উন্নত, উপন্যাসের তুলনায় ছোটোগল্পতেই প্রতিভাবান লেখকরা পরস্পরের সঙ্গে স্পর্ধা করছেন, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত সেই আঙ্গিক আয়ত্ত করতে পারেননি। আমার মনে হয়েছে, সেগুলি ছোটোগল্পের বদলে যেন উপাখ্যান। কিছু কিছু রোমহর্ষক ঘটনা কেউ কেউ যেমন মুখে বর্ণনা দিয়ে চমকে দেয়, তার নিজের অভিজ্ঞতাও নয়, শোনা কথা, সেই ধরনের। 'পল্লী শ্মশান' গল্পটির গঠনেও সেই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এক বন্ধু আর-এক বন্ধুকে তার গ্রামের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করায় বন্ধুটি বলল, গ্রামের সে বাড়ি আর নেই, সবাই ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ হিসেবে সে একটি কাহিনি বিবৃত করল। দেশের সেই বাড়িতে একসময়ে থাকত গুটিপাঁচেক বিধবা, এক অথর্ব বৃদ্ধ ও একটি কিশোর। এর মধ্যে আসাম থেকে এক আত্মীয় এলেন শরীরে নানারকম রোগ নিয়ে। গ্রামে ডাক্তার নেই, সুতরাং সেই অসুস্থ বৃদ্ধটিকে মরতে হল শিগগিরই। মৃত্যুতেও সে এই পরিবারটিকে বিপদে ফেলে গেল। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শবটিকে দাহ করা হবে কীভাবে, তাও আবার ব্রাহ্মণের শব? কাছাকাছি প্রতিবেশীরা সবাই মুসলমান। একসময়ে হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট মেলামেশা ছিল,পরস্পরের বিপদে-

আপদে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসত। ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার পর যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, ওই হিন্দু বিধবারা তা জানেন না। কিশোরটিকে বারবার পাঠানো হল মুসলমান পাড়ায়। মুসলমানরা সবাই একবাক্যে বলে দিল, তারা হিন্দুর মড়া ছোঁবে না, কাঠ দিয়েও সাহায্য করবে না। এদিকে মড়া বাসি হয়ে যাচ্ছে। অতি কষ্টে কিশোরটি দূর গ্রাম থেকে কয়েকজন আত্মীয়কে ডেকে আনল, তারা মৃতদেহটি শ্মশানে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু নমো নমো করে কোনোক্রমে শুধু মুখে আগুন দিয়ে আর পুরো পোড়াবার ধৈর্য থাকল না তাদের। বালির বস্তা বেঁধে সেই শব ডুবিয়ে দেওয়া হল নদীতে। বালির বস্তাটার মুখ বাঁধা হয়নি ভালো করে, একটু একটু করে ঝরে গেল সব বালি, দুদিন পরে ভেসে উঠল শব। সেই বিধবারা ঘাটে গিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণের লাশ শকুন-শেয়াল-কুকুর-কাকেরা মিলে ঝটাপটি, কামড়াকামড়ি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তারপরেই অসহায়, সন্ত্রস্ত পরিবারটি গ্রাম ছেড়ে পালাল। এটা একটা বীভৎস পল্লিচিত্র হতে পারে, কিন্তু এটা কি গল্প?

'দিবসের শেষে' নামে গল্পটি আরও বিচিত্র। এটাও যেন পুরোনো আমলের মাসি-পিসিদের গালগল্পের মতন। সাধারণত এইসব গল্প আরম্ভ হয় এইভাবে : শুনেছিস, অমুক গ্রামে একবার কী হয়েছিল? সেইরকমই, এক গ্রামে একটা ছোটো নদীর ধারে রতি নামে এক নাপিতের বাড়ি। তার স্ত্রী নারায়ণী তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর অনেক পুজো-আচ্চা, তাগা-তাবিজ ধারণ করে আর-একটি ছেলের জন্ম দেয়, তার নাম পাঁচু। এই পাঁচুকেও অনেক মাদুলি-কবচ পরিয়ে সাবধানে রাখা হয়, সে বাবা-মায়ের বড়ো আদরের। এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বলল, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে!' এ কথা শুনে মায়ের মন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেও রতি নাপিত রেগে উঠল, এটা একটা অসম্ভব কথা। তাদের এই ছোট্ট নদীতে কেউ কোনোদিন কুমির দেখেনি, কুমির আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই নদী স্তন্যদায়িনী জননীর মতন দয়াময়ী।

কথাটা রটে গেল সারা গ্রামে। বাবুরা কুমিরের কথা শুনে ঠাট্টা করলেন। রতি নাপিতও জেদ ধরে ছেলেকে নিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। কিছুই ঘটল না। বাড়ি ফেরার পর বাবা, মা, এমনকি পাঁচুর মুখেও হাসি ফুটল। সেদিন বিকেলে পাঁচু তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে একটা কাঁঠাল চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল মায়ের কাছে। কাঁঠালের আঠায় তার সারা শরীর মাখামাখি। এ বাড়ির সব জল-কাজই নদীতে। মা আবার ভয় পাচ্ছে বলে বাবাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল সারা শরীর ধোয়াতে। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। বাবার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে পাঁচু, এমন সময়ে তার সামনে ভেসে উঠল কালান্তক যমের মতন এক বিশাল কুমির। রতি নাপিত ফিরে তাকাবার আগেই কুমিরে নিয়ে গেল পাঁচুকে। গল্পটি যেন নিয়তি নামে কোনো দেবীর পাঁচালির অংশ, যদিও অলীক কুমিরের বর্ণনা ব্যঞ্জনাময়।

'ভরা-সুখে' গল্পে একটি বড়ো একান্নবর্তী পরিবারের জননী অনেকদিন অসুস্থ। একসময়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে সবাই খুব খুশি। তখন সমস্ত ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি, নাতবউরা ঠিক করল, মা সেরে ওঠা উপলক্ষ্যে সবাই কিছু না কিছু রান্না করে মাকে একটু করে খাওয়াবে। যেদিন সবাই এরকম একটা আনন্দভোজের ব্যবস্থা করে যখন মাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এল, মা তখন চিরকালের জন্য চোখ বুজেছেন।

'এইবার লোকে ঠিক বসে' গল্পে শিবপ্রিয় নামে এক গ্রাম্য নির্বোধকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোল। সোনা বানাবার আশায় সে এক ধোঁকাবাজ সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে ঘর ছাড়ল। সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসে সে তার পরিবারের সর্বনাশ সামলাতে পারল না, সে নিজেও পাগল হয়ে গেল। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পটির নাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া হলেও এখানে এক অতি বিশ্বাসী ভৃত্য একদিন নির্জন মাঠে প্রভুর গায়ে ছুরি মেরে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। শুধুই এইটুকু কাহিনি। '...পয়োমুখম' কাহিনিটি কিঞ্চিৎ বড়ো, এক কবিরাজ টাকার লোভে তার ছেলের বিয়ে দেয়, আর একটার পর একটা পুত্রবধূকে মেরে ফেলে। এখানে যেন এক মঁসিয়ে ভার্দু শ্বশুরের ভূমিকায়। 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' গল্পে সদু খাঁ নামে এক গ্রাম্য বদমাশ হঠাৎ ধনী হয়ে উঠে সুন্দরী মেয়েদের হরণ করতে শুরু করে। জসিম নামে এক গরিব চাষির বউকে সে আটকে রাখে নিজের বাড়িতে। অর্জুন নামে এক ডাকাবুকো নমঃশূদ্র এই ঘটনা শুনে খেপে যায়, জসিমকে সাহায্য করার জন্য সে দলবল জোগাড় করে। সদু খাঁর গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে অর্জুনের দলের লড়াই হল জোর, এতে অর্জুন-জসিমরাই জয়ী হল। কিন্তু জসিম তবু তার বিবিকে ফেরত পেল না, কারণ সে নিজেই আসতে চায় না।

এগুলিকে নিটোল ছোটোগল্প বলা যায় না, সার্থক সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দেওয়াও মুশকিল। তবু জগদীশ গুপ্তর এই পাঠক-বঞ্চিত গল্পগ্রন্থটি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। এমনকি এতকাল পরেও এই গল্পগুলি যারা প্রথম পড়বে, পড়তে পড়তে তাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হবেই। লেখকের ভাষা ঝরঝরে, গতিশীল, নির্লিপ্তভাবে তিনি পরপর মানুষের অসাধুতা, কলুষ, পাপ, নির্মমতা, সর্বনাশ ও নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের কথা লিখে যাচ্ছেন। সুস্থতা, সৌন্দর্যবোধ, প্রেম, আত্মদান, সাধারণত যেসব বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য, সেগুলিকে তিনি একেবারেই পরিহার করে গেছেন! একজন লেখক পরপর শুধু মানুষের জীবনের খারাপ দিক ও পরাজয়ের কথাই লিখে যাবেন, এও কি সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই বলেই এই লেখক সম্পর্কে আমরা বিস্মিত হই, কিছুটা বিরক্তও বোধ করি, গল্পগুলি আমাদের পছন্দ হয় না, তবু আমরা এই লেখক সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করি। আমরা বুঝতে পারি, এই লেখক সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন রস আনছেন, যাকে উদ্ভট রস বললেও ঠিক বলা হয় না, মোহিতলাল যাকে বলেছেন bizarre, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হলেও অভিনব। সত্য-শিব-সুন্দরের একেবারেই তোয়াক্কা করছেন না

একজন লেখক, এমনটি আর আগে দেখা যায়নি। অনেক লেখক প্রথানুগত ধারায় লিখে লিখে শেষপর্যন্ত গতানুগতিক ও মাঝারি ধরনের হয়ে যান, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত অনন্য।

একচল্লিশ বছর বয়েসে প্রথম গল্পগ্রন্থ, আর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস *লঘু-গুরু*। এই গ্রন্থটিও উপন্যাস হিসেবে অসার্থক কিন্তু বিষয়বস্তুর জন্য বেশ আলোড়ন তুলেছিল। একটি বেশ্যা হতে চাইল গৃহবধূ, কিন্তু পুরুষ নামের কয়েকটি পাষণ্ড তাকে শান্তি দিল না। তার নিষ্পাপ কন্যাটির জীবন করে তুলল দুর্বিষহ। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসটি এক বিবেকহীন তঞ্চকের কাহিনি। আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি, পূর্বপ্রকাশিত ছোটোগল্পকে পরে টেনে লম্বা করেছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি খুবই দুর্বল, উপন্যাস পদবাচ্য হওয়ারই উপযুক্ত নয়। বরং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর পরবর্তী ছোটোগল্পগুলি অনেক উন্নত হয়েছে, ভাষা হয়েছে ধারালো, কিন্তু জেদির মতন তিনি তাঁর নৈরাশ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করেননি কখনও। তাঁর চোখ সবসময় অশুভের দিকে, অশান্তির দিকে, ক্রূরতার দিকে। কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের চেয়ে বয়েসে বেশ বড়ো ছিলেন জগদীশচন্দ্র, তবু তিনি ওই গোষ্ঠীভুক্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুরে মেলেনি, ভাবে মেলেনি। প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমারেরা ছিলেন মূলত রোমান্টিক, তাঁদের ভাষা কাব্যগন্ধী, তাঁদের ঝোঁক হৃদয়ে রহস্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তববাদকেও আশ্রয় করতে চেয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু সে বাস্তবের প্রতি দৃষ্টিতেও রোমান্টিকতার সুর্মা মাখানো। প্রেমের গল্পে তাঁরা এনেছেন শরীর, সেই শরীরে মিশিয়েছেন মোহময় আবেশ, কোনোরকম কদর্যতার স্থান নেই সেখানে। জগদীশচন্দ্র কিন্তু কাব্যের ধার ধারেন না, তার বাস্তবতা শুধু অবিচার আর বঞ্চনায় ভরা, এমনকি অবিচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও নেই। তাঁর চরিত্রগুলির হৃদয় নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, আছে শুধু শরীর, অত্যন্ত চাঁছাছোলা ভাষায় তিনি বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, নর-নারীর শারীরিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে আর কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে 'শঙ্কিতা অভয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মায়ের নাম অভয়া, মেয়ের নাম শান্তি আর বাবার নাম অতুল। এই তিনটিই চরিত্র। এর মধ্যে বাবা আর তরুণী কন্যার মধ্যে খুব ভাব, মা যেন একটু বাইরে পড়ে থাকে। মা সেইজন্য ভয় পায়। ভয় পায়, আরও একটি কারণে, বাবা ও মেয়ের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু বড়ো বেশি খোলামেলা। মেয়েটি লেখাপড়া জানে, নাচতে জানে, বাবা মেয়েকে সবরকম প্রশ্রয় দেয়। বাবা এসরাজ বাজায়, মেয়েটি নাচে। বাবাকে সে হাজার প্রশ্ন করে, তার মধ্যে প্লেটোনিক লাভ, যৌনতা, পুরুষের বেশ্যার প্রতি আসক্তি— এ সবও এসে পড়ে। এইসব শুনে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের জননীর শঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকতেই পারত এবং বাবা-মা-মেয়ের সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে হতেই পারত কোনো স্বাভাবিক গল্প, কিন্তু লেখক সেটাকে একটা আকস্মিক ক্রূর আঘাতের দিকে নিয়ে যাবেনই। গল্পের শেষে

আচমকা মা মেয়েকে প্রশ্ন করল, বাবা তাকে শারীরিকভাবে নষ্ট করেছে কি না! বিস্মিত মর্মাহত শান্তির মুখের ওপর অভয়া আবার বলে দিল, অতুল তার বাবা নয়। একদিন বালিকা শান্তিকে নিয়ে অভয়া কুলত্যাগ করেছিল অতুলের সঙ্গে। সুতরাং সেই 'বেটাছেলে আর একটি মেয়েছেলেকে' নষ্ট করতে তো পারেই। জগদীশচন্দ্র যেন প্রতিটি গল্প লেখার আগেই প্রতিজ্ঞা করে নিতেন, কিছুতেই তিনি নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা ও ক্লেদ থেকে কোনো কাহিনির উত্তরণ ঘটাবেন না। সেই যুগেও তিনি ঈশ্বর, ধর্মবিশ্বাস বা শুভবোধের কোনো প্রসঙ্গই আনেননি কখনও। এও এক ধরনের বলিষ্ঠতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য*-র তিনটি চরিত্রের সঙ্গে এই তিনটি চরিত্রের যেন কিছুটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মানিকের কাহিনি অনেক জটিল এবং নিছক একটা গোপন কথা প্রকাশেই শেষ হয় না।

জীবন জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ কিছু দেয়নি। দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। লেখার জন্য যত পরিশ্রম ও আয়ুক্ষয় করেছেন, তার বিনিময়ে পাননি প্রায় কিছুই। তবু লিখেছেন নিছক লেখার আনন্দেই। একেবারে শেষজীবনে তাঁকে সরকারি মাসোহারার ওপর নির্ভর করতে হত, সেটাও মোটেই সম্মানজনক নয়। তাই তাঁর প্রায় সব লেখাতেই প্রতিফলিত হয়েছে নৈরাশ্য ও নিয়তির কাছে পরাজয়ের ইঙ্গিত। আমার মনে হয়, শুধু দারিদ্র্যও এর কারণ নয়। তাঁর চরিত্রেই কোনো রোমান্টিকতা কিংবা আশাবাদ ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়নি। তৎকালে অনেককেই মার্কসবাদ একটা মুক্তির পথ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জগদীশ গুপ্ত মার্কসবাদকে কেন অবলম্বন করলেন না সেটাও একটা বিস্ময়ের কথা। নৈরাশ্যের প্রতিভূ হয়ে থাকাটাই ছিল যেন তাঁর অহংকার।

সাহিত্য রচনার বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তি কিংবা কোনো পুরস্কারের স্বীকৃতির সম্ভাবনা ছিল না জেনেও কিন্তু জগদীশ গুপ্ত ভেবেছিলেন কোনো না কোনোদিন তাঁর এই রচনাগুলি মর্যাদা পাবেই। সেটাই ছিল তাঁর লেখার প্রেরণা। 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' নামে তাঁর গল্প-গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে তিনি ভবভূতির 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী' এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভবভূতির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি কিন্তু সার্থক হয়নি। তাঁর এই শ্লোকটিই লোকে মনে রেখেছে, তাঁর অন্য রচনা বিশেষ কেউ পড়ে না। জগদীশচন্দ্রকে অবশ্য নিরবধিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, জীবদ্দশাতেই তিনি সমালোচকদের মনোযোগ পেয়েছেন যথেষ্ট। অনেকে বলেন, জগদীশচন্দ্র কখনও জনপ্রিয় হননি। কথাটা ঠিক কি? আমাদের দেশে 'জনপ্রিয়' শব্দটির অর্থ বেশ গোলমেলে, অনেক ক্ষেত্রে খুবই লঘু। বই বেশি বিক্রি হওয়া আর জনপ্রিয়তা কি এক? রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়? শরৎচন্দ্রের বই বিক্রি আজও প্রচণ্ড, সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বিক্রি বরাবরই কম। অনেক লেখকের বই প্রচুর বিক্রি হয় কিন্তু সাহিত্য-আলোচনায় তাঁদের নাম ওঠে না, আবার অনেক লেখকের বই তেমন বিক্রি হয় না, কিন্তু তাঁদের নাম লোকের মুখে মুখে ঘোরে। জগদীশচন্দ্রেরই সমসাময়িক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর বই প্রচুর

বিক্রি হত। এখন তাঁর নাম অনেকের মনে পড়ে না। অথচ বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনায় জগদীশচন্দ্রের নাম অবধারিত।

অন্যান্য দিকে বঞ্চিত হলেও জগদীশচন্দ্রের সমালোচক-ভাগ্য ভালো। মোহিতলাল মজুমদার ও অধ্যাপক অনিলবরণ রায় বহুদিন আগেই তাঁর রচনাগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে মাথায় তোলেননি, তাঁর দোষত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে ভিন্ন রসের উদ্‌গাতা হিসেবে সাহিত্যের অঙ্গনে এটা নির্দিষ্ট আসন দিয়েছেন। ক্রমে সমালোচকদের সুর বদলাতে থাকে। কেউ বললেন, 'জগদীশ গুপ্তের সোনার লেখনী', কেউ বললেন তিনি 'শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মানসপুত্র', কেউ বললেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি বা মন্ত্রগুরু। এ সবই নিতান্ত অতিশয়োক্তি।

এখানে আমাদের দেশের সমালোচকদের সম্পর্কেও দু-একটা কথা বলা দরকার। অনেক সমালোচকই বিশেষ একজন কোনো লেখক সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সাহিত্যের পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটা মনে রাখেন না। একজন কোনো লেখককে প্রশংসা করার সময় অনেকে অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের নস্যাৎ করে থাকেন, যা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। একজন লেখককে বড়ো করার জন্য অন্যদের ছোটো করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ সাহিত্য দৌড়-প্রতিযোগিতা নয়। সুকুমার সেন মহাশয় জগদীশচন্দ্রকে বড়ো করে দেখাবার অভিপ্রায়ে তাঁর সমসাময়িক অন্য আধুনিক লেখকদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন। এতে সন্দেহ হয়, উক্ত পণ্ডিত আধুনিক সাহিত্যের সঠিক পাঠ নিয়েছিলেন কি না। কোনো কোনো সমালোচক আন্ডারডগ খোঁজেন। তাঁরা আবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান। তাঁরা বেছে বেছে, খুঁজে খুঁজে এমন একজন লেখককে তুলে ধরেন, যিনি বহুলপ্রচারিত নয়, যাঁর গ্রন্থগুলি দুর্লভ। এরকম কোনো লেখককে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁর রচনাকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে তাঁকে এক চমকপ্রদ গুপ্তধন হিসেবে প্রতিপন্ন করা সমালোচকদের আত্মবিজ্ঞাপনের পর্যায়ে পড়ে। সেইসব সমালোচক যেন বলতে চান, দ্যাখো, এতদিন তোমরা কেউ এঁকে চিনতে পারনি, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। আমি কত বড়ো বোদ্ধা! আন্ডারডগ হিসেবে বিবেচিত যে লেখক কতিপয় সমালোচকের দ্বারা বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসিত হন, তাঁর আসলে অপমানিত বোধ করারই কথা।

জগদীশ গুপ্ত একজন মহৎ কিংবা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নন। শরৎচন্দ্রের ধারার লেখক তাঁকে বলা যায় না,কারণ শরৎচন্দ্রের মতন আবেগ কিংবা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি কিংবা মন্ত্রগুরু হওয়ার কোনো যোগ্যতাই তাঁর নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো হলেও এঁরা দুজনেই সমসাময়িক লেখক। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প সাপ্তাহিক *বিজলী* পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৫ সালে, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প *বিচিত্রা* মাসিকপত্রে

ছাপা হয় এর মাত্র তিন বছর বাদে। জগদীশ গুপ্ত রচনা শুরু করেন প্রৌঢ় বয়েসে, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নিতান্তই কলেজের ছাত্র, গল্প লিখেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট', গল্প হিসেবে অতি তুচ্ছ, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামী'। যে গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের প্রতিভা চেনা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্পে নিষ্ঠুরতা ও ক্রূরতা খানিকটা প্রাধান্য পেলেও তাঁর সাহিত্যের মূল সুর মানবতাবাদ। উত্তরকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছিলেন তো বটেই, প্রথম দিকেও যে-কোনো লেখাতেই বিশেষ একটা চরিত্রের প্রতি থাকত তাঁর সহানুভূতি।

এই সহানুভূতি ব্যাপারটাই যেন জগদীশচন্দ্রের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ঈশ্বরের স্থান নেই কিন্তু শয়তানকেও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় মেনে নেননি। জগদীশ গুপ্ত ধর্মীয় সংস্কারকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিয়তির প্রতি আস্থাও এক ধরনের অন্ধ সংস্কার।

জগদীশ গুপ্ত মূল ধারার থেকে একেবারে আলাদা, তিনি অন্য কারুর মতন নন, সেই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাহিত্যের উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি, তবু অভিনবত্বের জন্যই তিনি স্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্রের সমালোচকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একজন। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত দায়সারা প্রশংসাপত্রে। পয়োধি দই কিংবা দিশি কোম্পানির তৈরি ফাউন্টেন পেনের কালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেরকম সার্টিফিকেট দিতেন, কিছু কিছু তরুণদের রচনা সম্পর্কেও সেরকম সার্টিফিকেট দেওয়ার অভ্যেস ছিল তাঁর। এ ছাড়া হয়তো তাঁর উপায়ও ছিল না। কত বই তিনি পড়বেন ? কিন্তু জগদীশচন্দ্রের উপন্যাস *লঘু-গুরু* পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন, সেটি সত্যিই বিস্ময়কর। যে উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ নেই, সে বইটি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি সময় ব্যয় করেছেন। জগদীশচন্দ্র অবশ্য এ সমালোচনা একেবারেই পছন্দ করেননি, এর একটি উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতন অসম্মান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথের এ 'জজিয়তি বিপথগামী' এবং এর মধ্যে 'অভদ্র হুল' ফোটানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ওই সমালোচনাটি আমি আগে পড়িনি। সম্প্রতি পাঠ করে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ এমন বিশুদ্ধ সমালোচনা খুব কমই লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না। এই উপন্যাসের লেখককে একটুও নিন্দে করেননি রবীন্দ্রনাথ, কাহিনি ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তন্নতন্নভাবে। এক বাজারের বেশ্যা কিংবা কয়েকটি ব্যভিচারী ব্যক্তির কাহিনি বা বিষয়বস্তুকেও আক্রমণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, বরং বলেছেন, হ্যাঁ, এইসব নিয়েও সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল আপত্তি বাস্তবতা সৃষ্টির

নামে অবাস্তবতা নিয়ে বাড়াবাড়ি। লঘু-গুরু উপন্যাসের চরিত্রটি একেবারেই অবাস্তব। প্রথমে মনে হয়েছিল উত্তম নামের গণিকাটি এক সাধারণ দেহোপজীবিনী, পরে জানা গেল, সে শুধু রূপসীই নয়, সে যথেষ্ট লেখাপড়া জানে, উপন্যাস পড়ে, প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারিণী, উচ্চ রুচি, রন্ধন পটীয়সী, আরও গুণের শেষ নেই। এমন একটি রমণী কেন গ্রামের গঞ্জের বেশ্যা হয়, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, এ চরিত্র একেবারেই বাস্তবতার ধার ধারে না। এই উপন্যাসটি উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রিয়েলিজ্‌ম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা আজও প্রণিধানযোগ্য। দুটি মন্তব্য উদ্ধার করছি :

> রিয়েলিজ্‌মের নাম দিয়ে একালের শৌখিন আধুনিকতাকে খুশি করা সহজ। যেটা সহজ, সেটাই তো আর্টের বিপদ ঘটায়। দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্রয় দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ, এইজন্যই দেশাভিমানী কাব্যে, গল্পে আর্ট জিনিসটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে।

অনেক লেখায় মাটির গন্ধ খুঁজে আমরা উল্লসিত হই, সে সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মন্তব্য,

> বঙ্গবিভাগের সময় দেশি চিনির চাহিদা বেড়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে, বিদেশি চিনিতে মাটি মিশিয়ে দেশি করা সহজ। আগুন জ্বালিয়ে রসে পাক দেওয়া অনাবশ্যক, কেন-না রসিকেরা মাটির রং দেখলেই অভিভূত হবে। সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়েলিজ্‌মের রং ধরবে, এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি।

জগদীশ গুপ্ত বিস্মৃত বা বিলুপ্ত লেখক নন, তাঁর বইগুলিও দুষ্প্রাপ্য নয়। তবে তিনি কোনোকালেই সাধারণ পাঠকদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, ইদানিং তিনি সমালোচক ও গবেষকদের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ। তবে যেসব উৎসাহী পাঠক বাংলা সাহিত্যের সবরকম রসের স্বাদ নিতে চান, তাঁরা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে অবশ্যই পাঠ্যতালিকায় স্থান দেবেন। আমি নতুন করে তাঁর বইগুলি পড়ে দেখলাম, তাঁর স্টাইল একালেও পাঠযোগ্যতা হারায়নি। নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় জগদীশ গুপ্তের রচনাবলিতে বহু তথ্য সংযুক্ত হয়েছে, যা গবেষকদের কাজে লাগতে পারে, কিন্তু রচনাবলির সব লেখাগুলি পড়ার ধৈর্য পাঠকদের থাকবে কি না সন্দেহ। উপন্যাসগুলি না পড়লেও চলে। বছর পনেরো আগে সুবীর রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্তর গল্পের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, যাতে লেখক সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ও যুক্ত হয়েছিল। এমন সুনির্বাচিত ও সুসম্পাদিত গ্রন্থ বাংলায় বিশেষ তো চোখে পড়ে না।

২

আমি জগদীশ গুপ্তকে কখনও চোখে দেখিনি। তিনি বেঁচেছিলেন একাত্তর বছর, মৃত্যু হয়

উনিশশো সাতান্ন সালে। সেইসময়ে আমরা *কৃত্তিবাস* পত্রিকা প্রকাশ করছি, সেই পত্রিকাকে ঘিরে একটা বেশ বড়ো অতিতরুণ লেখক গোষ্ঠী জড়ো হয়েছিল। আমরা বাংলা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সব লেখাই তন্নতন্ন করে পড়তাম, অতিবিজ্ঞাপিত লেখকদের চেয়ে অল্পজ্ঞাত লেখকদের প্রতিই ছিল বেশি আকর্ষণ। কিন্তু সে সময়ে আমরা জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলাম না। তিনি বেঁচে আছেন কি না জানতাম না। তাঁর একটি-দুটি উপন্যাস ও কিছু গল্প পড়া ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনীর উপাদান এতই কম জানা ছিল যে মনে হত, তিনি বুঝি কল্লোলেরও আগেকার লেখক, এবং কিছু কিছু সমালোচকের মত অনুযায়ী বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি। সেই সময়ে জগদীশ গুপ্তর বইগুলিও সুলভ ছিল না, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় তাঁর কলমও স্তব্ধ হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুও হয় অনেকেরই অগোচরে। তিনি বামপন্থীদের দলে যাননি, বড়ো পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হননি, তাই তাঁকে নিয়ে বিশেষ কেউ উৎসাহ দেখায়নি। প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রকাশক-পাঠকদের ঔদাসীন্য কিন্তু শেষপর্যন্ত মুছে দিতে পারেনি তাঁর নাম, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন পাতা হয়ে গেছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, জগদীশচন্দ্র যখন অস্তমিত, সেই সময়ে বাংলা গদ্যলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম সতীনাথ ভাদুড়ী। *জাগরী* এবং *ঢোঁড়াই চরিতমানস* প্রকাশের পর প্রমাণিত হয়ে গেছে, ইনি একজন বিরল প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক। আমি ছিলাম তাঁর অতি ভক্ত পাঠক, তাঁর প্রতিটি লেখা পড়েছি বারবার। মনে আছে, *জাগরী* উপন্যাস পড়ার সময়ে এক দুপুরে আমি এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম যে আমার মা ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিলেন রান্নাঘর থেকে। অশ্রুবর্ষণ কিংবা চক্ষু সজল হওয়া সাহিত্য-শিল্প বিচারে মাপকাঠি হতে পারে না তা জানি। কিন্তু যারা অন্য সময়ে, অন্য অনেক বিচ্ছেদে-বিপদে কাঁদতে পারে না, বই পড়ে কান্নাকাটি করাটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। *জাগরী* উপন্যাসে বিলু-নীলু মা-বাবার ভুল বোঝাবুঝির জন্যই আমি কেঁদেছিলাম। পৃথিবীর বড়ো বড়ো ট্র্যাজেডিগুলো যুদ্ধবিগ্রহ বা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের জন্যই ঘটে না, আসল ট্র্যাজেডি মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝিতে।

আমরা সেইসময়ে *কৃত্তিবাস* নামে পৃথক একটি গল্পের পত্রিকারও পরিকল্পনা করেছিলাম, প্রথম সংখ্যায় চেয়েছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদারের গল্প। কমলকুমার গল্প দিয়েছিলেন, সতীনাথ ভাদুড়ী গল্প পাঠাননি, আমার চিঠিরও উত্তর দেননি। তখন ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই চিঠিতে ঠিকানা ভুল ছিল, নইলে আমাদের মতন ভক্তের ডাকে তিনি সাড়া দেবেন না কেন? অনেক পরে অবশ্য জেনেছি, ঠিকানা ভুল ছিল না, আমি পূর্ণিয়ায় গিয়ে ভাট্টাবাজারে খুঁজে বার করেছিলাম তাঁর বাড়ি। ততদিনে তিনি মৃত এবং তাঁর সাধের বাগান জঙ্গলাকীর্ণ। সেই বাগান ছিল তাঁর অসম্ভব ভালোবাসার, বাগানটি বিষয়ে তাঁর ডায়ারিতে অনেক কথা পড়েছি, কালিদাসের কাব্য মিলিয়ে মিলিয়ে সহকার বৃক্ষের অর্থাৎ আমগাছের

সঙ্গে তিনি মাধবীলতার বিবাহ দিয়েছিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর সেই অতি যত্নের বাগান এবং তাঁর রচনাবলি দুই-ই ধূলিধূসরিত হয়ে পড়ে।

প্রথম উপন্যাসের বিস্ময়কর সাফল্য যেমন একজন লেখককে অনেকখানি সাহায্য করে, আবার কিছুটা ক্ষতিও করে। সতীনাথ ভাদুড়ী সারা জীবন *জাগরী* উপন্যাসের জন্যই চিহ্নিত হয়ে রইলেন। যদিও *জাগরী*-র তুলনায় *ঢোঁড়াই চরিতমানস* অনেক উচ্চাঙ্গের উপন্যাস, বিশ্ব সাহিত্যে এরকম নতুন আঙ্গিকের ও গভীর জীবনবোধের উপন্যাস বিরল, কিন্তু হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় লেখা এ উপন্যাস বাঙালি পাঠকের সমাদর পায়নি। এই উপন্যাসের একটি তৃতীয় খণ্ড রচনা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, পরে তা থেকে নিরত হয়েছেন, এবং নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন, যদি বইটি বিক্রি হত, তাহলে কি তিনি আরও খণ্ডে খণ্ডে উত্তরোত্তর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* লিখতেন না?

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য রচনার কাল মোটামুটি উনিশ বছর, জাগরী যখন ছাপা হয়, তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ, তাঁর মৃত্যু হয় উনষাট বছর বয়েসে। *জাগরী* লেখার আগে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কতটুক? অনেকেই কবিতা দিয়ে শুরু করে। সতীনাথ সেরকমভাবে কবিতা লেখেননি, দু-চারটি কবিতা কখনও বানিয়েছেন খেলাচ্ছলে, কিছু স্যাটায়ারধর্মী লেখা লিখেছিলেন পত্রপত্রিকায়। যৌবনের অনেকগুলি বছর মগ্ন হয়েছিলেন রাজনীতিতে, জেল খেটেছেন বেশ কয়েকবার, তার মধ্যে সাহিত্যসাধনার সময় ছিল না। কিন্তু জীবিকা-অর্জন কিংবা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না, তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করার চিন্তা করে রেখেছিলেন অনেক আগেই। তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কথা কারুকে জানতে দেননি। জেলখানাতে বসে তিনি তাঁর শিষ্যপ্রতিম, প্রখ্যাত হিন্দি লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবার লিখতে শুরু করো, আর দেরি কোরো না, অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সঞ্চিত হয়েছে, এ যেন তাঁর নিজের প্রতিও স্বগতোক্তি। তিনি নিজেও জেলখানায় বসেই প্রথম মনপ্রাণ ঢেলে লিখতে শুরু করেন। দেশ স্বাধীন হবার অল্প কিছুদিন পরেই সংস্রব ত্যাগ করেন রাজনৈতিক দলের। যেন তিনি বলতে চেয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, দেশ শাসন করা অন্যদের কাজ। ফণীশ্বরনাথ রেণুর মুখে শুনেছি, সতীনাথ ভাদুড়ীকে বিহারের মন্ত্রী করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী মন্ত্রী হয়ে গেলে বাংলা সাহিত্যের যে কী অপরিমেয় ক্ষতি হত, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে, রাজনীতি থেকে সরে আসার অব্যবহিত পূর্ব সময় থেকে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন করবেন বলে যিনি ঠিক করেছিলেন, তিনি কিন্তু খুব বেশি লেখেননি, তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো, এর মধ্যে সাতখানি উপন্যাস, একটি ভ্রমণকাহিনি, একটি নাটক, বাকিগুলি গল্প। মোট যাটটি গল্প লিখেছিলেন তিনি, কখনও কোনো পত্রিকার তাগিদে কিংবা সম্পাদকদের অনুরোধে লিখতেন না, লিখতেন শুধু নিজের ইচ্ছে হলে।

আমাদের *কৃত্তিবাস*-এর জন্য সেইজন্যই তিনি লেখা পাঠাননি, বুঝতে পারি। তা ছাড়া, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক ছিলেন না তিনি, বরাবর থেকেছেন পূর্ণিয়াতে, হয়তো কলকাতা থেকে প্রকাশিত লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলির খবরও রাখতেন না। অবশ্য সাহিত্যকে জীবিকা করেননি তিনি, করার প্রয়োজনও ছিল না, তবু তার লেখা অনেকে পড়বে এটা নিশ্চয়ই চাইতেন, তাই বহুলপ্রচারিত পত্রপত্রিকাতেই লেখা দিতেন। প্রথম দিকের দুটি উপন্যাস ছাড়া তাঁর অন্য সব উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে *দেশ* পত্রিকায়, এবং অনেকগুলি গল্প।

তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিকে ঠিক ছোটোগল্প বলা যায় না। প্রত্যেকটিই বেশ বড়ো আকারের গল্প, কোনো-কোনোটিকে আজকালকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'উপন্যাসোপম বড়োগল্প'ও বলা যেতে পারে। ছোটোগল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাস করার রীতি আছে আমাদের দেশে, আর সতীনাথ যেন উপন্যাসের নির্যাস নিয়ে এক-একটি গল্প লিখেছেন। তাঁর 'বন্যা' নামের গল্পটি অনায়াসে একটি উপন্যাস হতে পারত। বনফুল *কিছুক্ষণ* নামে এই ধাঁচেরই উপন্যাস লিখেছেন। সতীনাথের ওপর বনফুলের কিছুটা প্রভাব পড়া বিচিত্র কিছু নয়, কারণ বিহারের তৎকালীন দুজন খ্যাতিমান বাঙালি লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুলের কাছে লাজুক সতীনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। গ্রন্থাবলিতে মুদ্রণের ক্রম অনুসারে তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'গণনায়ক'। এই গল্পটি আকারে যথেষ্ট বড়ো তো বটেই, চরিত্রের সংখ্যাও এত বেশি যে ছোটোগল্পের আয়তনে যেন ধরে না। চরিত্রগুলো সব ভালোভাবে ফোটেওনি, 'গণনায়ক' বিখ্যাত হয়েছিল তার বিষয়গুণে।

দেশের স্বাধীনতা লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আত্মত্যাগ, কারাবরণ, পুলিশের হাতে অত্যাচার ও ফাঁসির দড়িতে জীবনদানের অনেক গৌরবময় কাহিনি আগে লেখা হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা পাবার সম্ভাবনার মুহূর্ত থেকেই, ব্রিটিশ শাসন যখন আলগা হয়ে যায়, তখনই যে একশ্রেণির নেতাদের মধ্যে স্বার্থ, লোভ ও মুনাফাবাজির খেলা শুরু হয়ে যায়, সে-কথা সতীনাথই প্রথম লিখলেন। বিহার-বাংলার সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চল উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের দু-তিন দিন আগে ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে, তা নিয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা ছিল, দু-একবার উলটো ঘোষণা হয়েছিল। সেই সুযোগে এক স্থানীয় নেতা বিপন্ন মানুষদের জিনিসপত্র কিনে নিতে লাগলেন জলের দামে, শুরু করলেন চিনির চোরা কারবার, এমনকি হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে ব্যাবসা করতেও দ্বিধা করলেন না। শুরু হয়ে গেল স্বাধীন ভারতের নৈতিক অবনতির ইতিহাস।

'বন্যা' গল্পটি বেশ সরল। কাছাকাছি গ্রামের ব্রাহ্মণ, ভুঁইহার, সাঁওতাল ও মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি, ছুঁতমার্গ ও কোন্দল লেগেই থাকে। বন্যায় যখন গ্রামগুলি ডুবতে লাগল তখন সবাই এক উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিল। দেখা গেল তখন সব বিভেদ ঘুচে যাচ্ছে,

আপৎকালীন আত্মীয়স্বজনের মতন প্রত্যেকেই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তারপর বন্যার জল যখন কমে যেতে লাগল, জেগে উঠল নোংরা, পচা-গলা সব জিনিস, ক্লেদ, আর তখনই মানুষগুলোর মধ্যেও পুরনো হিংসে, স্বার্থপরতা, নীচতা ফিরে এল। এটাকে বলা যেতে পারে একটা আঞ্চলিক জীবনের খণ্ডচিত্র, ছোটোগল্পের দীপ্তি এর মধ্যে নেই।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম দিকের গল্পগুলির কাহিনির মতন ভাষাও সরল, যেন অতিমাত্রায় সরল। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় রয়েছে ঝকঝকে আধুনিকতা, সোফিস্টিকেশান, তারাশঙ্করের ভাষার মধ্যে আছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য। এমনকি জগদীশ গুপ্তর গল্পগুলি চাঁছাছোলা ধরনের হলেও কোথাও কোথাও ঝংকারবহুল, যেমন 'চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর মনে হইল, বায়ুমণ্ডল যেন লতার তাড়সে চিড় খাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাড়ির অন্ধকার যেন ঠিক অন্ধকার নয়, বিশাল পক্ষ একটা পক্ষী বাড়ির এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাকিয়া ও অগণ্য আনাগোনার একটি ষড়যন্ত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে— সে যেন উঠি উঠি করিতেছে; সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগ্নস্তূপ ক্রিমির মতন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।...' (তৃষিত আত্মা)

এই তুলনায় সতীনাথের গদ্য, 'তিয়রের বাড়ির মেয়েরা অন্য ভদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য উঠোনে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছেন। আঙিনার আর এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে।' (বন্যা)

এই বর্ণনায় একটা ছবি ফুটছে বটে, কিন্তু গদ্য যেন এলানো। প্রতিটি বাক্যের শেষে প্রায় একই রকম ক্রিয়াপদ, বাংলা গদ্যের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সতীনাথ পড়াশোনা করে লেখক, দেশবিদেশের সাহিত্য বিষয়ে কৃতবিদ্য, তিনি প্রতিটি লাইন ভেবেচিন্তে লিখবেন, এটাই স্বাভাবিক। সারল্যও একটা স্টাইল। পড়ার সময় চতুর শব্দ ব্যবহারে হোঁচট খেতে হবে না, লেখকের স্টাইল একেবারে বোঝা যাবে না, এমন সারল্য আনা আসলে খুব শক্ত। সতীনাথ সম্ভবত সেই দিকেই এসেছিলেন, তাঁর পরের দিকের গদ্যে আছে স্বচ্ছ নির্মলতা, যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে।

প্রথম দিকের গল্পগুলিতে সতীনাথের ঝোঁক ছিল কাহিনির নতুনত্বের দিকে। কখনও লিখছেন অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের কথা, কখনও কাহিনি চলে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ইনকাদের পতনের ইতিহাসে, কখনও আধুনিক লন্ডনে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি, এই লেখকের মানসিকতায় ক্রোধ, তিক্ততা, নৈরাশ্যের কোনো স্থান নেই, জীবন যেমনভাবে বয়ে চলেছে, তাকে তিনি অবিকল সেইভাবে দেখাতে চান, তার মধ্যে খুব চাপাভাবে মিশে থাকে তাঁর মৃদু শ্লেষ এবং কৌতুক। তাঁর এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প মনে হয়, 'আন্টা বাংলা'।

নীলকর সাহেবদের প্ল্যান্টার্স ক্লাব সাধারণ লোকের মুখে মুখে হয়ে যায় আন্টা বাংলা। নীলকর সাহেবদের তখন এমনই প্রতাপ যে সরকারি সাহেবদেরও তারা গ্রাহ্য করত না। নেটিভদের প্রবেশাধিকার ছিল না সেই ক্লাবের ত্রিসীমানায়। কুলিকামিনদের দিয়ে অবশ্য কাজ করাতে হত। ক্লাবের সেক্রেটারি বেঞ্জামিনের প্রখর মেজাজ। এক রবিবার বেঞ্জামিন ক্লাবের বাররুমটি নতুন করে তৈরি করাবে, কিন্তু বিরসা ওঁরাও নামে মজুরটি ঠিকসময় এসে পৌঁছয়নি। বিরসা এক নগণ্য ভূমিদাস। তাকে খেত থেকে ধরে আনা হল, তাকে এক পাদরি বলেছিল, রবিবারে কাজ করতে নেই। এই অপরাধে বেঞ্জামিন তাকে প্রথমে একটা কাঁটা ভরা লতা দিয়ে চাবকাল, তারপর রক্তাক্ত বিরসাকে প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার মাথায় ইট চাপিয়ে দিতে বলল তারই পুত্রবধূকে। পুত্রবধূ মোট ছখানা ইট দিয়েছিল, সাহেব হুমকি দিয়ে আরও দুখানা ইট চাপাল। মাথায় আটখানা ইট নিয়ে বিরসা দাঁড়িয়ে রইল সূর্যের দিকে মুখ করে। কোনো প্রতিবাদ নেই। শাস্তি দেওয়া যেন সাহেবদের জন্মজন্মান্তরের অধিকার। সাহেবরা চাবুক মারবে, লাথি মারবে, তাদের মেয়েদের ইচ্ছেমতন ভোগ করবে, কখনও দয়া দেখিয়ে এক টুকরো পাউরুটি ছুড়ে দেবে, এরকমই তো চলে আসছে। এমনকি কোনো একসময়ে তার পুত্রবধূ যখন চুপি চুপি এসে মাথা থেকে কয়েকখানা ইট কমিয়ে দেবার কথা বলে, তাতেও রাজি হয় না বিরসা।

একসময়ে সেই ইটসুদ্ধু মাটিতে পড়ে গেল বিরসা, তার আর জ্ঞান ফেরেনি। এই এলেবেলে লোকটা যেহেতু ছিল ক্রিশ্চিয়ান, তাই এক সহৃদয় বুড়ি মেম তার কবরের ওপর ফলক বাঁধাবার খরচ দেয়। বিরসার নাতির হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয় মিষ্টি খাবার জন্য। তাতেই পুত্রবধূ ও নাতি অভিভূত।

বিরসার নাতির নাম বোটরা। তার বাবা নিরুদ্দেশ, ঠাকুরদাকে সে খুব ভালোবাসত। সেই ঠাকুরদাকে সে হারাল। মা ক্রমে এক সাহেবের রক্ষিতা হয়ে গেল, বোটরা নিজে টেনিস বল কুড়োবার চাকরি পেল। বোটরার মনে কোনো কিছুই রেখাপাত করে না, বেঁচে থাকাটাই তো বড়ো কথা। মূলগল্পটি এই বোটরারই জীবনকাহিনি। সে ক্রমশ বড়ো হয়, আন্টা বাংলাও বদলাতে থাকে। কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীলকর সাহেবরা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে শুরু করে। ক্লাবটা চলে টিমটিম করে, তবু বোটরা সেখানেই থেকে যায়। অন্য কোথাও চাকরির ডাক পেলেও সে যায় না। সে দিনরাত মদ খায় আর বাররুমটায় শুয়ে থাকে, অন্য কিছু মনে না থাকলে, সে প্রতিবছর ঠাকুরদার মৃত্যুদিনটায় ঠাকুরদার কবরে ফুল দিতে যায়। বিরসাকে আর সবাই ভুলে গেলেও তার এই মাতাল নাতিটা ঠিক মনে রেখেছে। বোটরা মাঝে মাঝে লক্ষ করে, এখনকার মজুররা মাথায় ছখানা করে ইট নিয়ে যায়, আটখানা নয়। ক্লাবটির আরও অধঃপতন হতে হতে উঠেই যায় একসময়, সে বাড়িটাকেও ভেঙে ইট-কাঠগুলো বিক্রির প্রস্তাব ওঠে। বোটরা এর মধ্যে গাড়ি চালানো শিখে নিয়েছে, ড্রাইভারের চাকরি পেয়েছে, কিন্তু ওই জায়গাটা

ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। অথচ এবার তাকে যেতেই হবে। শেষবারের মতন ঠাকুরদার কবরে ফুল দিয়ে আসে বোটরা, তারপর গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট করে সে ওই ভূতপূর্ব আন্টা বাংলার সামনেই মারা যায়। সামনের নতুন তৈরি রাস্তাটার গোটা আষ্টেক ইট খসে গেছে তার গাড়ির ধাক্কায়।

অত্যন্ত শান্ত, ধীরভাবে এগিয়েছে গল্পটি। অসম্ভব সংযমের পরিচয় দেখিয়েছেন লেখক, কোথাও আবেগ-উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নেই। এই গল্পের গঠনে যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন সতীনাথ, তার তুলনা পাওয়া ভার।

এই 'আন্টা বাংলা' গল্পটির একটি বিচিত্র সমালোচনা লিখেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি এক শ্রেণির সমালোচকদের মুখপাত্র বলা যায়। নীরেন্দ্রনাথ রায় সতীনাথের প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়েও 'আন্টা বাংলা' গল্পটি পড়ে 'শঙ্কিত' বোধ করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই ধরনের গল্প লিখলে সতীনাথের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে। 'গণনায়ক' গল্পে কিছু-কিছু কংগ্রেসির এবং গান্ধীটুপি পরিহিত নেতাদের স্বরূপ ফুটেছে বলে তিনি খুশি কিন্তু 'আন্টা বাংলা' গল্পটি তাঁর পছন্দ হয়নি। কারণ, সতীনাথ অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জনগণের কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের আভাস দেখাননি। তাঁর মতে, 'দুর্বার শ্রেণীসংগ্রাম, নিষ্করুণ আততায়িত্ব, শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান, কেবল যাহারই পরিণামে রচিত হইতে পারে শ্রেণীহীন সমাজ ও শান্তিময় পৃথিবী', এইসবও এই গল্পে দেখানো অপরিহার্য ছিল।

একজন লেখকের গল্পে দুর্বার শ্রেণিসংগ্রাম কিংবা বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের কথা লিখলেই কি ওইসব ব্যাপারগুলি সংঘটিত হত? সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও গল্পটি যে একেবারে নষ্ট হত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধরনের সমালোচকদের পরামর্শে বাংলার রাশি রাশি গল্প-উপন্যাস নিছক অপাঠ্য-অসার রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। সেসব গল্প-উপন্যাসের শেষ দিকে একদল দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষ কৃত্রিমভাবে উদ্দীপিত হয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, একবোরে শেষ পৃষ্ঠায় একটা লাল সূর্য উঠত। সেই সূর্য কতটা আশার বাণী শোনাতে পেরেছে তা জানি না, কিন্তু সাহিত্যকে আলোকিত করতে পারেনি। সাহিত্যিকদের রচনার বিশ্লেষণ করবেন সমালোচকরা, কিন্তু তাঁদের উপদেশ দেবার অধিকার যে সমালোচকদের নেই, তা অনেকে ভুলে যান।

'আন্টা বাংলা'র রচনারীতিই একে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই গল্পে এমনকি শ্লেষ গোপন করেছেন সতীনাথ। বীরসা, বোটরা, তার মায়ের ব্যর্থ জীবনের প্রতিটি ঘটনাই পাঠকদের বুক মুচড়ে দেয়, সমাজের এই দুঃখী মানুষগুলি, যাদের দুঃখ-বোধ পর্যন্ত নেই, তাদের জন্য নীরব হাহাকার যেন ছড়িয়ে আছে প্রতিটি লাইনে, এর জন্য লেখকের কোনো মন্তব্যেরও প্রয়োজন হয় না। এর চেয়ে বেশি প্রতিবাদ জানাতে গেলে তা মেঠো বক্তৃতা হয়ে যায়, সাহিত্য হয় না।

জাগরী ও *ঢোঁড়াই চরিতমানস* পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যেসব সমালোচকরা, তাঁরা সতীনাথের পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক কাহিনি ছেড়ে সতীনাথ যখন মানুষে মানুষে জটিল সম্পর্ক ও হৃদয় রহস্য নিয়ে লিখতে লাগলেন, যেমন *অচিন রাগিণী* কিংবা *সংকট*, তখনই অনেকে বিমুখ হলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের টুকিটাকি কিংবা প্রেম ভালোবাসার কাহিনি এককালে অনেক সমালোচকের কাছে বিষবৎ মনে হত। প্রেম বাদ দিলে যে সাহিত্যের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তা অনেকেই বুঝতে চান না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর পরবর্তীকালের গল্পগুলি আকারে ছোটো হতে থাকে এবং মৃদু শ্লেষের বদলে তীব্র, তির্যক ব্যঙ্গের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এককালে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে নিভৃতে, নিজের বাড়িতে বাগানের পরিচর্যা করতে করতেও রাজনীতি থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেননি। এককালের দেশসেবকদের দেশ-শোষকের ভূমিকা, সরকারি অফিসের অনাচার বিষয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছেন। 'চরণদাস এম এল এ', 'মা আম্র ফলেষু', 'পরকীয় সন-ইন-ল' ইত্যাদি এই জাতীয় গল্প। আবার কিছু কিছু গল্প বিশুদ্ধ কৌতুকরসের, যেমন 'পরিচিতা', 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ', 'পত্রলেখার বাবা' ইত্যাদি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, কৌতুকরসের গল্প লেখা বেশ কঠিন তো বটেই, সকলের হাতে খুলতেও চায় না, কিন্তু আমাদের সমালোচকরা এই ধরনের গল্পকে গুরুত্ব দেন না। তাঁরা সবসময় বক্তব্য খোঁজেন।

কোনো কোনো গল্প একবার পড়লেই সারাজীবনের মতন মনে দাগ কেটে যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্তত তিনটি গল্প আমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে আছে। 'চকাচকি' তাঁর রচনাবলির মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ দুবে আর তার ষাট বছরের স্ত্রী দুবেনীর প্রেমকাহিনি। পরস্পরের সঙ্গে মধুর খুনসুটি সবসময় লেগেই আছে। দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যেন কিশোর-কিশোরীর মতন। পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য। উত্তমপুরুষে লেখা এই গল্পে লেখক এঁদের সম্পর্কে মুগ্ধ ছিলেন, তবু একদিন জানতে পারলেন, এই প্রেমের মধ্যেও একটা পাপ-বোধ আছে, এরা বিবাহিত নয়, বহু বছর আগে দুবে তার স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে এই দুবেনীকে নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধে। অথচ কী নির্মল, নিষ্কলুষ দুই নারী পুরুষ, প্রেম এদের জীবনকে বিশুদ্ধ করেছে। তবু দুবে যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন দুবেনী তাকে ছেড়ে চলে যায়, এও প্রেমেরই এক দিক, কঠিন আত্মত্যাগ। মৃত্যুশয্যায় ছেলের হাতে জল পাবে না দুবে, তা কি হয়? দুবেনী তাই দূরে সরে যায়। ডেকে আনা হয় দুবের প্রথম পক্ষের ছেলেকে। কিন্তু কোথায় যাবে দুবেনী? ওরা যে অবিচ্ছেদ্য, দুবেকে যখন চিতায় তোলা হয়েছে, তখন শ্মশানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে অল্প শব্দ হয়। কোনো শেয়াল, না এক অশ্রু-কম্পিতা বৃদ্ধা?

দ্বিতীয় গল্পটি কোনো শারদীয় সংখ্যায় পড়েছিলাম 'স্বর্গ-নরকের দুয়ারে' এই নাম। এখন সেটি *সংকট* উপন্যাসের একটি অধ্যায়। *সংকট* বইখানি উপন্যাস না গল্পগ্রন্থ তা

নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। অশ্রুত বাণী দিয়েও অনেক কিছু বলা যায় কি না, এই গল্পে যেন তারই পরীক্ষা করা হয়েছে। মূল বিষয়টি যৌনতা, এক অপরিণতমস্তিষ্ক যুবকের যৌন জাগরণের, যার একদিকে মা ও অন্যদিকে ভ্রাতৃবধূ, কিন্তু কী অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে এই কঠিন বিষয়টিকে গল্পে এনেছেন সতীনাথ। স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে দোদুল্যমান কয়েকটি মুহূর্তে এই গল্পের পরিণতি।

তৃতীয় গল্পের নাম 'বৈয়াকরণ'। এখানেও যেন কত সামান্য একটা কথাকে কত মহৎ প্রশ্ন করে তোলা যায়, তার একটি দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে সতীনাথ গল্প রচনা করেছেন। কোনো লেখকের সঙ্গেই অন্য কোনো লেখকের তুলনা করা যায় না। যে-যার নিজস্ব ধরনে বিশিষ্ট। তবু এক-একটি লেখা পড়লে মনে হয়, এমনটি বাংলা ভাষায় অন্য কোনো লেখকের হাতে আসা যেন সম্ভব ছিল না। 'বৈয়াকরণ' সেরকম একটি গল্প। একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের শালা ও তার স্ত্রী এসেছিল বেড়াতে। স্টোভ জ্বালাবার সময় অসাবধানে সেই যুবতী বধূটির শাড়িতে আগুন ধরে যায়। আগুনের দাহে তার সর্বাঙ্গ বীভৎস হয়ে গেল, শুধু মুখে কোনো আঁচ লাগেনি। প্রাণপণ চিকিৎসায় তাকে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু বধূটির নিজেরই আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। একজন সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, তোমার সবটা তো পোড়েনি, এখনও মুখখানা কত সুন্দর আছে। তা সে শুনতে চাইল না। শেষনিশ্বাস ফেলার আগে হৃদয় নিঙড়ে সে বলে গেল, 'ওরা কি ওই চায়...'।

আগুনে পোড়ার ঘটনাটি আছে অতি সংক্ষেপে, কয়েক লাইনে, মৃত্যুপথযাত্রিণীর ওই শেষ কথাটাই মূল গল্প। কী বলতে চেয়েছিল মেয়েটি? পণ্ডিত ধাঁধায় পড়ে যান। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার সময় ওই কথাটাই তাঁর মাথায় ঘোরে। ওরা মানে কারা, তারা কী চায়? স্বামী সম্পর্কে হয়তো ক্ষোভ ছিল নারীটির, কিন্তু বহু বছর ব্যবহার করল কেন? সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘেঁটেও এর উত্তর পাওয়া যায় না। হঠাৎ একদিন ক্লাসরুমে একটি ছাত্রীকে পড়াতে পড়াতে পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, এই 'ওরা' শব্দের মধ্যে তিনি নিজেও পড়ে যাচ্ছেন।

এইসব গল্প বারবার পড়লেও আশ মেটে না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাঁর *জাগরী* ছাড়া অন্যান্য বইগুলি দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। *জাগরী*-র কৃতিত্বে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাঁর আর সব রচনা। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থগুলিতে, বিশেষত ছোটোগল্প-বিষয়ক রচনায় সতীনাথ ভাদুড়ীর উল্লেখ নিতান্ত দায়সারা গোছের। *জাগরী*-র জন্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত কিংবা গোপাল হালদারের মতন সমালোচক পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ছোটোগল্পের তেমন আলোচনা পাওয়া যায়নি। সতীনাথের বইগুলিও দুর্লভ হয়ে পড়ায় সনাতন পাঠক নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকার কলামনিস্ট কয়েকবার সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করে এবং তাঁর সমস্ত রচনা পুনঃপ্রকাশের দাবি জানান। উক্ত সনাতন পাঠকের পরিচিত এক

প্রকাশক তাতে আগ্রহী হয়ে, অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনাবলি সযত্নে প্রকাশ করেন চার খণ্ডে। সম্পাদনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে এই সম্পাদকদ্বয় সতীনাথ সম্পর্কে বহু তথ্য, গ্রন্থ সমালোচনা, অন্যদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেছেন। উপরন্তু পাওয়া গেছে সতীনাথের মূল্যবান ডায়ারি, তাঁর অপ্রকাশিত অনেক রচনার খসড়া।

চার খণ্ডের এই সমগ্র রচনাবলি পাঠকরা গ্রহণ করেছেন। একাধিক সংস্করণ হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয়, সমালোচকরা ঔদাসীন্য দেখালেও একালের পাঠকদের সমাদর পেয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালের লেখকদের জন্যও সতীনাথ অবশ্যপাঠ্য।

৩

কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ধাঁধা। এরকম কোনো লেখক হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, অথচ সত্যিই কমলকুমার মজুমদার নামে একজন লেখক বেশ কয়েক বছর বাংলা সাহিত্যে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করে গেছেন। সাহিত্য নিয়ে তিনি কি ছেলেখেলা করতে চেয়েছিলেন, না সাহিত্য তাঁর অস্থিমজ্জায় মিশে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। আমি তাঁকে প্রায় কৈশোর বয়েস থেকে দেখেছি, বহু বছর তাঁর সঙ্গলাভ করে করেছি, তবু মানুষটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁর রচনাগুলির মতনই রচয়িতাটিও দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। যদিও আপাতত তিনি ছিলেন হাস্যময়, রসিকতামুখর, বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মিশে থাকত আদিরসাত্মক বাক্য। একটা কথা আছে যে, প্রকৃত বিদগ্ধ তাঁকেই বলে যাঁর মস্তিষ্কটি হবে অ্যারিস্টট্‌লের মতন আর মুখের ভাষা হবে চাষার মতন। কলেজ স্ট্রিট এবং ওয়েলিংটন অঞ্চলে বহু দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে, কখনও পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি কখনও ফৈয়াজ খাঁর গান, কখনও গ্রাম্য শিল্পীদের ডোকরার কাজ, কখনও মার্সেল প্রুস্তের রচনা, কখনও দুবরাজপুরের ডাকাতদের চরিত্র, কখনও রামপ্রসাদী গানের ভাষা ব্যবহার, কখনও উইলিয়াম ব্লেকের কাব্য, কখনও সোনাগাছির গণিকাদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া, কখনও যামিনী রায়ের ছবি ইত্যাদি বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ে কথা বলতেন। তখন আমাদের মনে হত, আমাদের কাছে তিনি যেন অ্যারিস্টট্‌লের মতনই এক চলন্ত শিক্ষক এবং তাঁর মুখের ভাষা অতি জীবন্ত, অর্থাৎ যাকে বলে কাঁচা বাংলা। অথচ তিনিই যখন নিজের লিখিত রচনার কয়েক পাতা শোনাতেন, সে ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যেত।

মানুষটির মধ্যে বৈপরীত্য ছিল অনেক। আমাদের সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ছিলেন নাট্য পরিচালক। চমকপ্রদ ছিল তাঁর নির্দেশনা। আমরা অবশ্য নাট্য-অভিনয় নিয়ে বেশিদিন মেতে থাকিনি, কিন্তু কমলকুমার পরবর্তীকালেও নাট্য প্রযোজনায় অনেক নতুন পরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব প্রমাণিত হলেও কখনোই শখের

প্রযোজনার বাইরে গেলেন না, বড়ো রকমের কোনো উদ্যোগ কিছুতেই নিলেন না। বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে কমলকুমারের নাম লেখা থাকবে কি না জানি না। একসময় আমরা তাঁকে সবর্ক্ষণ কাঠখোদাই করতে দেখেছি। জলরঙের ছোটো ছোটো ছবিও এঁকেছেন, চাইনিজ ইংকে বহু স্কেচ করেছেন। এটাও মনে হয়েছিল তাঁর শখ, কিন্তু পরে জানা গেল, শিল্পী হিসেবে অসাধারণত্বের লক্ষণ ছিল তাঁর মধ্যে। মন দিয়ে শুধু ছবি আঁকলে শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হতে পারতেন। আমি নিজে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষের মুখে এমন কথা শুনেছি। কিন্তু কমলকুমার ছবি আঁকায় তেমন মন দিলেন না।

তবে কি সাহিত্যের জন্যই নিবেদিত ছিল তাঁর মন-প্রাণ? সেখানেও তো হেলাফেলার ভাব। দু-একটি উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে যখন কমলকুমার আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, আমাদের মনে হয়েছে এমন বর্ণাঢ্য, এমন উচ্চস্তরের রস, সম্পূর্ণ নতুন বাক্‌বিভূতিসম্পন্ন রচনা আমাদের অভিজ্ঞতায় আর নেই, তখনই কমলকুমার যেন ইচ্ছে করে তাঁর পাঠকদের দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। পুরস্কার কিংবা অর্থাগম সম্পর্কে নির্লোভ এবং মোহমুক্ত থাকতে পারেন কোনো কোনো লেখক, কিন্তু এমন লেখক কি সম্ভব, যিনি পাঠক চান না?

কলকাতার একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে কমলকুমার মজুমদার সুপরিচিত ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কাছে ফরাসি ভাষা শিখেছেন, বিজ্ঞাপন জগতের কেউকেটারা ছিলেন তাঁর আড্ডার সঙ্গী, কিন্তু তাঁরা অনেকেই কমলকুমারের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বোধহয়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে পছন্দ করতেন, কিন্তু তাঁর রচনার স্বাদ পাননি। সিগনেট প্রেস ছিল একসময়ে কলকাতার সবচেয়ে রুচিসম্পন্ন এবং জমজমাট প্রকাশক। প্রবীণদের সঙ্গে সঙ্গে নবীনদের গ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করতেন। সেই সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কমলকুমারের হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু দিলীপকুমার গুপ্ত নিশ্চিত কমলকুমারের লেখক-পরিচিতি জানতেন না, জানলে অবশ্যই তিনি কমলকুমারের কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করতেন। আমাদের ঠিক আগের প্রজন্মের লেখকেরা, যাঁরা কমলকুমারের মোটামুটি সমবয়েসি, তাঁরা কেউ কমলকুমারকে লেখক হিসেবে গণ্য করেননি। এ এক বিচিত্র ব্যাপার, বাংলাভাষার একজন প্রধান লেখককে তাঁর সমসাময়িক লেখকরা চিনতেই পারলেন না!

কয়েকটি উদাহরণ দিই। বাংলা ছোটোগল্পের দিকপাল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন আমার অতি প্রিয় লেখক। একটি ছোটো পত্রিকা অফিসে একসময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সহকর্মী ছিলাম আমি। আমার খুব সাধ হয়েছিল, আমার দুই প্রিয় লেখককে এক জায়গায় মেলাই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তখনও পর্যন্ত কমলকুমার সম্পর্কে জানতেন না কিছুই। প্রস্তুতির জন্য আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে *এক্ষণ* পত্রিকার একটি কপি দিলাম, যাতে কমলকুমারের 'গোলাপ সুন্দরী' নামে অসাধারণ গল্পটি ছাপা হয়েছিল। কয়েকদিন পর তিনি বললেন

যে পত্রিকাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। দিলাম আর-একটি কপি। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, পত্রিকাটি তিনি বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে ফেলে গেছেন। নাছোড়বান্দা আমি, জোগাড় করলাম *এক্ষণ* পত্রিকার আর-একটি সংখ্যা। এবার আমি কিছু জানতে চাইবার আগেই তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি,পড়েছি। বেশ ভালো লেগেছে। বুঝলাম তিনি পড়েননি কিংবা পড়তে পারেননি। তাঁর কিছু অসুবিধে হয়েছে। 'গোলাপ সুন্দরী' যে সম্পূর্ণ পড়েছে, তার পক্ষে এরকম হালকা মন্তব্য করা সম্ভব নয়। এর পরে একদিন ওই দুজনের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুজনেই অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীতভাবে কিছু অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, ভাব জমেনি একেবারেই।

সন্তোষকুমার ঘোষ, যিনি ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষার যাবতীয় রচনা পড়তেন, তিনি একদিন বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কমলের লেখা আমি এক পাতার বেশি পড়তে পারি না। তোমরা যে কেন ওকে নিয়ে এত হইচই কর! কোনো এক বছর সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণার পর আমরা একবার *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় উষ্মার সঙ্গে লিখেছিলাম, কেন কমলকুমারকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না। সেই সংখ্যাটি পড়ে তখনকার জনপ্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে সরল কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই কমল মজুমদার কে?

কমলকুমারকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ কবি-গল্পকারেরা। 'মতিলাল পাদ্রী' ও 'তাহাদের কথা', মাত্র এই দুটি গল্প ছাপা হয়েছিল দেশ পত্রিকায়, তা ছাড়া কমলকুমারের সমস্ত গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে শুধু বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি তরুণদেরই রণক্ষেত্র। সেই তুলনায় কমলকুমার যথেষ্ট বয়স্ক। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মাপে আঁটে না এমনই বিরাট লেখক তিনি। কোনো একটি স্বল্পখ্যাত ছোটো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস *অন্তর্জলী যাত্রা*। সেই পত্রিকার অন্য আর সব রচনার সঙ্গে কমলকুমারের উপন্যাসটির যেন আকাশপাতাল তফাত! পত্রিকাটি থেকে শুধু নিজের উপন্যাসের অংশটি ছিঁড়ে নিয়ে কমলকুমার আলাদা সাদা মলাট দিয়ে সেলাই করেছিলেন, তারপর তার এক-একটি কপি তিনি উপহার দিয়েছিলেন বিশেষ পরিচিতদের। তিনি বলেছিলেন, মাত্র একশো জন পাঠক হলেই তাঁর চলবে। জীবিত অবস্থায় খুব সম্ভবত একশো জনের বেশি আন্তরিক পাঠক তিনি দেখে যেতে পারেননি। এখন তাঁর সুমুদ্রিত একটি গল্পসমগ্র পাওয়া যায়, কিছু কিছু পাঠক সেটি গ্রহণও করেছেন, কিন্তু তার উপন্যাসগুলি খুবই দুর্লভ।

তাঁর চরিত্রের আর-একটি বৈপরীত্যের উদাহরণ দিয়ে তাঁর ছোটোগল্পগুলির আলোচনা শুরু করা যাবে। যতদূর জানি, কমলকুমার দুখানি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। একটির নাম *তদন্ত*। সেটা বেশ সস্তা ধরনের রহস্য রোমাঞ্চ পত্রিকা। দারোগার দফতর ও খুনজখমের কাহিনি তাতে ছাপা হত, অধিকাংশ লেখা তিনিই লিখতেন বেনামিতে, তাঁর

ধারণা ছিল, ওই কাগজ চালিয়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হবে। হল না। অচিরেই সে কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পর তাঁর অতি অনুরক্ত সঙ্গী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় কমলকুমার বার করলেন আর-একটি পত্রিকা, *অঙ্ক ভাবনা*। উচ্চাঙ্গের গণিত এবং মেটাফিজিক্‌সের আলোচনা ছাড়া তাতে অন্য কিছু স্থান পেত না। একই ব্যক্তি একবার রগরগে গোয়েন্দা পত্রিকার সম্পাদনা করছেন, পরে আবার উচ্চাঙ্গের গণিত ও মেটাফিজিকসের পত্রিকা, এরকম আগে কখনও শোনা গেছে!

যৌবন বয়েসে কমলকুমার গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু মধ্যবয়সে। 'মল্লিকা বাহার' তাঁর প্রথম দুঃসাহসী, চমকপ্রদ গল্প। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লেখার কথা বাংলায় আগে কেউ চিন্তাও করেননি। গল্পের ভাষা দেখেও বোঝা যায়, এ আমাদের পরিচিত বাংলাভাষা নয়, বিশুদ্ধ বর্ণনারীতি এর মধ্যে নেই, এর বাক্য গঠন ভিন্ন জাতের।

> এখনও মল্লিকার আবক্ষ, সে আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে, অদ্য নিরীক্ষণ করে; কেমন ধারা মুখটা হয়ে আছে যে তার, অথবা পুরষোচিত ক্লান্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্র্যাকেটে, ওটা পাউডার এটা কাজল এটা এসেন্সের শিশি, তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল টসটসে ফিতে, কিছু কাঁটা— এ সকলই সদ্য মৃত কোনো জনের সমারোহ বা; আর যে, এই পুরষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এ সকল যে, ম্রিয়মাণ, নিষ্ক্রিয়।

এই গদ্য বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। অথচ অনাস্বাদিতপূর্ব একটা ব্যঞ্জনা যে রয়েছে, তা-ও ঠিক ।

'মল্লিকা বাহার'-এর আগের পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প, 'লাল জুতো' এবং 'জল'। যতদূর জানা যায়, 'লাল জুতো' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। এটাকে একটা মধুর কৈশোর প্রেমের গল্প বলা যায়, যদিও গতানুগতিক প্রেমের গল্পের চেয়ে আলাদা। এই গল্প পাঠ করে কমলকুমারের ভবিষ্যৎ রচনাধারা কোন্ দিকে যাবে তা অনুমান করা যায় না। কিন্তু 'জল' গল্পটি এক পথিকৃৎ লেখককে চিনিয়ে দেয়। এটা বন্যাপীড়িতদের গল্প। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর বন্যার গল্পের চেয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে অন্যরকম। বন্যায় সব ডুবে গেছে, পেটে ভাত নেই, ঘরের চালা ফুটো, এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই অসহায় দুটি মানুষকে, নন্দ আর ফজল। আর কোনো উপায়ান্তর নেই দেখে এই ধর্মভীরু, দুর্বল মানুষদুটি ডাকাতি করবে ঠিক করল। গভীর রাতে উঁচু বাঁধ দিয়ে হেঁটে আসছে এক বৃদ্ধ ও বালক, এরাও ওই দুজনেরই মতন দরিদ্র ও অসহায়, আজকেই ওই পূজারি বামুনটি এক ধনীর বাড়িতে পুজো করে কিছু চাল-কলা-সন্দেশ পেয়েছে এবং বালকটি কুইনিন চুরি করেছে। এরা হাঁটছে ভয়ে ভয়ে, আর ডাকাতদুটিও তো আসলে ভীতু, কোনো বলশালী, অস্ত্রধারী পথিককে আক্রমণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। পাছে ভুল করে ওরা নিজেদের নাম ধরে ডেকে ওঠে, তাই ছদ্মনাম নিয়েছে কানাই।

দুজনেই কানাই। পাপবোধ থেকে এই কানাই যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে যায়। সব দোষ কানাই-এর :

> পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভালো লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুনিনি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভালো লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।... সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু ফজল থতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই।

'জল' গল্পেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেখকের বাংলা গদ্য অন্য চালে চলতে শুরু করেছে।

'মল্লিকা বাহার' শুধু ভাষা ব্যবহারের জন্যই নয়, বিষয়বস্তুতেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। পুরুষের নিঃসঙ্গতা বোধ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, একজন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন নারীর সম্পর্কের কথাও সাহিত্যে নতুন নয়। 'মল্লিকা বাহার' গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি এসবের বিপরীত। হঠাৎ একদিন মল্লিকা নামের যুবতীটি একটি চাকরির চিঠি পায়। এবার থেকে সে স্বাধীন হবে। কিন্তু এ কথাও তার মনে পড়ে যে, এরপর আস্তে আস্তে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে। তার কোনো সঙ্গী নেই। সে নিঃসঙ্গ কিন্তু এর আগে কোনো যুবককে সে কাছে আসতেও দেয়নি। সে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে তার পূর্বপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেইসব পুরুষরা কেউ সংসারী, কেউ অতি সাধারণ হয়ে গেছে। কেউ মল্লিকাকে দেখে ভয় পায়। পথে দেখা হল শোভনাদির সঙ্গে। এই শোভনাও চাকরি করে। একলা চলাফেরা করে কিন্তু পুরুষদের ধার ধারে না। শোভনা মল্লিকার হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। গ্রীষ্মকাল। ছাদে গিয়ে মাদুর পেতে বসল দুজনে। বেলফুলের মালা জোগাড় করে আনল শোভনা। গরমের জন্য সে গায়ের জামা খুলে ফেলল। তাদের পুরুষ বন্ধু নেই, কিন্তু এই দুই রমণী তো পরস্পরের বন্ধু হতে পারে। সেই বন্ধুত্বে শরীরই বা বাদ যাবে কেন? সোহাগ করে মল্লিকার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তার মুখ চুম্বন করে শোভনা। মল্লিকা আবেশে বিহ্বল হয়ে যায়। শোভনার মুখনিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লেগে থাকে।

পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছিলেন 'সোনার চাঁদ' নামে গল্প। দুই নারীর পরস্পরের প্রতি শারীরিক আকর্ষণের গল্প বাংলায় আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না। প্রখ্যাত উর্দু লেখিকা ইসমৎ চুঘতাই খানদানি মুসলমান পরিবারের নারীদের মধ্যে লেসবিয়ানিজমের কাহিনি লিখে প্রচুর শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। কমলকুমারের 'মল্লিকা বাহার' নিয়ে যে এ দেশের নীতিবাগীশেরা খড়্গহস্ত হননি, তার কারণ *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্প অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়েননি, পড়ার চেষ্টা করলেও অনেকে বোঝেননি।

'মতিলাল পাদ্রী' এবং 'তাহাদের কথা' গল্পদুটিতে কমলকুমারের ক্ষমতা এবং নিজস্ব

বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিকশিত। বাংলা লেখার সব রীতিনীতি ভেঙে দিচ্ছেন তিনি। এতাবৎকাল সমস্ত কাহিনি লেখা হয়েছে ন্যারেটিভ স্টাইলে, ঘটনাপরম্পরায়। কিন্তু কমলকুমারের রচনায় যখনতখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলেমিশে যায়। ইদানিং বিদেশে ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম নামে একটা কথা চালু হয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কমলকুমারের এইসব গল্পে, চরিত্র ও পটভূমির বাস্তব নিছক চাক্ষুষ বাস্তব নয়, মানুষগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। কমলকুমারের সংলাপের ব্যবহারও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণ বাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এক-একটা বাক্যের অর্ধেক কিংবা কয়েকটি শব্দেই সব বুঝিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

'তাহাদের কথা' গল্পটি মর্মন্তুদ হয়েছে প্রধানত এর আঙ্গিকের জন্য। দেশের জন্য অনেক ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন শিবনাথ, জেল খেটেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, দেশ বদলে গেছে, স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার যোদ্ধাদের আর মূল্য নেই। এসব দেখেশুনে শিবনাথ পাগল হয়ে গেলেন। উচ্চশিক্ষিত মানুষটা একেবারে বদ্ধ পাগল, পথে পথে ঘোরেন, পরনের কাপড়ের ঠিক থাকে না। ছেলেরা ঢিল মারে, সবাই দূর দূর করে। কোনোরকম উপার্জন নেই বলে তাঁর কিশোরী মেয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে কাজ নিয়ে লালসার শিকার হয়, ছোটো ছেলে জ্যোতি বাবাকে বাঁচাবার জন্য সবসময় খোঁজাখুঁজি করে। শেষপর্যন্ত ঠিক হয় যে শিবনাথের হাত-পা শিকলে বেঁধে রাখা হবে, জ্যোতি তা কিছুতেই মানতে চায় না। এই নির্মম কাহিনিটি বেশি মর্মস্পর্শী হয়েছে, কারণ তা দেখানো হয়েছে ওই ছোটো ছেলেটির চোখ দিয়ে। সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এক বালকের অভিমান। এইসব গল্প সাধারণত রুক্ষ ধরনের হয়, কিন্তু এ গল্পের কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে যে কবিত্ব, তা আরও বেদনাবোধ জাগায়। জ্যোতির বাবাকে জন্তুর মতন শিকলে বাঁধা হবে। দেশের জন্য কারাবাসের পুরস্কার হিসেবে পুনরায় বন্দীদশা, ওদিকে এক ব্যবসায়ী, আত্মরাম মারোয়াড়ি পুণ্য অর্জনের জন্য খাঁচার পাখিকে মুক্তি দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। সেই অংশটি এরকম :

> আত্মারামবাবু এখানে উপস্থিত, ঠিক কাঁটার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, মুখে তাঁর অনর্গল শ্লোকধারা। তাঁর পায়ের কাছে বেনারসী পাখমারা। ছেঁড়া জুতোর মতন মুখটা সকল সময়েই আড়াল করে, এটা তাদের মুদ্রাদোষ। এখন সে আঁঠরু লতার ঢাউস ঝুড়িটার মধ্যে হাত দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে কিছু নিশ্চয়ই খুঁজছিল। সহসা বলে উঠলো, আকাশ পাবি গো, ডর কি রে, আর জম্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরাণ। এবং অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে একটি পাখি বার করে আনলো। একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছুভাগ,বনের কিছুভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি। অনেকেই পাখি দেখে নমস্কার করেছিল।

এই পর্যায়ের একটি অত্যন্ত নিখুঁত, সুন্দর জোরালো গল্প 'কয়েদখানা'। ভাষার নিখুঁত কারিগরি সৌন্দর্যে গল্পটি ঝলমল করছে। জগদীশ গুপ্ত কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁদের

চরিত্রগুলির চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন না, দু-এক আঁচড়ে কিছুটা আন্দাজ দেন শুধু। কিন্তু কমলকুমার একজন শিল্পী, দৃশ্যগুলিকে ছবির মতন ফুটিয়ে না তুললে তাঁর তৃপ্তি নেই। এই গল্পে ঘোড়সওয়ার শাজাদকে আমরা প্রথম দেখি এইভাবে :

> জলাশয়ে মুক্তকেশী অন্ধকার। সুন্দর ভাট গাছ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া ডাল, সেখানে ঘোড়াটি— মাটির আধো সবুজ ঘোড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভাট ফুলের কমলালেবু রং অটুট হয়ে উঠলো। ঘোড়াটি মুখ তুলে সুলক্ষণ কান দুটি খাড়া করে। ল্যাজটি নাড়লো। কেশর স্থানচ্যুত হয়।
>
> টিলার লোকটি তাকে দেখলো। লোকটি ঢ্যাঙ্গা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবি তীরেলা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেট্টি, তার গায়ে নকশা করা ভারি কাঁথা ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা, কড়া হাঁটু,— তার পাশেই আঁটলি মাংসপেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত। কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে। হাতে হাত মিলাল, লোকটি অবাক হয়ে ঘোড়াটিকে দেখলো, সম্পূর্ণ ছবি। সব দৃশ্যই এরকম ছবি। পরিবেশের ইজেলে তেলরঙে আঁকা।

কাহিনিটি উন্মোচিত হচ্ছে খুব ধীর লয়ে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির কিছু অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রথমে। তারপর জানা যায় কাছাকাছি বড়োগ্রামে জমিদার এসেছে। নতুন জমিদার, এখনও জমিদারি হালচাল পুরো রপ্ত হয়নি। পাছে লোকে তাকে আনাড়ি মনে করে তাই সে অবিরাম মদ গিলে গিলে যখন তখন হুমকি দেয়। বাঈজি ও রক্ষিতা এনেছে ঠিকঠাক, মাঝে মাঝে বন্দুক তুলে শূন্যতাকে ভয় দেখায়। সে জানে যে জমিদারকে অত্যাচারী হতে হয়, না হলে লোকে মানে না। সেই ঝোঁকে সে হুকুম জারি করে দিল যে আমাদের পূর্বপরিচিত শাজাদ ও অন্যান্য গরিব মানুষগুলোকেও এখন থেকে খাজনা দিতে হবে। যদিও ওই গ্রাম, রুনুখগাঁ, শুকনো ডাঙাজমিতে ভরা, সেখানে কোনোদিন খাজনা লাগেনি। ঘোষণা শুনে বিস্মিত ভয়ার্ত মানুষগুলো জমিদারের কাছে দরবার করতে আসে। জমিদার মোহনগোপাল ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবে যে দয়া দেখানো মানেই দুর্বলতা। রুনুখগাঁর সামান্য খাজনায় তার প্রয়োজন থাক বা না থাক, এইসব প্রজাদের রাখতে হবে পায়ের নীচে। প্রথমেই সে জমিদার বাড়ির সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান কয়েদখানাটা দেখে আসতে বলে প্রজাদের। তারপর মাতলামির ঝোঁকে, নিতান্ত অকারণে শাজাদের ঘোড়াটিকে গুলি করে মারে।

নিরীহ, অসহায় প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচারের কাহিনি আমরা অনেক পড়েছি। এককালে এইসব জমিদারদের চেহারা ছিল ফরসা, নাদুস নুদুস। ক্রমে এদের রং কালো হতে থাকে। এক শ্রেণির লেখক এইসব জমিদারদের গায়ে কালো রঙের পোঁচ লাগাতে লাগাতে একেবারে কুচকুচে কালো, সমস্ত দোষে ভরা একটা জড় মূর্তি করে তোলেন। আর গরিবরা ফরসা হতে থাকে। গরিব বা নিপীড়িত হলেই সাদা। জমিদার বা কারখানার

মালিক বা শোষকশ্রেণির সবাই কালো, আর শোষিত কৃষক-মজুর-বস্তিবাসী সবাই সাদা। লেখা হতে লাগল এই কালো আর সাদাদের লড়াইয়ের কাহিনি, দ্রুত তা একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হল। সম্পূর্ণ সাদা আর সম্পূর্ণ কালো। এই একরঙা মানুষদের নিয়ে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না।

এই গল্পে অবশ্য শাজাদ ও তার সঙ্গীরা মুসলমান-হিন্দুদের একটি মিশ্রিত দল দ্বিতীয় বার সাহস সঞ্চয় করে ফিরে এসেছে এবং আঘাত হেনেছে। প্রিয় ঘোড়াটিকে মারার প্রতিশোধ নিতে শাজাদ হত্যা করেছে ওই জমিদারকে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিশীল গল্পের সঙ্গে এই কাহিনিবিন্যাসের কোনো মিল নেই। এখানে লেখক ওই নব্য জমিদার মোহনলালের মধ্যে মৃত্যুবীজ আগেই দিয়ে দিয়েছেন। তার হাবভাব সবকিছুই বেমানান। যুগ বদলাচ্ছে। এখানে এই জমিদারশ্রেণির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। মোহনলাল নিজেও যেন জানে যে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে যেন জমিদারের ভূমিকায় এক ব্যর্থ অভিনেতা। তার মাতলামি তার নারীসম্ভোগের দেখানেপনা, তার বন্দুক নিয়ে আস্ফালন, এ সবই যেন তার মৃত্যুর আগে হাত-পা খিঁচুনি। শাজাদ এসে তার মাথায় আঘাত করার সময় সে কোনোরকম প্রতিরোধের চেষ্টাও করে না। এরকম চরিত্রচিত্রণের তাৎপর্য অনেক গভীর। 'কয়েদখানা' কিংবা 'নিম অন্নপূর্ণা'র মতন গল্পই সত্যিকারের প্রগতিশীল রচনার আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। এই পর্যায় পর্যন্ত গল্পে কমলকুমার আশ্চর্যরকম অসাম্প্রদায়িক। বেশ কয়েকটি হিন্দু-মুসলমান চরিত্র এসেছে, এমন স্বাভাবিকভাবে তারা মিলেমিশে আছে যে তাদের আলাদা করে চেনাই যায় না। যারা সবাই একই ধরনের গরিব, তাদের হিন্দুত্বে-মুসলমানত্বে কী যায় আসে?

'রুক্মিণীকুমার' ও 'লুপ্ত পূজাবিধি' থেকে কমলকুমারের লেখায় হঠাৎ এক পরিবর্তন এসে গেল। যে-কোনো সাহিত্যের ইতিহাসেই এরকম অদ্ভুত ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে।

সকলেরই জানা আছে যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যে সাধু ক্রিয়াপদ দিয়ে বাংলা লিখতেন, প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগে তার একটা মোড় ঘুরে যায়। লিখিত ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য দেবার জন্য চলিত ক্রিয়াপদ এসে যায় প্রথমে গদ্যে, তারপর কবিতাতেও। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এটা গ্রহণ করায় সকলের মেনে নিতে সুবিধে হয়েছিল। তবু পুরোপুরি চালু হতে সময় লেগেছিল কিছু বছর। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই প্রথম জীবনে সাধু বাংলায় লিখেছেন। জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ীও একসময় সাধু বাংলা ত্যাগ করে চলিত বাংলা অবলম্বন করেছেন। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কমলকুমারই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি বেশ-কিছু বছর চলিত বাংলায় লিখে হঠাৎ সেই বাংলা ত্যাগ করে লিখতে শুরু করলেন সাধুভাষায়। এরকম বিপরীত পথে যাত্রা যেন অবিশ্বাস্য!

শুধু তাই নয়, তার বাক্যগঠন এমনই জটিল ও অদ্ভুত হতে লাগল যে সহজে বোঝে কার সাধ্য! যেন তিনি ভাষাবন্ধনে এক কঠিন দেয়াল তৈরি করছেন। অত্যন্ত কসরত করে পাঠক যদি সেই দেয়াল লঙ্ঘন করতে না পারে, তাহলে তাঁর কাহিনির মর্মে প্রবেশ করতে পারবে না। এ যেন প্রায় শারীরিক পরিশ্রম করে সাহিত্যপাঠ।

'গোলাপ সুন্দরী' গল্পটি যখন লেখা চলছে, তখন আমি একদিন ওয়েলিংটনের সাঙ্গুভ্যালি চায়ের দোকানে বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম গল্পটার আর কতখানি বাকি! কমলকুমার মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমরা এই যে গল্পটা লিখছি, এতে খানিকটা সময় লাগছে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমরা' মানে? গল্প লেখায় আপনাকে কেউ সাহায্য করছে নাকি? তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, আমরা মানে শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমি, এই দুজনে মিলে লিখছি। আমার একার পক্ষে তো কিছু লেখা সম্ভব নয়।

আমি মনে করেছিলাম, এটা তাঁর নিজস্ব ধরনের একটা ঠাট্টা।

কিন্তু এরপরে তাঁর 'খেলার বিচার' গল্পের আরম্ভ এরকম : 'মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।' 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'অনিত্যের দায় ভাগ' গল্পগুলির আরম্ভ এরকম। তারপর থেকে এরকমই চলল।

সাঙ্গুভ্যালি রেস্তোরাঁয় সেই বিকেলটির কথা আমার আজও মনে পড়ে। দুর্বোধ্য মানুষটি তখন থেকে যেন আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিলেন। এর আগে যিনি ঠাকুর-দেবতা ধর্ম-ঈশ্বর নিয়ে নানারকম রঙ্গরসিকতা করতেন, সেই মানুষটি এরপর থেকে মদ্যপানের আগেও স্মরণ করতেন রামকৃষ্ণের নাম।

'গোলাপ সুন্দরী' ও 'অন্তর্জলী যাত্রা 'প্রকাশের পর তরুণ লেখকদের মহলে যখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে, অনেকে তাঁকে কাল্ট-ফিগারে পরিণত করতে চায়, তখনই কমলকুমার সরে গেলেন এই সুন্দর রহস্যময় রচনারীতি থেকে। তিনি যেন এই পাঠকদেরও চান না। ব্যাপৃত হলেন কঠিন থেকে কঠিনতরের সাধনায়। এইসময়েই তিনি বলতে শুরু করলেন যে রবীন্দ্রনাথ কোনো লেখকই নন, ওই দাড়িওয়ালা লোকটি বাংলাভাষার অনেক ক্ষতি করেছেন, বাংলাভাষার আসল লেখক হলেন বঙ্কিম। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতাম, বঙ্কিমের ভাষা তো জটিল নয়, বেশ সরল। বঙ্কিম অনেক আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করতেন বটে, কিন্তু বাক্য গঠনে অস্পষ্টতা কিছু নেই। কিন্তু কমলকুমারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গদ্যভঙ্গিমার সাযুজ্য কোথায়? সে গদ্য এইরকম :

> বিদায় বিদায় হে অগ্নি তুমি আমা সবাকার চরিত্র নই, তুমি মৃত, তোমাকে তিনবার আঘ্রাণ করিয়া হাসিলাম ; যে বটে শোক করা ন অইসি।
>
> পাঠক কেহ যদি থাক, যদি কেহ জাগিয়া থাক, তবে আকর্ষণ কর মদীয় খেদ সকল।

এখন বলিব ইহা এক কুহকময় রূপাশ্রিত শরৎকাল, ইদানিং অরুণোদয়ের পূর্বে, ভোরে উচ্চহাস্য শোনা যায়, যে এখন নৈরাশ্য নাই, বেশ্যা নাই, দুষমন নাই; সওদাগর নাই; হা এই মর জীবন। শস্য যাহার চেতনা দিবে, তাহা জীবন যুদ্ধ নামে অহংকার হইল... (কালই আততায়ী)।

তবে কি কবিতার মতন এই গদ্যেরও প্রতিটি শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে বুঝে নিতে হবে। তাও যে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ভাষা বোঝার জন্য এত মল্লযুদ্ধ করতে হলে কাহিনির মর্মে প্রবেশ করব কখন?

মাঝখানে কারা যেন রটিয়েছিল যে বাংলা গদ্যের ভিত্তি যেহেতু ইংরেজি সিনট্যাক্স, তাই কমলকুমার ওই গদ্য মানেন না। তিনি ফরাসি ভাষাবিদ, তিনি ফরাসি সিনট্যাক্সের প্রবর্তন করতে চান বাংলা গদ্যে। ফরাসি গদ্যে বিশেষ্য বিশেষণে কখনও-কখনও স্থান পরিবর্তন হয় বটে, যেমন কালো বেড়ালকে বলা যায় বেড়াল কালো। কিছু উৎপ্রেক্ষারও তফাত আছে, কিন্তু ইংরেজি ও ফরাসি গদ্যের কাঠামো মোটামুটি এক। কমলকুমারের এই গদ্যের কোনো ব্যাকরণ নেই।

আগে অন্য কেউ কমলকুমারের রচনাকে দুর্বোধ্য বললে চটে যেতাম, এখন নিজেরাই হোঁচট খাই পদে পদে। সংলাপেও সাধুভাষা, ছিল'র বদলে আছিল, নেহারিল, আভাসিল ইত্যাদি ব্যবহারের কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। একদিন সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন করেছিলাম, ভাষাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?

কমলকুমার বলেছিলেন, দেখ, ভাষা নানারকম হয়। একই ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করে। সকালে বাজারে গিয়ে একরকম ভাষা, বাবা-মায়ের সঙ্গে আর-একরকম ভাষা, প্রেমিকার সঙ্গে অন্য ভাষা, তাই না? সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে সংলাপের ভাষা, তা আলাদা হতে বাধ্য!

কিন্তু দেবী সরস্বতীর মতন এক হাস্যমুখী, সুশ্রী যুবতী কেন খটোমটো বাক্য পছন্দ করবেন, তা আমার ঠিক বোধগম্য হয় না। ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে কেউ যদি বাক্যালাপ করতেই চায়, তবে প্রেমের ভাষাই তো প্রকৃষ্ট। ভাষা বিষয়ে যারা অজ্ঞ, তারাও প্রেমের ভাষা বোঝে।

মোট পঁয়ষট্টি বছর বেঁচেছিলেন কমলকুমার। এর মধ্যে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন শেষ কুড়ি বছর। গল্প লিখেছেন মাত্র তিরিশটি, তাও দু-তিনটি অসমাপ্ত। এর মধ্যে অর্ধেক গল্প ভাবনার ঐশ্বর্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্মিতিতে, কাব্য ও চিত্রশিল্পের মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। আর দ্বিতীয়ার্ধের গল্পগুলি ভাষার কঠিন ব্যূহের ভাগ্য ঠিকমতন বিচার করা যায় না। সেগুলি কি এক লেখকের খামখেয়াল না আরও বড়ো সম্পদ তা কে জানে! আমি সেই গল্পগুলির রসের সন্ধান এখনও পাইনি। মাঝে মাঝেই সেগুলি পড়ি, হয়তো সারাজীবনই পড়ে যেতে হবে!

স্বতন্ত্র একটি মানুষ : একালের একটি উপন্যাসে

[*অগ্নীশ্বর*। শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। ডি এম লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা ৬। সাড়ে চার টাকা]

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি। প্রথম লাইনেই বুঝতে পারা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় নরনারীর অ্যালবামে বনফুল আর-একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের ছবি সংযোজিত করলেন। বস্তুত অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি তো বটেই, তা ছাড়াও তিনি একটি পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি।

অগ্নীশ্বর দীর্ঘদেহ সুপুরুষ। ডাক্তার হিসেবে তিনি কৃতী, সাহিত্যপাঠে তাঁর গভীর অনুরাগ এবং মানুষের শুধু রোগ বিচার করা ছাড়াও তিনি তাদের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। তাঁর আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর, কখনও কোনো হীনবুদ্ধি, ভণ্ড বা ক্ষমতাগর্বিত ব্যক্তির কাছে মস্তক অবনত করেননি, তীক্ষ্ণকণ্ঠে সর্বত্র প্রতিবাদ করেছেন, জ্বলে উঠেছেন অগ্নির মতো। এ সেই অগ্নি, যা আগাছা জঞ্জালকে নিমেষে দগ্ধ করে, কিন্তু স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করে। আগুনের আঁচের মধ্য দিয়ে কখনও সোনাও ঝলসে উঠেছে অগ্নীশ্বরের চরিত্রে।

কিন্তু শুধু একটি চরিত্রকে জীবন্ত করেই এ বই শেষ হয়নি। চরিত্রসৃষ্টিতে বনফুল এতই পারঙ্গম যে, সেজন্য তাঁকে প্রশংসা করা যেন মাছকে ডুবসাঁতারের জন্য বাহবা দেওয়ার মতো। প্লটের চূড়ান্ত কারিকুরিও তিনি দেখিয়েছেন, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা, সপ্তর্ষি, রাত্রি, ডানা, নব দিগন্ত* ইত্যাদি উপন্যাসে। বরং এই বইতে প্লট বেশ ঢিলেঢালা, বরং কোথাও কোথাও ত্রুটিও চোখে পড়ে। সুবিমল সম্বন্ধে অতখানি বলা হল, অথচ শেষপর্যন্ত তাকে দেখাই গেল না। গল্পের বক্তা 'আমি' চরিত্রটি ঈষৎ অবান্তর, অতি-নাটকীয় হয়ে পড়েছে এই বইতে। প্রথমে বিপ্লবী পরে পুলিশ অফিসারকে দিয়ে গল্পটি বিবৃত করানোতে কোনো আঙ্গিকগত সাফল্য দেখানো যায়নি।

অগ্নীশ্বর সারাজীবন যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছেন তাকে বলা যায় বাসনার স্বাধীনতা, যে জিনিস কোনো সামাজিক মানুষের পক্ষে লাভ করা প্রায় অসম্ভব। ঠিক নিজের ইচ্ছামতো বেঁচে থাকার সুযোগ সামাজিক মানুষের নেই। সেইজন্যই একদা-সিভিলসার্জেন অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় গল্পের শেষে বেদে-দলের ডাক্তার হয়ে পড়েছেন। একজন লোকের যদি রাত দুটো পর্যন্ত বই পড়ার স্বভাব থাকে, তবে তার পাশের লোকটি অবশ্যই দশটায় ঘুমোতে চাইবে, এবং আলো জ্বেলে রাখলে তার অস্বস্তি লাগবে। তখন মানুষের সভ্যতা, সমাজ তাদের দুজনকেই একঘরে রাখবার জন্য তাদের সময় কমিয়ে-বাড়িয়ে মেলাবে। অগ্নীশ্বর কিন্তু তা কখনও মানতে পারেননি। তিনি শুধু শেষকালে আলো নিভিয়ে দেবেন বটে, কিন্তু নিজেও সেইসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। এই সবকিছু ছেড়ে চলে যাবার নেশাতেই তিনি কর্মজীবনের সাফল্য, বিবাহিত জীবনের সম্ভোগ, বার্ধক্যে পুত্র-পুত্রবধূর স্নেহের সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে এক ভ্রাম্যমাণ বেদে-দলের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। আসলে অগ্নীশ্বর মানুষটি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। কোথাও তিনি একটু আকর্ষণ বোধ করেননি। এই নিঃসঙ্গতা আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের নিঃসঙ্গতা। এইজন্যই অগ্নীশ্বরের চরিত্র বনফুলের অন্যান্য সব চরিত্রের থেকে পৃথক।

সুবিমল নামক একজন লেখককে অগ্নীশ্বর অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তাকে চিঠিপত্রও লিখতেন প্রচুর। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, এই যে পাঁচজন স্মরণীয়া পঞ্চকন্যা আছেন, এঁদের বিষয়ে সুবিমলের সঙ্গে তাঁর তর্ক হয় এবং উত্তরে তিনি 'আধুনিক পঞ্চকন্যা' শিরোনামার একটি বিরাট চিঠি লেখেন। সেই চিঠিখানিই এই বইয়ের প্রায় অর্ধেক জুড়ে আছে। চিঠিতে অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। পৌরাণিক স্মরণীয়া পঞ্চকন্যা সাধারণ বিচারে দেখা যায় অসতী। মহাপাতক থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এই পাঁচজন অসতীর নাম স্মরণ করতে পুরাণকারগণ কেন নির্দেশ দিয়েছেন—ভাবতে ঈষৎ অবাক লাগতে পারে। অগ্নীশ্বর বলেছেন যে, মানুষ তার বাইরের ঘটনা দিয়ে বাঁচে না। মানুষকে বিচার করতে হয় তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দিয়ে। উপরোক্ত পাঁচটি নারীই অন্তরে মহৎ ছিলেন, তা ছাড়া তাঁরা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। অমৃত যেমন কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না, সেইরকম রূপসী স্ত্রীলোকেরাও দ্বিচারিণী হলেও নষ্ট হয় না। এই সঙ্গে বনফুল পাঁচটি আধুনিক কালের নারীর গল্প বলেছেন, যারা কেউ কেরানির স্ত্রী, নীচুজাতের মেয়ে, অথবা বারবধূ; অথচ অন্তরের দিক দিয়ে তারা মহৎ। এই পাঁচটি মেয়ের গল্প অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও সুন্দর। বই শেষ করেও এই পাঁচটি মেয়ের ট্র্যাজিক চরিত্র কিছুতেই ভোলা যায় না।

প্রচ্ছদপট সুন্দর, কিন্তু গ্রন্থসজ্জা বিশেষ প্রশংসনীয় নয়।

নিঃসঙ্গ একটি জীবন : একালের একটি উপন্যাসে

[*ফানুসের আয়ু*। বিমল কর। কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ১২। সাড়ে পাঁচ টাকা]

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্র যে যথেষ্ট সুফলপ্রসূ নয়, একথা মানতেই হবে। সত্যিকারের বয়স্কপাঠ্য উপন্যাসের সংখ্যা কিছুতেই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে, তরুণ লেখকরা— যাঁরা অনেকেই যথেষ্ট দ্যুতিমান ছোটোগল্প রচনা করেছেন— উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। যদিচ, বাঙালি পাঠকদের কাছে ছোটোগল্পের চেয়ে উপন্যাসই বেশি প্রিয়, এবং উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছেও গণনাতীত।

হয়তো যৌবনের উচ্ছ্বাস একটু স্তিমিত না হলে, চোখের সামনে থেকে আত্মাভিমানের পর্দাটা সরে না গেলে সার্থক উপন্যাস লেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু যুবক লেখকেরা সার্থক উপন্যাস রচনা করছেন না এটাই আমাদের একমাত্র অভিযোগ নয়। তার চেয়েও বেশি দুঃখের কথা এই যে, তাঁদের প্রকাশিত উপন্যাসে কোনো নতুন দিকসন্ধানের প্রচেষ্টাও সচরাচর চোখে পড়ে না।

শ্রীযুক্ত বিমল করকে ধন্যবাদ যে, তিনি এবং আর মাত্র কয়েকজন লেখক এ বিষয়ে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেছেন। *ফানুসের আয়ু* নামে আমাদের আলোচ্য এই উপন্যাসটিতে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল—ঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং বলা উচিত অন্তর্দৃষ্টি— তা সত্যই খুব উৎসাহিত হবার মতো। পূর্বপ্রকাশিত উপন্যাস *দেওয়াল*-এই তিনি সমসাময়িক লেখকদের থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন— এই গ্রন্থে তিনি উজ্জ্বলভাবে পৃথকচিহ্নিত হলেন। এই উপন্যাস তরুণতর লেখকদের রচনার গতি পরিবর্তনে সাহায্য করবে এমন আশা পোষণ করি।

চিত্রশিল্পে ফোটোগ্রাফিক ফাইডেলিটির দিন যেমন একেবারে অস্ত গিয়েছে, সাহিত্যেও

তেমনই হুবহু মানুষের জীবনের গল্প, শুধুই বাস্তব বর্ণনা মানসিক অপরিণতির লক্ষণ বলে ধরা উচিত। সমস্ত লেখা দিন দিন প্রতীকধর্মী হয়ে আসছে, সামান্য দু-একটা উপাদান, কয়েকটি বিশেষ সংকেত মানুষের আত্মার গভীর মূল পর্যন্ত আলোড়ন তোলে, লেখকের সৃষ্ট মানুষের সুখদুঃখ পাঠকের সুখদুঃখে পরিশ্রুত হয়। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, গল্প-কবিতা-উপন্যাস ক্রমশ পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে; শুধু গল্প-কবিতা নয়, মানুষের সমস্ত শিল্পই এক সীমারেখায় এসে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত বিমল কর গল্পের সূত্র ধরে উপন্যাস লেখেননি। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু মানুষের জীবন নয়, একটি বিশেষ অনুভূতি। এজন্যই ঘটনার গতি অনুসরণ না করে তিনি ভাবনার গতি অনুসরণ করেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু মানুষের জীবন নয় এই কারণে বললাম যে, তাহলে এ উপন্যাসের নায়ক একজন বিশেষ মানুষ, যে-কোনো একজন মানুষ নয়। কিন্তু যে-দুঃখের স্রোত তার জীবনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মেরেছে, সেই গভীর, ভয়ংকর, রহস্যময় নিঃসঙ্গতার দুঃখ অনুভব করেননি, কাঁধের উপর একটি মাথাবিশিষ্ট এমন মানুষ কজন। এমনকি, সত্যিই যাঁরা কখনও বোধ করেননি, বিমল কর তাঁদের মধ্যেও এই দুঃখের বোধ জাগিয়ে দিতে সমর্থ, এবং এখানেই তাঁর আসল কৃতিত্ব।

এই উপন্যাসের নায়ক তার জীবনে চারটি মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যেকটি মৃত্যুই তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার বুকের অমোঘ নিঃসঙ্গতাকে। উপন্যাসের মধ্যে সময়ের ব্যবধানগুলি তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। মধ্যে মধ্যে দু-পাঁচ-দশ বছরের ব্যবধান আছে, এবং অন্তর্বর্তী কালের ঘটনাবলির বর্ণনার জন্য তিনি কখনও উৎকণ্ঠিত হননি।

শেষ দিকে এসে গল্প একেবারে রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে। একটি গভীর আবিষ্ট ভাব ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। একটি স্বপ্নকে তিনি বইয়ের মধ্যে তিনবার ব্যবহার করেছেন। বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে এসে সে স্বপ্ন আর শুধু স্বপ্ন থাকে না; সন্দেহ হয়, স্বপ্নহীন হয়ে বাঁচবার আর অন্য উপায় আছে কি না।

বইটি ত্রুটিহীন নয়। কোথাও কোথাও লেখকের মনোযোগের অভাব বুঝতে পারা যায়। বইটির নাম একেবারেই উপযুক্ত হয়নি। একটি মূল্যবান বইয়ের শিরোনামায় খেলো-কবিত্ব থাকা বর্তমান সমালোচকের মনঃপূত নয়। বইয়ের প্রথম কিছু পৃষ্ঠায় অত্যন্ত ছোটো ছোটো, দু-তিনটি শব্দের বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো নির্লিপ্ততা বা সরসতা দেখাবার উদ্দেশ্য ছিল লেখকের, কিন্তু তার বদলে অনেক জায়গাতেই লেখা ব্যঞ্জনাহীন হয়ে পড়েছে। তবে শুরুতে লঘুভাব দেখিয়ে ক্রমশ যে তিনি গভীর, গভীরতর প্রদেশে চলে এসেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য।

সাদা বাঘ, পপির সমুদ্র এবং আফ্রিকা

প্রতি বছরই ইংল্যান্ডের বুকার পুরস্কার ঘোষণার কিছুদিন আগে থেকেই সে বিষয়ে আমরা ঔৎসুক্য বোধ করি। তার কারণ, ইংরেজি ভাষার মৌলিক উপন্যাসের (অনুবাদ নয়) এই পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ইদানিং ভারতীয় ইংরেজি লেখকদের নাম মাঝে মাঝেই দেখা যায়। এ বছর আগ্রহের কারণ আরও বেশি ছিল, কেন-না, চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকায় পাঁচজনের মধ্যে দুজনই ভারতীয়। এঁদের মধ্যে অমিতাভ ঘোষ বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক এবং বিশ্ববিখ্যাত, অন্যজন অরবিন্দ আডিগা, এক নবাগত তরুণ এবং এ পর্যন্ত একটিই উপন্যাস লিখেছেন।

আমরা অনেকে ধরেই নিয়েছিলাম, কিংবা বলা যায়, খুব আশা করেছিলাম, অমিতাভ ঘোষই পুরস্কারটি পাবেন। অনেকদিন আগেই অমিতাভর এই পুরস্কার প্রাপ্য ছিল, তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসই অসাধারণ হিসেবে নানা দেশে স্বীকৃত, আমি অমিতাভ ঘোষের প্রথম লেখা থেকেই (*দ্য সার্কল অফ রিজন*) পরপর সব উপন্যাস পড়ে আসছি, তার মধ্যে *ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড* উপন্যাসটি বিষয়ের অভিনবত্বে ও রচনাগুণে আমার চিরস্মরণীয় এবং অতি উচ্চ পুরস্কারের উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। অমিতাভ একজন পরিশ্রমী গবেষকও বটে, তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং পারিপার্শ্বিক নিখুঁত উপাদানের ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কখনও মিশর, কখনও বার্মার নির্বাসিত রাজা আবার কখনও বাড়ির পাশের সুন্দরবন তাঁর কলমে ইতিহাস-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

শেষপর্যন্ত পুরস্কার ঘোষিত হল অরবিন্দ আডিগা-র নামে। এই লেখকের নাম আমি আগে শুনিনি, তাঁর *দ্য হোয়াইট টাইগার* বইটি সম্পর্কেও কিছু জানতাম না। সুতরাং বইটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে হয়।

পড়ার পর যদি বলি, এবারের বিচার সঠিক হয়নি, তাহলে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আমরা বাঙালিরা বড্ড বেশি বাঙালিদের পক্ষপাতী। বাস্তবে অবশ্য তা দেখি না, বাঙালিরা ক্বচিৎ বাঙালিদের সমর্থক, বিরুদ্ধতাই বেশি। তবু ওই ধরনের মন্তব্যের ঝুঁকি নিয়েই

আমি অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসটিকে অনেক উঁচু স্থান দিচ্ছি, তার কারণ এই উপন্যাসটি একটি সাহিত্যসৃষ্টি, পুরস্কৃত বইটিকে সাহিত্য পদবাচ্য বলা যায় না।

সাদা বাঘ উপন্যাসটি একটি রগরগে কাহিনি, অনেকটা সংবাদপত্রের অন্তর্তদন্তের মতন। গয়া জেলার লছমনগড়ের এক রিকশাচালকের ছেলে বলরাম, স্কুলে ভরতি হলেও সে পাঠ শেষ করতে পারেনি। এইসব ছেলেদের যা হয়, প্রথম কিছুদিন চায়ের দোকানের বেয়ারা, তারপর কোনোক্রমে গাড়ি চালানো শিখে ড্রাইভারের চাকরি পায়। চলে আসে দিল্লিতে, বড়োলোক মালিকদের রকমসকম সে মন দিয়ে লক্ষ করে এবং গুরগাঁও-এ গড়ে ওঠা বিশাল, ঝকঝকে শপিং মল সংস্কৃতি দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা ৩২১ পৃষ্ঠার এই বইয়ের কাহিনির শেষ দিকে দেখা গেল, সেই রিকশাচালকের ছেলে এবং একদা ড্রাইভার বলরাম বেঙ্গালুরু শহরে এক ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে, সে আর গাড়ি চালায় না, সে নিজেই ২৬খানা টয়োটা কোয়ালিসের মালিক। তার এই সার্থকতার উত্তরণের পথে নানারকম অসৎ কাজ, ঘুষ, জাল-জুয়াচুরি, এমনকি একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সে। নাম ভাঁড়িয়ে সে এখন অশোক শর্মা। বেঙ্গালুরুর সাদা বাঘ।

এই লেখকের মূল বক্তব্য, এ দেশটা এখন দুটো ভাগে ভাগ করা, একদিকটা কালো, অন্যদিকটা আলো। কালো দিকটা গরিবদের আর আলোকিত দিকটা উচ্চবিত্তদের। ধনীরা এবং রাজনীতিবিদরা নানারকম অন্যায়, মিথ্যাচার করে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখে আর গরিবদের যদি ওপরের শ্রেণিতে উঠতে হয়, তাহলে তাকে এইসব পথই অনুসরণ করতে হয় সাহসের সঙ্গে। রাজনীতিবিদ, পুলিশ থেকে বিচারক, সবাই ঘুষের বশবর্তী। খুন করার পরও এই লোকটি ধরা পড়েনি। যদিও তার ছবি দিয়ে পোস্টার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বহু জায়গায়, শুধু চোরাই টাকা ছড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত থেকেছে। সারা দেশের উঠতি আন্ত্রেপ্রেনিয়রদের এই একই ইতিহাস।

এইসব কথা মোটেই মিথ্যে নয়, খবরের কাগজে এমন সব ঘটনা তো আমরা রোজই পড়ি। তা নিয়ে গোগ্রাসে গেলার মতন উপন্যাসও লেখা যায়, আবার প্রকৃত সাহিত্য রচনাও সম্ভব। সাহিত্য রচনায় এসব ঘটনাপ্রবাহ ছাড়িয়েও লেখক প্রবেশ করেন জীবনের গভীরতায়, চরিত্রগুলি নিছক ভালো বা মন্দ হয় না, মানুষকে তার পায়ের তলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। স্তাঁদালের ক্লাসিক উপন্যাস *লাল ও কালো* খবরের কাগজের একটি ঘটনা অবলম্বনেই রচিত। *দ্য হোয়াইট টাইগার* উপন্যাসে সেরকম কিছুই নেই, সবই ওপর ওপর, নিছক বিবরণকে ভাঙার চেষ্টাও করা হয়নি।

আরও একটা কথা, এ দেশে ঘুষের রাজত্ব, মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। খুন করেও পার পেয়ে যাওয়া, এসবই ঠিক, কাল্পনিক নয় মোটেই, কিন্তু শুধুই এসব নিয়ে বিদ্রুপ করার মধ্যে অন্য একটা মানসিকতা যেন উঁকি মারে। ইংরেজরা তাদের পরিত্যক্ত কলোনির

এই অবক্ষয়ের ছবিই পছন্দ করে। কিন্তু তা নিয়ে কি সাহিত্যের বিচার চলে! অরবিন্দ আডিগা একজন তরুণ লেখক, তাঁর উপন্যাস নিয়ে নিন্দামন্দ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে, এ কথা বলাই যায় যে এরকম উপন্যাস আমরা আগেই বেশ-কিছু পড়েছি এবং বেশিদিন মনে রাখিনি।

অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসটির সঙ্গে অবশ্য উক্ত পুরস্কৃত গ্রন্থটির কোনো তুলনাই চলে না। যে-কোনো ভাষাতেই এরকম উপন্যাস এক যুগে এক-আধখানি রচিত হয় মাত্র। অমিতাভর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি আকারে ছোটো। ইদানীংকালের *দ্য গ্লাস প্যালেস* এবং *হাংরি টাইড*-কে বলা যেতে পারে পূর্ণাঙ্গ আকারের। একেবারে সাম্প্রতিক *সি অফ পপিজ* তাঁর সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস, প্রথম খণ্ডেরই পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫১০, সম্পূর্ণ হবে তিন খণ্ডে। ইংরেজি ভাষায় এমন সুবৃহৎ আকারের উপন্যাস রচনার উদ্যোগ তো আর কারুর দেখা যায় না।

চমৎকৃত হতে হয় তাঁর গবেষণার ব্যাপ্তি দেখে। প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি সংগ্রহ করেছেন বহুবিধ উপাদান, নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে। শিখেছেন ভোজপুরি ভাষা এবং জাহাজের লস্করদের 'লিংগো', যা ঠিক ভাষা বলা যায় না, যা শুধু লস্করদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জাহাজ চালনার খুঁটিনাটি। কাহিনির পটভূমিকায় রয়েছে কয়েকটি সমুদ্র ও কয়েকটি দেশ। ভারতে তখন ঔপনিবেশিকদের রাজত্ব। সেইসব শ্বেতাঙ্গ শাসকদের মধ্যে এক শ্রেণি অধিকাংশ ভারতীয়দের মানুষ বলেই গণ্য করে না। তাদের প্রতি যেমন শোষণ ও অত্যাচার করে, তেমনই কুৎসিত গালাগাল দেয়। আমরা নীলকরদের কথা যতটা জানি, আফিম ব্যবসায়ীদের কথা তেমন প্রচারিত নয়। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এদেশে আফিম উৎপাদন করে চালান দিত চীনদেশে। একটা জাতিকে আফিমের নেশায় বুঁদ করে রেখেছিল, সেই আফিম ব্যাবসার অন্যতম কেন্দ্র ছিল কলকাতা। এই উপন্যাসে সে সবই বিশদে রয়েছে।

ঘটনার কেন্দ্রে আছে একটি জাহাজ। সে জাহাজটি আমেরিকার বাল্টিমোর থেকে নোঙর ফেলেছে কলকাতা বন্দরে। এইসব জাহাজে আগে ক্রীতদাস চালানো হত, কিন্তু সম্প্রতি ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় এখন কুলিদের দেশান্তর করার কাজে লাগে, এ ছাড়া আফিম ও অন্যান্য চোরাচালানের কাজ তো আছেই। নানারকম নদীনালা যেমন শেষপর্যন্ত সমুদ্রে এসে মেশে, সেরকমই কয়েকটি উপকাহিনির চরিত্রও যেন নিয়তির টানে উঠেছে এই জাহাজে। এদের মধ্যে আছে বারাণসীর কাছাকাছি গাজিপুরের এক আফিম কারখানার মৃত কর্মীর বিধবা স্ত্রী দিতি, তাকে সতীদাহের জন্য জোর করে চড়ানো হয়েছিল চিতায়, শেষ মুহূর্তে তাকে উদ্ধার করে কালুয়া নামের অতি নিম্নবর্গীয় এক গোরুর গাড়ির চালক। সে বুদ্ধিতে কিছুটা খাটো হলেও শারীরিক শক্তি অসুরের মতন, দুজনেই পলাতক। আছেন রাজা নীলরতন হালদার নামে এক জমিদার যাঁকে এক ইংরেজ

ব্যবসায়ী মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় এবং তাঁর শাস্তি হয় সাত বছরের দ্বীপান্তর, তখন আন্দামানের মতন কিছু কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের মরিশাস দ্বীপেও পাঠানো হত। সৎ ও উচ্চশিক্ষিত এই মানুষটিকে সাধারণ কয়েদিদের মতন অশেষ যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আছে যদু নামে এক খেয়ানৌকোর মাঝি ও অন্যান্য অনেক কুলি। এই কুলিদের মধ্যে ছদ্মবেশধারিণী এক শ্বেতাঙ্গিনীর অবস্থান বিস্ময়কর। এই মেয়েটি জাতে ফরাসি। এর বাবা পিয়ের ল্যামবেয়ার ছিলেন কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের সহকারী কিউরেটর, ইনি নাস্তিক ও জ্ঞানান্বেষী, তাই এখানকার ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা ছিল না। একদা ঝড়ের রাতে তাঁর স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়, তখনই সেই প্রসূতিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু অত রাত্রে, দুর্যোগের মধ্যে কোনো যানবাহন পাওয়ার উপায় নেই, যদুর বাবার নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল, কোনোক্রমে রাজি করানো হয় তাকে। যদুরও তখন সদ্য জন্ম হয়েছে, সে মায়ের দুধ চায়। নৌকোটি কলকাতায় পৌঁছবার আগেই মাঝগঙ্গায় মহিলার সন্তান প্রসব হয়ে যায়, একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। যদুর মায়ের তৎপরতায় কন্যাটি বেঁচে যায় কোনওক্রমে। সে যদুর সঙ্গে সঙ্গে একই মায়ের দুধ খেয়ে বর্ধিত হয়। বাবা তার নাম রাখেন পলেত, যদুর মা ডাকেন পুতলি, কেউ কেউ পাগলিও বলে। গায়ের রঙে শ্বেতাঙ্গিনী হলেও সে অন্য সব দিক থেকে ডাল-ভাত খাওয়া বাঙালি। এই পলেত বা পুতলি কৈশোরে পৌঁছোবার আগেই অকস্মাৎ ল্যামবেয়ার সাহেবও মারা যান। তখন দেখা যায়, বাস্তব ও সাংসারিক জ্ঞানশূন্য এই সাহেবের সঞ্চয় কিছুই নেই। বরং বিস্তর ঋণ। তখন অবশ্য ইউরোপীয় সমাজের টনক নড়ে, একজন খাঁটি ইউরোপীয় মেয়ে অসহায় হলেও তো তাকে নেটিভদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এক ইংরেজ ব্যবসায়ী তাকে খিদিরপুরের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। পুতলি তখন পলেৎ হয়ে মেমসাহেবদের মতনই শিক্ষাদীক্ষা পায়, বাল্যকালের খেলার সঙ্গী যদুর সঙ্গেও আর যোগাযোগ থাকে না। ঘটনাক্রমে যদু ওই জাহাজে কুলি হিসেবে ভরতি হয়, আর পলেতও ওই মরিশাসগামী জাহাজে স্থান পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, কারণ সে শুনেছে, তার মা-বাবা একসময় ওই দ্বীপে থাকতেন। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গিনীর পক্ষে কুলি-লস্করদের মধ্যে ওই জাহাজের যাত্রী হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাই অত্যন্ত দুঃসাহসে, শাড়িতে সর্বাঙ্গ মুড়ে, পায়ে আলতা লাগিয়ে সে কোনোক্রমে কুলিদের মধ্যে মিশে যায়। এই উপন্যাসের পরবর্তী দুটি খণ্ডে মূল নায়িকা কে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে পলেত বা পুতলির সম্ভাবনাই বেশি মনে হয়।

জাহাজের বিভিন্ন স্তরে আছে নানা দেশীয় সব লস্কর এবং ক্যাপটেন ও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার। এদের মধ্যে প্রধান চরিত্র জাকারি রিড নামে এক সদ্য যুবা, যার গায়ের রং হাতির দাঁতের মতন হলেও মা-বাবা দুজনেই শ্বেতাঙ্গ নয়। তৎকালীন আমেরিকায়, চেহারায় যতই শ্বেতাঙ্গ হোক, জন্মসূত্রে সামান্য খুঁত থাকলে তাদের আর

খাঁটি সাহেবদের সমতুল্য বলে গণ্য করা হত না, মুলাটো বা অন্য কিছু বলা হত। তুচ্ছ এই ব্যাপার গোপন রাখা বা না-রাখা নিয়েও কাণ্ড হত অনেক।

কলকাতা ছেড়ে জাহাজ ভাসল সমুদ্রে। মরিশাস অভিমুখে। জাহাজ ভরতি কতরকম মানুষ, তাদের বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা। নীচের তলায় নিরক্ষর, দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবোধ কুলির দল, ওপরতলায় খালাসি-লস্কর ও শ্বেতাঙ্গরা। এতগুলি চরিত্র নিয়ে কাহিনি বুনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অমিতাভ ঘোষ।

পাঠক হিসেবে আমরা মাঝে মাঝে পিজিন (pidgin) ইংরেজি, নানারকম শব্দমিশ্রিত লস্করদের ভাষা ও কিছু কিছু গালমন্দ বুঝতে না পেরে হোঁচট খাই, তবু পরিবেশ ও কাহিনি অনুসরণ করা যায় ঠিকই। এবং পরবর্তী দুটি খণ্ডের জন্য তীব্র আগ্রহ জেগে থাকে।

বুকার প্রাইজের পর-পরই ঘোষিত হয় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। টাকার অঙ্কে বিপুল হলেও এই পুরস্কারটির মর্যাদা অনেক কমে গেছে। এর বিচারের মানদণ্ডের কোনো স্বচ্ছতা নেই বলে আমি নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে তেমন আগ্রহ বোধ করি না। দ্বিতীয় কথা, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদি কয়েকটি ভাষার গ্রন্থ মূল ভাষাতেই বিবেচিত হয়, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অনেক বৃহৎ ভাষা, যেমন চিনে, হিন্দি, বাংলা বইয়ের অত্যুত্তম অনুবাদ না হলে গ্রাহ্য করাই হবে না। চিনে, হিন্দি আর বাংলা পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ভাষার অন্তর্গত। অথচ এইসব ভাষা আমল পায় না, ফরাসি-জার্মান ইত্যাদি অনেক ভাষা বেশি গুরুত্ব পায়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার একাধিক লেখক পুরস্কার পেলেও চিনে ভাষার এক লেখককে পুরস্কার দিতে একশো বছরের বেশি সময় লেগে গেছে। হিন্দি ভাষায় আজও একজন লেখকও বিবেচ্য হননি। সুতরাং এই নোবেল পুরস্কারকে এখন আর বিশ্বসাহিত্য পুরস্কার বলা যায় না। তবু পুরস্কার ঘোষণার পর মনে হয় একবার পুরস্কৃত বইটি পড়ে দেখা যেতে পারে।

এ বছর পুরস্কার পেয়েছেন ফরাসি লেখক জাঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও। এঁর নাম আমি বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ দেখেছি, কিন্তু কোনো মৌলিক রচনা আমার পড়া ছিল না। কলকাতায় তাঁর একটিমাত্র বইয়েরই ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে, *ওনিৎসা* (Onitsha) নামের উপন্যাস।

কয়েক বছর আগে কলকাতা বইমেলায় ফরাসি দেশকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কয়েকজন ফরাসি লেখক ও বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন শহরে। ল্য ক্লেজিও তখন আসতে না পারলেও পরে এসেছিলেন। যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। তবে আমাদের প্রধান ভাষাবিদ চিন্ময় গুহর কাছে শুনেছি, মানুষটি খানিকটা একাচোরা, উদাসীন ধরনের। সভাসমিতি পছন্দ করেন না, হাওয়াই চটি পরে একাই ঘুরেছেন কলকাতার পথে। নিজের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ

হল কি হল না, সে বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ নেই। জন্ম ১৯৪০ সালে, বাবা ইংরেজ, মা ফরাসি, ল্য ক্লেজিও তাঁর লেখালেখির জন্য মাতৃভাষাটিই গ্রহণ করেছেন, যদিও পিতার ভাষাটিও ভালোই জানেন।

ওনিৎসা উপন্যাসটি অনেকটা ভ্রমণকাহিনিমূলক। এ উপন্যাসেও একটি জাহাজের ভূমিকা অনেকখানি। একটি কিশোর ফরাসি দেশের উপকূল থেকে এই জাহাজে তার মায়ের সঙ্গে যাচ্ছে আফ্রিকার উদ্দেশে। ছেলেটির নাম ফ্যাঁতাঁ বা Fintan, তার মায়ের নাম মারিয়া লুইজা, ছেলেটি অবশ্য তার মাকে মাউ বলে ডাকে। বাবাকে সে অনেক বছর দেখেনি, মুখটাও মনে নেই। সমুদ্র, আকাশ, জাহাজের মানুষের বর্ণনার মধ্য থেকে আস্তে-আস্তে মা ও ছেলের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খানিকটা আত্মজীবনীর আভাস থাকলেও এক্ষেত্রে ছেলেটির মা স্প্যানিশ। সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিন বছর পর। আফ্রিকার কয়েকটি বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে তারা পৌছয় নাইজিরিয়ায়। ছেলেটির বাবা যে শহরে থাকে, সেটিরই নাম ওনিৎসা। লেখক খুব সাবধানে ভ্রমণকাহিনি থেকে সরিয়ে এনেছেন উপন্যাসটিকে। একটি কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণিত হলেও এটি মোটেই কিশোর-উপন্যাস নয়, এর মধ্যে ফুটে উঠেছে আফ্রিকার জীবনের খুঁটিনাটি, কলোনিয়াল শাসনের ক্রূরতা ও অত্যাচার। ২০৬ পৃষ্ঠার উপন্যাসটি একটানে পড়ে শেষ করা যায়। এবং পড়তে ভালো লাগে, কোথাও কোথাও বাক্যবন্ধ মনে দাগ কেটে যায়। ব্যস, এই পর্যন্ত!

দ্য হোয়াইট টাইগার। অরবিন্দ আডিগা
হার্পার কলিন্স, নয়াদিল্লি
দ্য সি অফ পপিজ। অমিতাভ ঘোষ
পেঙ্গুইন ভাইকিং, নয়াদিল্লি
ওনিৎসা। জাঁ-মারি গ্যুস্তাভ ল্য ক্লেজিও
রূপা, নয়াদিল্লি

নাসরীন জাহান-এর সোনালি মুখোশ

নাসরীন জাহানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র বছর দেড়েক আগে। তার আগে আমি ওঁর কোনো লেখাও পড়িনি। একজন লেখকের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে অন্তত কিছুটা ধারণা যদি না থাকে, তাহলে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতাও ভাসা ভাসা হয়।

কেন নাসরীনের লেখা আমি আগে পড়িনি? বাংলাদেশে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও বই আমি পাই এবং পড়ি। তবে ইদানিং কয়েক বছর কবিতাই পড়ি বেশি এবং প্রবন্ধ। গল্প-উপন্যাস বিশেষ পড়া হয় না, তার কারণ সময়াভাব। অন্য প্রয়োজনে গত শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি এত বেশি পড়তে হচ্ছিল যে সাম্প্রতিক কালের গদ্যসাহিত্য থেকে আমাকে দূরে থাকতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। অন্য ভাষার সাহিত্যপাঠেরও ঝোঁক ছিল একসময়ে, এখন বেশ পিছিয়ে আছি। গত এক বছরে অমিতাভ ঘোষের *ক্যালকাটা ক্রোমোজোম*, অরুন্ধতী রায়ের *গড অফ স্মল থিংস*, আর মাইকেল ওনানডাতিয়ে'র *দা ইংলিশ পেশেন্ট* ছাড়া কিছুই পড়া হয়নি। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি!

গত নব্বই-একানব্বই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নিবাসী লেখকদের গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে আমার মোটামুটি পরিচয় আছে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্-র *লাল শালু* আমার মতে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি উপন্যাসের অন্যতম। বর্ষীয়ান সওকত ওসমান আমার প্রিয় লেখক। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন লেখক রশীদ করিম বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ বলে লিখতে পারছেন না, সেজন্য আক্ষেপ হয়। আবু ইসহাক-এর *সূর্য দীঘল বাড়ি* পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আনিস চৌধুরী, সুচরিত চৌধুরী, আবুবকর সিদ্দিক, রাবেয়া খাতুন, এঁদের ছোটোগল্প পড়েছি। উপন্যাস পড়ার সুযোগ হয়নি। সাংবাদিক হিসেবে প্রখ্যাত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী চমকপ্রদ গল্প-উপন্যাস লেখেন। প্রধানত কবি ও নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক ঔপন্যাসিক হিসেবেও সার্থক। কবি আল মাহমুদও ইদানিং গল্প রচনা করছেন। শামসুর রাহমান কিশোরপাঠ্য *স্মৃতির শহর* ছাড়া গল্প-উপন্যাস কিছু লেখেন না বলেই জানি। শওকত

আলী বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গির; জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রাহাত খান, বিপ্রদাস বড়ুয়া— এঁদেরও কিছু কিছু রচনা মনে দাগ কেটে আছে। মাহমদুল হক-এর নাম মনে পড়লেই মাথা নাড়তে ইচ্ছে করে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পরিশীলিত ভাষা ছিল এই লেখকের, *জীবন আমার কেন* ও আরও কয়েকটি চমৎকার লেখা লিখেছেন, তারপর হঠাৎ গুরুবাদী হয়ে সাহিত্য রচনা ছেড়ে দিলেন।

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে আছেন হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও সেলিনা হোসেনের মতন লেখকরা। এঁরা জীবনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন, সামাজিক অবক্ষয় ও শ্রেণিবৈষম্য এঁদের প্রধান বিষয়বস্তু, ব্যক্তির বদলে সমষ্টিই এঁদের লক্ষ্য। হাসান আজিজুল হক পশ্চিমবাংলাতেও বিশেষ পরিচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি লেখেন খুবই কম। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলে কোঠার সেপাই* ও *খোয়াবনামা* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাষা, বিশেষত শেষ গ্রন্থটিতে অকারণ জটিল এবং নীরস। এই লেখকের অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। সেলিনা হোসেন গ্রামবাংলার জীবনের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন, ইদানিং তার তুল্য রচনা বিশেষ পাওয়া যায় না।

অন্যধারার প্রতিনিধি হুমায়ূন আহমেদ এবং ইমদাদুল হক মিলন। এঁদের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। চলমান জীবন থেকে আহরণ করেন কাহিনি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাদের আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, বেদনা ও হর্ষের চিত্র পাঠকদের মুগ্ধ করে রাখে। অনেককাল আগে হুমায়ূন আহমেদ যখন অল্পপরিচিত প্রতিশ্রুতিমান তরুণ লেখক, তখন তাঁর *নন্দিত নরকে* নামে উপন্যাসটি সম্পর্কে আমি *দেশ* পত্রিকায় লিখেছিলাম। তাঁর ভাষা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এখনকার হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়তার রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বলা যায়। হুমায়ূন আহমেদ সর্বকালের বাংলাভাষায় জনপ্রিয়তম লেখক, তাঁর এক-একটি বইয়ের বিক্রির সংখ্যা শরৎচন্দ্রের চেয়েও বেশি। ইমদাদুল হক মিলন অতি অল্প বয়েস থেকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন, এখনও তিনি বয়েসে তরুণ। তাঁর সহজ ও কাব্যময় ভাষা প্রথম থেকেই মনোযোগ দাবি করে। গ্রাম ও শহর, যে-কোনো পটভূমিকাতেই তিনি কাহিনি নির্মাণ করতে পারেন, যেমন আবেগময় প্রণয়কাহিনি, তেমনই জীবনের নিষ্ঠুর দিক ফুটিয়ে তুলতেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

মাঝখানে কবি তসলিমা নাসরিন কিছুদিন গদ্য লিখে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলম বা ওই ধরনের রচনায় যে দুঃসাহস, ধারালো গদ্য ও রণং দেহি মনোভাবের জন্য সমস্ত শ্রেণির পাঠকদের নজর কেড়েছিলেন, সেই তুলনায় তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিকে সার্থক বলা যায় না।

বাংলাদেশে আরও অনেক শক্তিশালী গদ্যলেখক নিশ্চিত আছেন, সকলের লেখা

আমি পড়িনি, কিংবা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমি অবশ্য বাংলাদেশের গদ্যসাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে বসিনি, তাই ধারাবাহিক পূর্বাপর বিবরণ দেবার দায় নেই।

বাংলাদেশে প্রায়ই যাই। হয়তো রক্তের টানে, কিংবা মাটির টানে অথবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপচারীর টানে। দু-তিন বছর ধরে সেখানে সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি নাসরীন জাহানের লেখা পড়েননি? আমাকে বলতেই হয়েছে যে, না পড়িনি, নামও শুনিনি। নাসরীন জাহান লিখতে শুরু করেছেন কিংবা বলা ঠিক যে পাঠকদের সমক্ষে এসেছেন মাত্র পাঁচ-ছ বছর আগে, এই সময়টার মধ্যে কোনো নতুন বাংলা উপন্যাসই আমার ছোঁওয়া হয়নি। তাঁর উড়ুক্কু নামের উপন্যাসটি পুরস্কৃত হয় পাঁচ বছর আগে। নাসরীন জাহানের জন্ম ১৯৬৪ সালে, ময়মনসিংহে। গত বছর তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ও হল। সপ্রতিভ অথচ মৃদুভাষী এই তরুণী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বেশ ভালোভাবে তৈরি হয়ে এসেছেন, তা বোঝা যায়।

উড়ুক্কু উপন্যাসটি পেয়ে আমি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পথে গাড়িতেই পড়তে শুরু করি। পুরোটা পড়া হল না, বইটা কী করে যেন হারিয়ে গেল। সেজন্য ছটফট করছিলাম, পরে বইটি শেষ করি। তারপর পড়েছি *যখন চারপাশের বাতিগুলি নিভে আসছে*। সদ্য শেষ করলাম, *সোনালি মুখোশ*।

উপন্যাসটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৬। ইদানিং সাময়িকপত্রের বিশেষ সংখ্যায় উপন্যাস প্রকাশের রীতির জন্য অধিকাংশ উপন্যাসই ছোটো ছোটো হয়। কিংবা বলা যায় প্রলম্বিত বড়ো গল্প। সেই তুলনায় *সোনালি মুখোশ*-কে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসটি পাঠ করে নিশ্চিত বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে নাসরীন জাহান নিজস্ব স্থান করে নেবার জন্যই এসেছেন। যদি না অন্য আকর্ষণ তাঁকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ব্যাংক কর্মচারী আফজালের স্ত্রী নিশি, সে এখনও মা হয়নি, সারাদিনে অনেকখানি অবসর, তাই কলেজে পড়াশোনো চালিয়ে যাচ্ছে। আপাত প্রেমময় স্বামী দুপুরেও অফিস থেকে ফোন করে স্ত্রীর খোঁজ নেয়। কলেজ বন্ধ থাকলেও দুপুরে অন্য কোথাও যায় নিশি, স্বামীকে সে মিথ্যে কথা বলে। তুচ্ছ মিথ্যে, কিন্তু সেই মিথ্যে সামলাবার জন্য আবার মিথ্যে। একজন বিবাহিতা নারীর যেন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকতে নেই। সে ইচ্ছেমতন কোথাও যেতে পারবে না, স্বামীকে কৈফিয়ত দিতে হবে। শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারে অবশ্য তাকে কৈফিয়ত বলে না, উদার স্বামীরা বলেন, তোমার কোথাও যাবার ইচ্ছে হলে তুমি অবশ্যই যাবে, কিন্তু আমাকে জানিয়ে গেলেই পার। অর্থাৎ স্ত্রী কার সঙ্গে মিশবে না মিশবে, তা স্বামীকে জানাতে হবে। স্বামী অফিস থেকে দেরি করে ফিরলে স্ত্রীর পক্ষে প্রশ্ন করা চলে না। কারণ স্বামীর উপার্জনে সংসার চলে।

নিশির অবশ্য এক পূর্ব-প্রেমিক আছে। তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও

সে যদি অসুস্থ ও মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, তাকে একবার হাসপাতালে দেখতে যাওয়া কি অপরাধ? অথচ সে-কথা স্বামীকে জানানো যায় না। সুতরাং নিশিকে মিথ্যে বলতেই হয়।

এটা ব্যক্তিজীবনের মিথ্যে। আবার অনেক রকম সামাজিক মিথ্যেও আছে। নিশির এক বাল্যসখার নাম জাহিদ। তার ধারণা, প্রত্যেক মানুষের একটা জন্মদাগ আছে। সরল কৌতূহলে সে নিশির শরীরের জন্মদাগ দেখতে চেয়েছিল, নিশি তা দেখাতে রাজি হয়নি, তাই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কবি, ভাবুক, ছন্নছাড়া জাহিদ শহর ছেড়ে এক নিতান্ত গ্রামে চলে আসে তার বাবার এক মিথ্যের অন্বেষণে। সেখানে সে এক উৎকট সামাজিক মিথ্যের সম্মুখীন হয়। সেই গ্রামে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে যে একদিন কবরখানা থেকে এক বিশাল অজগর সাপ বেরিয়ে এসেছিল, যার দুটো মাথা, একটি মাথা আবার এক মৃত মানুষের মতন। সেই অজগর উঠে এলেই গ্রামে শুরু হয়ে যায় রোগ, মহামারি, অমঙ্গল। সেই গ্রামের মোল্লা গ্রামবাসীদের ওপর এই কুসংস্কার চাপিয়ে রেখেছে বছরের পর বছর, কারুর অসুখ করলেও চিকিৎসা করতে দেয় না, তাবিজ-মাদুলি মোল্লার কাছ থেকে নিতে হয়। কবিতা লেখা ছেড়ে জাহিদ যখন ওই উদ্ভট কাহিনি ও কুসংস্কার ভাঙার চেষ্টা করে, তখন সে দেখতে পায় চতুর্দিকে লকলক করছে আরও বহুরকম মিথ্যে।

নিশি ও জাহিদ শহর ও গ্রামে অবস্থিত এই দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে কাহিনি। ক্রমশ একটু একটু করে উন্মোচিত হয় যে যতগুলি চরিত্র আসছে যাচ্ছে, তারা প্রায় প্রত্যেকেই মিথ্যের সোনালি মুখোশে মুখ ঢেকে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। নিশির স্বামীকে প্রথমে মনে হয়, সৎ ও খেটে খাওয়া মানুষ, কিন্তু তারও রয়েছে মিথ্যে দিয়ে ঢাকা একটি অন্য জীবন। মানুষ ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়েও মিথ্যে কথা বলে। অন্যকে বাঁচাবার অছিলায় মিথ্যে কথা বলে। সত্যাভিমানীর মুখ দিয়েও মিথ্যে কথা বেরিয়ে আসে। নিশির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও সমব্যথী স্বাতী, সেও নিশিকে আঘাত দেবার জন্য সত্য প্রকাশের নামে মিথ্যের জাল বোনে। নিশির পূর্ব-প্রেমিক শাহিদুল, যাকে মনে হয় সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ, সে কোনো কারণে জেলে গিয়েও নিশির একটি সেফটিপিন লুকিয়ে রেখেছিল সযত্নে, ওই সামান্য জিনিসটি নিয়েই সে ছিল স্মৃতি-মশগুল হয়ে, সেও হঠাৎই একসময় মিথ্যে-মানুষ হয়ে ওঠে। এমনকি নিশির মা, যিনি আজীবন মিথ্যেকে ঘৃণা করেছেন, তিনিও জামাতার কাছে অনর্গল মিথ্যে বলে যান।

মিথ্যের শিল্প যে জীবনের অঙ্গ, সেটাই নাসরীন ফুটিয়ে তুলেছেন স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ, আধুনিক ও পূর্ব-দায় বর্জিত। গ্রামের মোল্লা, বোর্ডের চেয়ারম্যান, এরা কেউ একরঙা চরিত্র নয়, নিছক মন্দ বা ভালো নয়, জটিল। মমতাদি, রিনি, রোজলিন, রেজা, মুসতাফা, হীরা, সন্দীপন এইসব চরিত্রগুলি ছোটো ছোটো টানে ফুটিয়েছেন মুনশিয়ানার সঙ্গে। তবে মাঝে মাঝে কিছু অতিনাটকীয় ঘটনা এসে গেছে, বাস্তব-বিশ্বাসযোগ্য জীবনের বর্ণনার সঙ্গে তা যেন ঠিক খাপ খায় না।

নাসরীন জাহানের ভাষা ঝংকারময়। উদাহরণ : 'ঠাণ্ডা খাদ্য কণাগুলোর সবই যেন মৃত। নিশি খাদ্য নয়, এক একটা যেন মরা মুণ্ডু খায়। এরপর খুঁজতে থাকে বাঁশি, সশব্দে জেগে উঠুক খাদ্য কণাগুলো। এরা প্রত্যেকেই প্রেত রূপ ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ুক তার ওপর, যে পয়সা দিয়ে কিনে এনেছে, তার মুখ-কান-শরীর দুমড়ে মুচড়ে এক করে দিক, ভাবতে ভাবতে নিশির ক্রুদ্ধ কম্পিত শরীর টান টান হয়ে ওঠে।' কোথাও কোথাও অবশ্য আবেগ কিছু বেশি এবং অলংকারবহুল।

বাক্যগঠন মাঝে মাঝে বাধার সৃষ্টি করে : 'সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যেটা, দু'মাথা অজগর সম্পর্কে সে অবিশ্বাস পোষণ করে, এক দিন বলে হাচাই আপনে দেখছেন? অজগরের মাথা আবার মানুষের মতো অয়নি? আপনের মতন লোক মিছা কইলে আল্লায় মানবে ক্যান? আবদুল খালেকের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উল্টোপাল্টা লেগে যায়। সে সুফিয়ার মুখ চেপে বলে, তওবা কর, তওবা। এরপর উন্মুক্ত উঠানে এসে লম্বা শ্বাস টানে, হে আল্লাহ দুধের শিশু, ক্ষমা কইরা দ্যাও।' একই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বর্ণনা ও দুজনের সংলাপ বুঝতে অসুবিধে হতে পারে। হয়তো এই লেখিকা নিজস্ব একটা গদ্যরীতি তৈরি করতে চান, কিন্তু সর্বত্র এ রীতিও মানা হয়নি। তাই কিছুটা অমনোযোগী বা এলোমেলো মনে হয়।

এহ বাহ্য। এই উপন্যাস একজন অল্পবয়েসি লেখিকার পাকা হাতের রচনা। শুধু কাহিনি নয়, এর মধ্যে আছে জীবনের গূঢ় অনুসন্ধান।

হাসান আজিজুল হক এক জায়গায় লিখেছেন, '(পশ্চিমবঙ্গে) বাংলাভাষার সাম্প্রতিক সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ আলোচনার সময় এমন একটা অনপেক্ষ ও চূড়ান্ত মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়, যাতে বোঝা যায় যে সমগ্র বাংলা সাহিত্য বলতে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যকেই বিবেচনা করা হচ্ছে।' ঠিকই লিখেছেন। আবার বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাতেও দেখতে পাই, যদিও সেখানে পশ্চিমবাংলায় রচিত সাহিত্য যথেষ্টই পড়া হয়, তবু সাহিত্যের ইতিহাসধর্মী রচনায় শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যধারারই উল্লেখ থাকে। কেন এরকম ঘটছে, এর ভালোমন্দ বিষয়ে আলোচনায় আমি এখন যাচ্ছি না। আমি অন্তত এখনও, যে যেখানে বসেই বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করুন না কেন, তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত মনে করি। সেই সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নাসরীন নিজস্ব স্থান দখল করার জন্য এসেছেন। পশ্চিমবাংলার উৎসাহী পাঠকরা যদি এঁর লেখা না পড়েন, তাহলে নিজেরাই বঞ্চিত হবেন।

ভূমিকা : বাংলা গল্প সংকলন ৪

বাংলাভাষায় যাঁরা তরুণ গল্পকার হিসেবে পরিচিত, যদিও তাঁরা অনেকেই এর মধ্যে মধ্যবয়েসে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের জন্ম স্বাধীনতার কিছু আগে কিংবা কিছু পরে। অর্থাৎ চল্লিশের দশকের ভয়াবহ দিনগুলি, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধভীতি, সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি ও দেশবিভাগ, এসব সম্পর্কে এঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তাঁদের চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে এক স্বাধীন দেশে, যে স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক স্বপ্ন, অনেক ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। নতুনভাবে দেশ গড়া হবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সমস্ত চোরাকারবারিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে, এদেশের নাগরিকদের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য থাকবে না, ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে আনা হবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-পরিষেবার সমান অধিকার পাবে সমস্ত মানুষ। কিন্তু হায়, তৎকালীন কিশোর-কিশোরীরা তেমন সোনালি দিন দেখার সুযোগ পায়নি। বরং দেখেছে চতুর্দিকে হতাশার চিহ্ন। অগণন উদ্‌বাস্তুদের স্রোত অব্যাহত, ফুটপাথে, রেলস্টেশনে, গাছতলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিবার, ভেঙে পড়ছে অনেক মূল্যবোধ, গ্রামাঞ্চলে প্রকট হয়েছে অঘোষিত দুর্ভিক্ষ। চোরাকারবারিরা শাস্তি পাবার বদলে আরও শক্তিশালী হয়ে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। রাজনীতি অনুপ্রবেশ করেছে সর্বস্তরে।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের হয়তো অভুক্ত থাকা কিংবা শুধু ভাতের ফেন ও আলুসেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা হয়নি, কিন্তু তাদের বুক জুড়ে থেকেছে আশাভঙ্গের বেদনা। সেই বয়েসে এই বেদনাই সবচেয়ে মর্মান্তিক।

কৈশোর হচ্ছে আবিষ্কারের বয়েস। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে যখন সে চোখ মেলে তাকাতে শুরু করে তখন যেমন জীবনযাপনের অনেক সত্য তার কাছে আস্তে আস্তে

ধরা পড়ে, তেমনই নিত্যনতুন মানুষকে দেখাও এক-একটি আবিষ্কারের মতন। প্রত্যেকটি মানুষই এক-একটি চলন্ত কাহিনি, কখনো-কখনো তা বেশ দুর্বোধ্য এবং যত দুর্বোধ্য হয়, ততই কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। এবং তাতেই সমৃদ্ধ হয় অভিজ্ঞতা।

এ কথা ঠিক, যে-কোনো চরিত্র কিংবা ঘটনা নিয়েই গল্প রচনা সম্ভব। তবু প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব একটা নির্বাচন থাকে, জীবনপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করতে করতে হঠাৎ একটা ঝিলিক দেয়। এই নির্বাচন বা ঝিলিক দেশ ও কালের পরিবেশের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অনেকটাই আচ্ছন্ন করে আছে নৈরাশ্য। তারপর শুরু হয় প্রতিবাদ ও ক্রোধের বিস্ফোরণ। যাঁদের ওপর সুস্থ, সুন্দর দেশগঠনের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন না করে ভাবের ঘরে চুরি-ডাকাতি করছিলেন বলে যুবসমাজের এক অংশ সবকিছু ভাঙার খেলায় মেতে ওঠে। বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত লেখকদের সাহিত্য রচনার সূচনাপর্বে এরকমই ছিল পটভূমিকা।

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত এই গল্প সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে যেসব লেখকদের জন্ম ১৯৪০ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে, তাঁদের থেকেই নির্বাচন করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে অনেক শক্তিশালী লেখক-লেখিকা এসেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে। এই নির্বাচন মোটেই সহজসাধ্য নয়, আবার গ্রন্থের পরিসরও যত খুশি বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। সেজন্য সব সংকলনেই কিছুটা অপূর্ণতার বোধ থেকে যায়।

এই সংকলনের সবকটি গল্প একসঙ্গে পড়লে একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের বিস্মিত করে। ইদানিং প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে, বাংলা কথাসাহিত্য বড়ো বেশি শহরকেন্দ্রিক। শহর বলতে তো কলকাতা, শিলিগুড়ি কিংবা বর্ধমানও অবশ্যই শহর, আকারে-প্রকারেও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ওদের গায়ে যেন এখনও মফস্‌সলের গন্ধ লেগে আছে কিছুটা। এই সংকলনের মোট ৩৪টি গল্পের মধ্যে মাত্র এগারোটি ছাড়া আর সব কাহিনিরই পটভূমিকায় আছে গ্রাম। সুদূর সেইসব গ্রাম একেবারেই শহরের সংস্রববর্জিত এবং মানুষগুলির মুখের ভাষাও আঞ্চলিক।

সমরেশ মজুমদারের গল্পের চালচিত্রটি যদিও শান্তিনিকেতনের, তবু এটি একটি নাগরিক মানসিকতারই কাহিনি। এর নায়ক একজন মধ্যবয়স্ক, মোটামুটি সার্থক চলচ্চিত্রশিল্পী, তবু তাঁকে মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট বিপদে ভুগতে হয়। কাহিনির দু-প্রান্তে রয়েছে অন্য দুটি চরিত্র। একজন ভোটপ্রার্থী রাজনেতিক নেতা, আর-একজন অল্পবয়েসি বাউল। রাজনৈতিক নেতাটির প্রতি যে তীব্র বিরাগ প্রকাশ পেয়েছে নায়কের, তা ওই বিশেষ নেতাটির কোনো দোষের জন্য নয়। স্বাধীনতার স্বপ্ন যারা বিফল করেছে, ওই নেতাটি তাদেরই প্রতিনিধি। তিক্ততা মুছে ফেলে চিত্তের শুদ্ধতা আনার জন্যই কাহিনির নায়ক এক খুদে বাউলের

সঙ্গে প্রকৃতির লীলা দেখতে যায়।

সুবিমল মিশ্রের দীর্ঘ নামের গল্পটিতে অতিবাস্তবতার সঙ্গে মিশে গেছে পরাবাস্তবতা। অসহায় স্ত্রীলোকটির লাশ ভাসতে থাকে, ভেসে ভেসে সর্বত্রগামী হয়, এই সর্বত্রগামিতা বোঝাবার জন্যই সোনার গান্ধীমূর্তির অবতারণা। নবারুণ ভট্টাচার্যের কাহিনিতেও অল্প খানিকটা পরাবাস্তবতার ছোঁয়া। এক খুনির ভাইয়ের সঙ্গে এক সিনেমা হলে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখার মতন সাধারণ ঘটনারও উত্তরণ ঘটে যায়, যখন অন্ধকার ময়দানে এই দুজন একই মোটরসাইকেলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।

সুব্রত সেনগুপ্তের 'সুলেমানের বিচার' গল্পে সুলেমান নামে অতি গরিব মানুষটিকে তার জীবিকা আর বিবেকের মাঝখানে একটা প্রশ্নচিহ্নের মতন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলরাম বসাকের বরাবরই পরাবাস্তবতার দিকে ঝোঁক, এই কাহিনিতেও এক অসুস্থ রমণীর রোগ বর্ণনার চেয়েও নানা রঙের খেলাই প্রাধান্য পেয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ফেরার অন্ধকারে লেগেছে খানিকটা কবিত্বের স্পর্শ। শৈবাল মিত্রের কাহিনিতে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষটি স্বার্থপরের মতন একদিন একটা আস্ত ইলিশ মাছ খেতে চেয়েছিল, চুপিচুপি, রাত্তিরবেলা। একে একে তার বুড়ো বাবা, ভাই-বোনেরা চলে আসে, সকলেরই চোখে লোভ, শুধু তার মা ইলিশ ভেজে সবাইকে দিলেও নিজে খেতে চান না। মূল্যবোধের সামান্য একটু জ্যোতি সেখানেই থেকে যায়। যেমন শিবতোষ ঘোষের রচনায় এক যৌথ পরিবারের ভেঙে যাওয়ার কাহিনিতে শিশুদের মধ্যেও দেখা যায় সেই ফাটলের দাগ।

অভিজিৎ সেন-এর 'দেবাংশী' আর ভগীরথ মিশ্রর 'ইন্দর যাগ' গল্পের পরিবেশ আলাদা, গঠনও পৃথক। তবু এক জায়গায় কিছুটা মিল আছে। দুটি গল্পেরই মূল চরিত্র গ্রাম্য গুণিন, যাদের ওপর এখনও অনেক মানুষের আছে অন্ধবিশ্বাস। অভিজিৎ সেনের কাহিনিটি অনেক বিস্তৃত এবং বাস্তবসম্মত। কিন্তু শেষের দিকে আছে কিছুটা প্রগতিশীলতার ইচ্ছাপূরণ। আর ভগীরথ মিশ্রের গল্পের শেষটি ইঙ্গিতময়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফড়িং হইল পক্ষী' গল্পে আছে এক ভূমিহীন কৃষকের সরকারি জমি পাওয়ার আশায় ব্যর্থ হয়রানির কাহিনি। আমরা সবাই জানি, এরকম ঘটনা আজও কঠোর বাস্তব। এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে গেলে অনেকেই শুধু করুণরস কিংবা রৌদ্ররস অবলম্বন করেন, তপন এ কাহিনিকে মুড়ে রেখেছেন কৌতুকে, তার সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে শ্লেষ, এখানেই তপনের আধুনিকতা। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিন্দুক' গল্পে রয়েছে নির্লিপ্ততা। বাদা অঞ্চলের এক পড়ন্ত পত্তনিদার, এককালে যাদের ছিল কাছাড়িবাড়ি, পাইক-পেয়াদা, যত না ঐশ্বর্য তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা, সাধারণ মানুষকে পায়ের তলার

দাপট, যথেচ্ছ নারীভোগের অধিকার। এখন তো সবই প্রায় গেছে, পঞ্চায়েত-গণসংগঠন-সমন্বয় কমিটি তাদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। সাধারণত বেশির ভাগ গল্পেই এদের দেখা হয় নীচুতলার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তাদের চোখে এরা একেবারে আদর্শ ভিলেন। ঝড়েশ্বরের গল্প এক ক্ষমতাহীন, বৃদ্ধ পত্তনিদারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, দোষগুণ সমন্বিত একজন মানুষ, এখনও লোভ আছে, সামর্থ্য নেই, পুরোনো দিনের স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে, আবার এখনও কিছু কিছু মানুষ তাকে অপছন্দ করে না, কোথাও রয়ে গেছে পুরোনো অনুগত্য, এই নির্মোহ বর্ণনাই গল্পটিকে আকর্ষণীয় করেছে।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষা এবং বর্ণনার আঙ্গিক নিয়ে অনবরত পরীক্ষা করে চলেছেন। 'অংশগ্রহণ' গল্পে লেখক নিজেই কাহিনির সঙ্গে কখনও যুক্ত, কখনও বিযুক্ত হয়ে ন্যারেটিভ স্টাইলকে ভাঙছেন। বেঁচে থাকাটাই একটা হিংসাত্মক ঘটনা। এটাই যেন মূলকথা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যর 'আত্মজা' এক নিষ্ঠুর সত্য ও মর্মন্তুদ উপলব্ধির কাহিনি। বৃদ্ধা মা দীর্ঘকাল অসুস্থ, শয্যাশায়ী, বাক্‌শক্তিহীন। এই মায়ের প্রতি সন্তানের যতই ভালোবাসা থাক, তবু মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি একসময় হয়ে ওঠেন অসহ্য বোঝা। এবং একসময় এই মায়ের মৃত্যু তো খাঁটি শোকের বদলে স্বস্তিই এনে দেয়। সুচিত্রা খুব নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন এই বাস্তবতা, তবে একেবারে শেষে, মৃত মায়ের ছবিকে দিয়ে কথা বলানো হয়তো অতিরিক্ত ভাবালুতা হয়ে গেছে, হয়তো সামান্য ইঙ্গিতেই তা বোঝা যেত। জয়া মিত্রর 'দ্রৌপদী'ও একটি মৃত্যুর ফলে সম্পর্ক বদলের কাহিনি। দিদির মৃত্যুর পর ছোটো শ্যালিকার সঙ্গে জামাইবাবুর বিয়ের মতন ঘটনা আকছারই ঘটে থাকে, কিন্তু এটা পুরুষরা যত সহজে মেনে নিতে পারে, মেয়েদের পক্ষে কি তা সম্ভব?

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'পাথরের চোখ' গল্পটিও মৃত্যু সম্পর্কিত। আশ্চর্য ব্যাপার, তিনজন লেখিকাই লিখেছেন তিনটি মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। অনিতার গল্পেও এক বৃদ্ধা মা। ভাগের মা যেমন গঙ্গা পায় না, তেমনই এই মাকে নিয়েও ঠেলাঠেলি হয় বিভিন্ন ছেলের সংসারে, দাদা এসে মাকে রেখে চলে যায় অনিচ্ছুক ছোটো ছেলের কাছে। সংসারের কোনো কাজে সাহায্য করার সামর্থ্যও নেই সেই অচল বৃদ্ধার, পুত্রবধূর চোখের বিষ। তারপর তাঁর মৃত্যু নেমে এসে স্বস্তি ও শান্তি। এরই মধ্যে অপরাধবোধ ও চাপা বিষাদ ভালো ফুটেছে অনিতার ভাষায়।

মীনাক্ষী সেনের 'পারুল বিশ্বাসের মৃত্যু সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট' অনেকটা কেসহিস্ট্রির বয়ানে লেখা, অল্পবয়েসি বধূ, শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার। এ কাহিনি আমাদের পরিচিত। ছুতো যাই হোক, অত্যাচারের ধরন প্রায় সব পরিবারেই একইরকম। পেছনে থাকে অর্থলোভ। কিছুদিন অত্যাচারের পর খুন। এক্ষেত্রে থানা-পুলিশদের হাত-করা, বাপের

বাড়ির অসহায়তার জন্য অপরাধীরা কোনো শাস্তিও পেল না। স্মৃতি থেকেও হারিয়ে গেল পারুল।

গ্রামের নানান দারিদ্র্য, হিংস্রতা ও অমানবিকতার কথা পড়তে পড়তে হঠাৎ রাধানাথ মণ্ডলের 'শীতের মানচিত্রে'র মতন সহজ, সরল গল্পটিতে যেন একঝলক টাটকা বাতাসের স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায়। এ কাহিনিতে সমস্যা একটাই। মহিম নামে স্কুল বালকটি কিছুতেই পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। শীতকালে নরম রোদ থেকে শুরু করে আরও কত কিছু উপভোগ করা যায়। আবার এই শীতকালেই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয়। এবারেও সে তিন বিষয়ে ফেল। কিন্তু এই মহিম যদিও অঙ্ক একেবারেই পারে না, ব্যাকরণই মাথায় ঢোকে না, মনে রাখতে পারে না শব্দের বানান, কিন্তু সে ভূগোলে খুব চৌকস। বাংলায় একজন পাড়াগাঁর ছেলে হয়েও সে এই নিখিল বিশ্বকে জানতে চায়। তার খুব শখ একটা গ্লোব কেনার। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'বাদ্যকর'ও গ্রামের গল্প হলেও অন্য স্বাদের। ইলামবাজারের শ্রীপতি বাদ্যকর সন্ধের পর হাঁটাপথে যাচ্ছিল পেঁচালিয়া গ্রামের দিকে, মাঝে পড়বে, 'ভুলো লাগার মাঠ', এখানে অনেকেই পথ হারায়। শ্রীপতি পথ হারায়নি, সে দেখা পেয়েছিল এক যুবতীর, যাকে প্রথমে মনে হয়েছিল অশরীরী, অলৌকিক। তা নয়, সে এমনিই এক গ্রাম্য মেয়ে, কিন্তু বাড়ির শাসন মানে না, একা একা ঘুরে বেড়ায়। কী যেন সে খোঁজে। দু-বছর পর শ্রীপতি আবার সেই গ্রামে এসে দেখল, ময়না নামে সেই মেয়েটি আর অন্ধকার মাঠে ঘুরে বেড়ায় না, সে বিয়ে করে অতি সাধারণ হয়ে গেছে। বাজিকরের বাঁশিটি পড়ে থাকে একপাশে।

আবুল বাশার-এর 'অন্য নকশি' এক জটিল মানসিকতার কাহিনি। ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের মধ্যে কেন এত দূরত্ব আনে, জ্বালিয়ে তোলে হিংসা, এর দ্বারা মানুষ কেন স্বেচ্ছায় অন্ধ হতে চায়, সেসব প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। একদিকে এক ফকির, অন্যদিকে মৌলবাদী। যে মৌলবাদীর সাইকেলের চাকার 'এক রিমে ভারতবর্ষের কাদা, অন্য চাকায় বাংলাদেশি কাদার ন্যাড়'। তবু হাজার মৌলবাদীদের আক্রমণেও ফকিররা শেষপর্যন্ত হার মানে না।

অমর মিত্রের 'দানপত্র' গল্পেও আছে অপরাজেয় মানুষের কথা। সাহেবমারি বাস্কে মহাশয়, যাঁর এক পূর্বপুরুষের নামও সাহেবমারি বাস্কে এবং এক অধঃপুরুষের নামও ওই, তিনি মেঘ, অরণ্যময় পৃথিবী ও জন্মদাত্রী মৃত্তিকাকে দান করে যাচ্ছেন তাঁর উত্তরপুরুষের নামে। বলাই বাহুল্য, এর কোনো কিছুই তাঁর অধিকারে নেই, তবু আদিবাসী হিসেবে তিনি এই আদি ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী। এই রচনা আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের এক গোষ্ঠীপতির আকাশ, নদী, অরণ্যের ওপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক

ঘোষণার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নলিনী বেরা-র 'ঘোড়া ও সরষেদানা' গল্পটিতে আছে আলবেয়ার কামুর কিছুটা উদ্ধৃতি, এই প্রতিদিনের ঘরোয়া পৃথিবী ও অচেনা বিশ্বে মানুষের অবস্থান বিষয়ে একটি আপ্তবাক্য। আপাতভাবে এই উদ্ধৃতির সঙ্গে গল্পটির মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তবে গল্পটি অবশ্যই মৌলিক ও বিচিত্র রসের। মফস্‌সলের রিটায়ার্ড শিক্ষক, রচনা প্রতিযোগিতা, মেয়ে রঞ্জনা বাবাকে লেখার জন্য নিয়মিত তাড়া দেয় এবং হঠাৎ একদিন 'আসছি' বলে এক মোটরবাইক আরোহীর সঙ্গে নিরুদ্দেশে চলে যায়। ব্যাকুল বাবা-মা অপেক্ষায় থাকতে থাকতে সেই মোটরবাইককে বানিয়ে ফেলে ঘোড়া, আর ঘোড়ার সঙ্গে সরষেদানার সম্পর্ক থাকেই। মানব চক্রবর্তীর 'কর্নেলের গোলাপ চারা' গল্পের কর্নেল চরিত্রটি দুর্বোধ্য, যিনি নানা ধরনের ফুল ও সাপ সম্পর্কে সমানভাবে আগ্রহী।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'গণেশ' এক অবিস্মরণীয় কাহিনি। গুণিনদের চিকিৎসা ইত্যাদির ছলনার চেয়ে শত হস্ত দূরে। যদিও অল্পবয়েসি বোকাসোকা নাক লম্বা গণেশকে দিয়েও এসব করানো হয়েছে। এ ঠিক প্রতীকী কাহিনিও নয়, কল্পবিজ্ঞান ধাঁচেরও নয়। বলা যেতে পারে দশম রস। কিন্নর রায়ের 'মায়াযান'কে বরং কিছুটা কল্পবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ তাঁদের মৃত্যুর অনেক বছর পরে একসঙ্গে এসেছেন ঘাটশিলায়। দুজনে গল্প করতে লাগলেন সুবর্ণরেখার পাশে কুমির পাথরে বসে। সৈকত রক্ষিত 'শবর চরিত'-এ এমন সব মানুষের জীবনকথা লিখেছেন, যা শহুরে পাঠকদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। একদল মানুষ একটা বড়ো সাপ ধরতে পেরে আনন্দে হইহই করে গ্রামে ফিরছে, অনেকদিন পর তারা ভালো খাবার খাবে। অনিল ঘড়াই-এর 'বালিগড়'ও খাওয়ার কাহিনি, বালিগড় মানে এক ধরনের সামুদ্রিক কচ্ছপ, তা ধরা কিংবা বিক্রি করা বেআইনি। কিন্তু দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের কাছে এসব আইন অবান্তর। অনেক সময় এই কাছিম ধরে পেট কাটার পর দেখা যায়, রয়েছে সারিবদ্ধ অনেকগুলি ডিম। যে স্ত্রীলোকটি এই ডিমওয়ালা কাছিমটিকে কেটে কেটে রান্নার জন্য তৈরি করছে, সে নিজেও গর্ভবতী।

চরিত্র সৃষ্টিতে সুদক্ষ রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মানুষের ইতিহাস' আসলে ইতিহাসের ভেতরকার কালো গহ্বর। অল্প কয়েকটি আঁচড়ে রামকুমার ফুটিয়ে তুলেছেন স্বদেশি আমলে জেলখাটা এক বৃদ্ধকে, যার এখন কোনো মহিমাই নেই। একালের এক গবেষক সেই ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে ধাঁধায় পড়ে যায়। দেবর্ষি সারোগী এবং আনসারউদ্দিন দুজনেরই গল্প গ্রামভিত্তিক। তবে আনসারউদ্দিনের ঝোঁক বাস্তবতার দিকে, দেবর্ষির পরাবাস্তব।

হর্ষ দত্ত, আফসার আমেদ, অভিজিৎ তরফদার ও কঙ্কাবতী দত্তের গল্প ঠিক বিষয়ভিত্তিক নয়, বাস্তবের আবরণে অনেকটাই মনোজগতের খেলা। যুক্তি এবং পারম্পর্যের বদলে কল্পনার ভূমিকাই মুখ্য।

হর্ষ দত্তের 'এক পাগল এবং টি' গল্পের পাগলটি পাঠকদের কাছে পাগল বলে মোটেই প্রতীয়মান হয় না, অথচ জাগতিক বিচারে তাকে পাগলই বলতে হবে। সে বিপদের সময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। সে বিপন্ন-বান্ধব, তার নিজস্ব আর কোনো পরিচয় নেই। আর টি একটি মেয়ে, যার নাম শুধুই টি, সে কোনো বিপদে পড়েনি। তবু সেই পাগল এসে তার সহচর হয়, বিপদের বদলে এসে পড়ে ভালোবাসা ও বিষাদের প্রচ্ছায়া। দেবর্ষি সারোগীর 'জাদুকর'-এ জাদু-বাস্তবতার ছোঁয়া লেগেছে। এ এক এমনই জাদুকর, যে বহু মানুষের ঘুমের মধ্যে নিজস্ব এক স্বপ্ন চালনা করে দেয়, এবং স্বপ্ন ভুলিয়েও দেয়।

আফসার আমেদের 'রঙ্গ' গল্পটিতে পায়রা ওড়ানো ও পায়রা-চর্চা নিয়ে অনেকখানি বর্ণনা থাকলেও তাতে যেন অন্য কোনো ব্যঞ্জনা আছে। বাবা, ছেলে ও পুত্রবধূ এবং অনেক পায়রার মধ্যে এসে পড়ে এক বহুরূপী।

অভিজিৎ তরফদারের 'শনাক্তকরণ' একটি সাধারণ কাহিনির পাশাপাশি মানুষের পরিচিতির সমস্যা। একজন লোক বাস চাপা পড়ে মারা গেছে কিন্তু তার পকেটে একটি বাসের টিকিট ছাড়া কিছু নেই, শরীরেও কোনো জন্মদাগ নেই। অন্য যে লোকটি এই ঘটনার সাক্ষী, তার নিজেরও আইডেন্টিটি ক্রাইসিস শুরু হয়ে যায়।

আনসারউদ্দিনের গল্প 'শিল্পী' এক শিল-কাটাও-এর, যে রান্নার মশলাবাটা শিলে ছবি এঁকে দেয়। হিন্দুর জন্য রাম মন্দিরের, মুসলমানের বাবরি মসজিদ। কখনও উলটো হয়ে যেতে দু-পক্ষেরই ক্রোধের শিকার হয় সে। খুবই সমসাময়িক প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু বেশ উচ্চকিত আদর্শমূলক।

ভাষার প্রসাদগুণই কঙ্কাবতী দত্তর বড়ো সম্পদ। নিত্যনৈমিত্তিকের গণ্ডিতে ঘেরা একজন সাধারণ মানুষ একদিন হঠাৎ নিজের গণ্ডির বাইরে যেতে চায় এবং প্রতিহত হয়। তারপর এক বহুতল বাড়ির উঁচু থেকে দূরের মানুষগুলোকে মনে হয় পিঁপড়ের মতন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে খোলা আকাশের নীচে। একটা খুপরির মধ্যে বসে থেকে মনে হয়, ওরা সবাই অচেনা।

সংকলনভুক্ত সব গল্পগুলিরই সামান্য কাহিনিচুম্বক দিতে চেয়েছি এটাই বোঝাবার জন্য যে এদের বিষয়বৈচিত্র্য বহুবিস্তৃত। কোনো গল্পই অবশ্য বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে যায়নি। কিন্তু মানুষগুলি বহুবর্ণ, তাদের আকাঙ্ক্ষা, অসহায়তা এবং বেঁচে থাকার লড়াই মর্মন্তুদভাবে ফুটেছে। গল্পগুলি পাঠের পর আবার নতুন করে উপলব্ধি হয় যে সুখী

মানুষ, তৃপ্ত মানুষদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কোনো না কোনো রকমের বেদনাবোধই সব গল্পের মূল সুর এবং আমাদের দেশ ও বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই তীব্র সত্য।

একটি ব্যাপারে আমার খটকা আছে তাও নিবেদন করি। গ্রাম্য পরিবেশের অনেক গল্পেই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষারও বেশ ব্যবধান আছে, কখনো-কখনো সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা দুর্বোধ্যও মনে হয়। মূল সাহিত্যের ভাষা থেকে সরে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষার যদৃচ্ছ ব্যবহার কতটা যুক্তিসংগত?

গল্পসংগ্রহে শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই সেই জাতি, যারা আত্মদূষণে দুষ্ট

ভোটের এই ডামাডোল ও চ্যাঁচামেচির মধ্যে অকস্মাৎ গত রবিবার (২৯ মার্চ ২০০৯) *আনন্দবাজার*-এর সম্পাদকীয়'র বিষয়বস্তু বাংলা সাহিত্য দেখে তাক লেগে গেল। ভাদ্র মাসে কোকিল ডাকে না, তার কারণ সেইসময় ব্যাঙেরা বড়ো বেশি ঘ্যাঙরঘ্যাং করে। ভোটের সময়ও সাহিত্য ও শিল্প একেবারে আড়ালে চলে যায়। হঠাৎ *আনন্দবাজার*-এ তার ব্যতিক্রম কেন? এই কৌতূহল নিয়েই রচনাটি পাঠ করেছি।

এই পত্রিকায় কোনো উপলক্ষ্যেই বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কোনো সুবচন থাকবে না, তা অনেকদিনই জেনে গেছি। বাংলার ঐতিহ্যবাহী, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সার্থক এই পত্রিকা, যা এককালে বহু বাঙালি সাহিত্যিককে আশ্রয় দিয়েছে, বাংলাভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অনেক উদ্যম নিয়েছে, ইদানিং কোনো কারণে সেই পত্রিকায় কোনো বাঙালি লেখক, কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ কিংবা সাহিত্য-সমাবেশ নিয়ে সামান্য জায়গাও দেওয়া হয় না। এমনকি পুস্তক সমালোচনা বিভাগের পৃষ্ঠাতেও প্রায়ই নীরস কিছু কিছু ইংরেজি বইয়ের সমালোচনা বেরোয়, যেন সব বাংলা বই-ই অস্পৃশ্য। বাংলাভাষার সর্বপ্রধান পত্রিকায় বাংলাভাষা সম্পর্কে এমন বিরাগ কেন, তা যেন ধাঁধার মতন মনে হয়। কিংবা এ কি কংসরূপে পূজা? বাংলার লেখকদের অবজ্ঞা ও আঘাত করে করে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা?

বাঙালি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বক্রোক্তি ও অভিযোগে যদি ভুল বা তথ্যভ্রান্তি থাকে, তাহলে তো প্রতিবাদ করতেই হবে। আমাদের মতন যাঁরা সুদীর্ঘ কাল বাংলাভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তাঁদের পক্ষে বাংলাভাষার অবমাননা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দিককার সত্যকেও তো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এবারের সম্পাদকীয় যেন বেশ বাড়াবাড়ি বলে গেছে, তোপ দাগা হয়েছে সমগ্র বাঙালি লেখকদের প্রতি। হ্যাঁ, সমগ্র, কারণ 'বঙ্গভাষার লেখকগণ', 'বঙ্গভাষার লেখক কুল' বলা হয়েছে বারবার। তা নতুন করে কী দোষ করল বাংলার লেখকরা? লেখাটি

পড়লে প্রথমে মনে হয় যেন কোনো বাঙালি-বিদ্বেষী ইংরেজি পত্রিকার লেখার অনুবাদ। মূল অভিযোগ একটাই। গত দু-তিন দশক করে কিছু কিছু ভারতীয় লেখক ইংরেজিতে উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে, তাঁরা অনেক অর্থ উপার্জন করছেন। এইজন্য নাকি তাঁদের প্রতি বাঙালি লেখকরা 'বিরক্ত', 'আত্মদর্শী অভিমান' নিয়ে 'বিষোদ্‌গার' করেন। তাজ্জব ব্যাপার! আমি সমস্ত পত্রপত্রিকা পড়ি। বাংলা রচনার অন্ধিসন্ধির খবর রাখি। আমি তো কোথাও বাঙালি লেখকদের এরকম অশোভন উক্তি, বিষোদ্‌গার দেখিনি। তবে কি এটা হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ? রজ্জুতে সর্পভ্রম?

একালে সাহেবরা সাহিত্যসৃষ্টিতে আর তেমন মনোযোগী নন, অন্য কাজের দিকে তাঁদের আকর্ষণ। প্রতিভাবানরা আই টি-র অভ্যন্তরে ঢুকে যান। বই লেখার চেয়ে অর্থোপার্জন সেখানেই বেশি। অর্থ-উপার্জনের কথা চিন্তা না করে সাহিত্যের জন্য আত্মত্যাগ, অমরত্বের আলেয়ার প্রতি ঝোঁক একালেই আর নেই। গোটা ইংরেজিভাষী দুনিয়ায় সাহেবদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত মহৎ লেখক এখন একজনও নেই। কবিতার জগৎ তো একেবারেই নিষ্প্রভ। বড়ো কবি কোথায়? এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য প্রাক্তন কলোনিগুলির কিছু কিছু লেখক এগিয়ে এসেছেন। কয়েক প্রজন্ম ধরে ইংরেজি ভাষা চর্চার ফলে এখন তাঁরা সেই ভাষাতে যথেষ্ট দক্ষ। কিছু কিছু ভারতীয় ইংরেজি ভাষার লেখক সাহেবদের কাছ থেকে নানান পুরস্কার কেড়ে নিচ্ছেন, এ তো অতি আনন্দের কথা। প্রকাশকদের কাছ থেকে কেউ কেউ অগ্রিম রয়ালটি পাচ্ছেন কোটি কোটি টাকা। চমৎকার। ইংরেজি ভাষার ব্যাপ্তির কথা সবাই জানে, সুতরাং এঁদের সম্পর্কে যে দেশীয় ভাষার লেখক ঈর্ষাবোধ করবে, সে হয় অতি মূর্খ কিংবা উন্মাদ। সেরকম কাউকে আমি দেখিনি।

ইংরেজি ভাষায় ভারতীয়রা খুবই ভালো করছেন। গবেষণা করে লিখছেন। বেশ। কিন্তু সেইজন্য খামোখা বাংলার লেখকদের ওপর কশাঘাত করতে হবে কেন? বাঙালি লেখকদের মনে হীনম্মন্যতা জাগাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি? বাংলা প্রকাশনার বাজারই বা ইংরেজির মতো হতে হবে কেন? বই বিক্রি আর সাহিত্য সৃষ্টির মান, দুটো আলাদাভাবে বিচার্য। তেমন কোনো হুজুগ না হলে কবিতার বই কখনও খুব বেশি বিক্রি হয় না। কিন্তু কবিতাই মানবসভ্যতার মাইলফলক। ভারতীয় ইংরেজি ভাষার লেখকরা কেউ কবিতা লিখে সার্থক হননি। বিক্রম শেঠ প্রথমে কিছুটা শুরু করেছিলেন, এখন সরে গেছেন। আমি জোর দিয়ে এই কথাটা জানাতে চাই যে, সারা পৃথিবীতেই এখন যেখানে যা কবিতা রচনা হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলা কবিতার মান অত্যন্ত উঁচু। এটা নিছক দাম্ভিকতা নয়। ফাঁকা আত্মগরিমা নয়। অন্য ভাষায় কোথায় কী লেখা হচ্ছে তার বিচারেই বিশিষ্ট জনেরা এই অভিমত দিয়েছেন। তাহলে বাংলায় উচ্চমানের কাব্য-রচনার জন্য আমরা গর্বিত বোধ করব না? বিক্রিটাই বড়ো?

বাংলা ছোটোগল্পও বেশ উচ্চমানের। কিছু কিছু বাংলা উপন্যাস ও যেসব বই আন্তর্জাতিক বাজারে পুরস্কার পায়, সেগুলি পড়ার পরই বলছি, গোটা বাংলা সাহিত্য মোটেই হেলাফেলা করার মতো নয়। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বই পড়েও হতাশভাবে বলতে ইচ্ছে করে, এই! বিভূতিভূষণ, মানিক, সতীনাথ, সমরেশ বসু বাংলাভাষায় লিখে আমাদের অনেক ধনী করে গেছেন। অন্য কেউ তা পড়ুক বা না পড়ুক কিছু যায় আসে না।

আমরা অনেকেই জানি না যে, বাংলাদেশে লেখকদের কদর অনেক বেশি। দু-এক জন লেখক-বন্ধুর মুখে শুনেছি, একই দেশ, একই ভাষা, তাই বড়ো বড়ো লেখকদের প্রতি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টও যথেষ্ট সমীহ দেখায়। হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের বিক্রি অনেক ইংরেজি ভাষার লেখকের চেয়ে কম নয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানি, কোনো বইয়ের জন্য তাঁকে প্রকাশকের পক্ষ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। লেখকরা একটু সার্থক হলেই অগ্রিম পান। পশ্চিমবাংলাতেও কোনো কোনো লেখকের বিশেষ বিশেষ বইয়ের বিক্রির সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কোনো প্রকাশক তাঁদের কখনও এক টাকাও অগ্রিম দিয়েছেন বলে শুনিনি। অগ্রিম দেওয়ার কালচারটিই এখানে নেই। আমি তখন সবে কয়েকটা উপন্যাস লিখেছি। একটু-আধটু নাম হয়েছে। কিন্তু উপার্জন তেমন কিছু না। বাড়ি ভাড়া নিয়ে ভুগছিলাম খুব। এক প্রকাশককে বলেছিলাম, একটা ফ্ল্যাট নিতে চাই। যদি কিছু অগ্রিম...। তিনি হাত নেড়ে বলেছিলেন, তুমি এখনও যোগ্য হও নাই! আর-এক জন লেখককে জানি। যিনি কানাডায় গিয়ে আদিবাসীদের ডেরায় কয়েক মাস থেকে তাদের নিয়ে গবেষণা করতে চান। আমেরিকার এই আদিবাসীদের আমেরিকান ইন্ডিয়ান বলা হলেও তাঁদের সম্পর্কে এ দেশে সাধারণ জ্ঞান খুব কম। বিশেষ কিছু লেখাও হয়নি। সেই লেখকটি প্রথম তাঁদের নিয়ে লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো প্রকাশকই তাঁর বিদেশ-বাসের জন্য অগ্রিম দিতে আগ্রহী হননি।

তা আর কী করা যাবে।

ওই সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে শেষ বক্তব্য : বাণিজ্য বিক্রি প্রচার গবেষণা, এ সবই ঠিক আছে। কিন্তু সাহিত্যের প্রসঙ্গে গুণগত মানের বিচার না করলে চলে না। সেদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এখনও গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে!